শেফালি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী

১৫ হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস্

১২।১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা,

শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পূর্ব্ব-কথা

এত বড় জগৎটা মিথ্যা! বড় বড় পণ্ডিতেরা এই কথাটি বরাবর আমাদিগকে বলিয়া আসিতেছেন,—চিরকাল! আমি আজ সেই বৃহৎ মিথ্যার ক্ষুদ্র একটু ছায়া সংগ্রহ করিয়া আমার সাতকোটি ভাই-ভগিনীর অন্তরের দ্বারে উপহার লইয়া উপস্থিত! সকলেই সামর্থ্যমত উপহারটুকু পরিপাটি করিতে চেষ্টা করে, আমিও করিয়াছি;—কাহারও কাছে সেটি হয়ত সুন্দর, কাহারও কাছে বা নিতান্তই সামান্য!

যাহা হৌক, একদিন এই ক্ষুদ্র মিথ্যাগুলি যেমন আমার অন্তরতম প্রদেশে সত্যের শুভ্র ও স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছিল, তেমনই যদি আবার সেগুলি, ক্ষণিকের জন্য, আর কাহারও সদয় হৃদয়ে সত্যের তেমনি সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব! কল্পিত প্রাণীগুলির সুখে একটু হাসি, দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রু,—ইহাই আমার দীন সাধনার চরম-পুরস্কার!

গল্পগুলি পূর্ব্বে 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন শরতের এই ক্ষান্তবর্ষণ স্নিগ্ধ প্রভাতে ঝরা 'শেফালি'গুলি গুচ্ছাকারে সাধারণের সম্মুখে ধরিলাম!

গল্পগুলির অনেক স্থলই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তবে ইচ্ছাসত্ত্বেও কয়েকটির সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই

বলিয়া আমি দুঃখিত। দুই একটি গল্প ইংরাজী গল্পের ভাবমাত্র লইয়া রচিত হইলেও সেগুলিকে সম্পূর্ণ আপনার ভাবে ফুটাইয়াছি।

'সাহিত্য' ও 'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সাহিত্য-সাধনায় আমার উৎসাহদাতৃগণের মধ্যে অন্যতম। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি!

সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রের সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহ, স্নেহ ও আগ্রহ ভিন্ন 'শেফালি' প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ! তাঁহার স্নেহের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী 'শেফালির' কভারের পরিকল্পনায় ও প্রুফ-সংশোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন; এই অবসরে তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
২১শে আশ্বিন, ১৩১৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শেফালির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পগুলি আমূল পরিমার্জ্জিত করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অপর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

ভবানীপুর, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১২ ফাল্গুন, ১৩১৯।

যাঁহার

অকৃত্রিম স্নেহ-ধারায়,

অসহ্য শোক-দুঃখের দাহ,

কখনও

আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই,

আমার সেই

স্নেহশীলা, পূজনীয়া

দিদিমার

শ্রীচরণে

সূচী

শেফালি

নির্ব্বন্ধ

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। উষার আলোকচ্ছটার উপর একটা সুনিবিড় কৃষ্ণ মেঘ ঘন আবরণ-বিস্তারের উপক্রম করিতেছিল। ভোরের পাখীগুলা বাহির হইতে না পাইয়া নিতান্ত অস্থির চিত্তে বাসার মধ্যে ডানা ঝট্‌পট্ করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন একটা ভীষণ প্রলয় আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

আট বৎসরের পুত্র মধুকে সঙ্গে লইয়া কিনু মাছ ধরিতে বাহির হইল। এই ঝড়ের মুখ,—কিন্তু না বাহির হইলেও নয়! পরদিন বেলা দশটার মধ্যে বাবুদের বাড়ী মাছ যোগাইতে হইবে! বিবাহের আনন্দোৎসব উপলক্ষে গ্রামে ধূম লাগিয়া গিয়াছিল।

স্ত্রী তারিণী কিনুকে বলিয়া দিল, "দেখিস, যে মেঘ করেছে, বেশী দূর যাস্‌নে। আর মধুকে সাবধান, ছেলে মানুষ—"

কিনু যখন ঘাটে যাইয়া ডিঙ্গি খুলিল, তখন মৃদু শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধু ডাকিল, "বাবা!"

"কেন?"

"উঃ, কি মেঘ করেছে! এখনই ঝড় উঠবে!"

পিতা আশ্বাস দিল, কহিল, "ভয় কি? আমি আছি! কত ঝড়ে আমি একলা বেরিয়েছি! আমাদের কি জল-ঝড়ের ভয় করলে চলে!"

তখন অদূরে জমিদারবাটী হইতে নহবতের মিষ্ট রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছিল। কিনু কহিল, "আমাদের একটু বেলা হয়ে গেছে; ঐ শোন্, শানাই বাজছে!"

"বেশ, না বাবা? ফিরে এসে কিন্তু বাজনা শুনতে যাব, কেমন?"

"আচ্ছা!"

কিনুর ডিঙ্গি বাঁকের মুখ পার হইতে না হইতে চারিধার কাঁপাইয়া ভীষণ ঝড় উঠিল। মধু ভয়ে তাহার পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। কিনুরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। চারিধার ধোঁয়ার মত হইয়াছে! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না! শুধু বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ও বিশাল নদীবক্ষে সফেন উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! সে যেন দৈত্যের অট্টহাসির মতই ভীষণ মনে হইতেছিল! এমন কত ঝড়ে কিনু মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু কখনও সে ভয়ে এত কাতর হয় নাই! আজ মধু সঙ্গে আছে, তাহাদের একমাত্র পুত্র, বড় আদরের মধু! তাহার উপর তারিণী অত করিয়া সাবধান হইতে বলিয়া দিয়াছে! হায়, কেন সে এই বিপদে মধুকে সঙ্গে

লইয়া আসিল! বাহির হইবার সময় বিপদের গুরুত্বটা এমন করিয়া সে অনুভব করিতে পারে নাই!

নৌকার হাল ছাড়িয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণ বলে সে মধুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, ডাকিল, "মধু, বাবা!" মধু কোন উত্তর দিল না। সে কথা কহিতে পারিতেছিল না, ভয়ে কাঁপিতেছিল।

সহসা একটা তরঙ্গের আঘাতে ছোট ডিঙ্গি উল্টাইয়া গেল। প্রবল দৈত্যের মত একটা জলোচ্ছ্বাস মধুকে কিনুর বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইল। দূরে করুণ কণ্ঠে শব্দ হইল, "মা গো!" কিনু চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মধু, বাবা!"

কেহ সাড়া দিল না—ঝটিকার ভীম গর্জ্জনে তাহার চীৎকার-ধ্বনি কোথায় মিলাইয়া গেল!

উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে তারিণী কুটীরের দ্বারে স্বামী ও পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। কখন্ সন্ধ্যার শাঁক বাজিয়া গিয়াছে, এখনও কাহারও দেখা নাই! জমিদার-বাটী হইতে লোক আসিয়া মাছের জন্য তিন চারি বার তাগিদ দিয়া গিয়াছে। একটা অজানিত আশঙ্কায় তারিণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল! সে ভাবিতেছিল, "কটা পয়সার জন্য কেন তাদের এ বিপদের মুখে পাঠালাম! হে ঠাকুর, তাদের ফিরিয়ে আনো!"

পাগলের মত আসিয়া কিনু ডাকিল, "তারিণি!"

তারিণী চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, "আঃ, এসেছিস! বাঁচলাম! মধু কোথা? তাকে দিয়ে মাছ পাঠিয়ে দিছিস্ বুঝি? মাছের জন্য তিন চার বার লোক এসে ফিরে গেছে!"

কিনুর পা কাঁপিতেছিল, গা টলিতেছিল। তারিণী কহিল, "মর্, অমন কচ্ছিস্ যে! মদ খেয়েছিস্ বুঝি?"

কিনু কহিল, "তারিণি, আমাকে ধর্। মধু ফিরেছে?"

তারিণী কহিল, "ফিরেছে কি? কখন সে ফিরলে——?"

"ফেরেনি? তবে বুঝি—"

স্বামীর হাত ধরিয়া তারিণী কহিল, "তবে কি—? বল্ শীগ্‌গির—"

স্ত্রীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিনু কহিল, "মধু নেই! মা গঙ্গা তাকে নিয়েছে।"

ঘৃণার সহিত স্বামীকে ঠেলিয়া তারিণী কহিল, "বলিস্ কি এ্যাঁ! আর তুই—"

"ফিরে এলুম!" কিনু কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "তাকে সমস্ত দিন ধরে আতিপাতি খুঁজলাম, পেলাম না! বুকের মধ্যে তাকে পুরে রেখেছিলাম, কে যেন ছিনিয়ে নিলে! কিছুতেই আমি ধরে রাখতে পারলাম না। তুই অমন করিস নে, তারিণি, আমার প্রাণ কেমন করে!" কিনু বসিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

তারিণী কর্কশ স্বরে কহিল, "তুই স্বচ্ছন্দে চলে এলি! যা তাকে খুঁজে আন্—যেথা থেকে পাস্, ফিরিয়ে আন্—"

কিনু কহিল, "পেলাম না কিছুতে—"

"যা, ফের্ ভালো করে খুঁজগে যা! বেহায়া, তাকে ফেলে তুই কোন্ মুখে ফিরলি?"

"তবে আবার যাই—তাকে পাই যদি, তবেই ফিরব, না হলে—"

কিনু চলিয়া গেল। তারিণী স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাবুদের বাড়ী হইতে গদা আসিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, "এখনও ফেরেনি কিনু। বিলাতি পটালে দেখছি, মাছ নিয়ে! ভাগো আমি পুকুরে জাল ফেলালাম! জুয়াচুরির আর জায়গা পায়নি, বেটা!"

স্বামি-পুত্রের প্রত্যাশায় দ্বার-প্রান্তে বসিয়াই তারিণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে নিজে একবার অনুসন্ধানে বাহির হয়; কিন্তু আবার মনে হইতেছিল, মধু যদি ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে! তাহার মধু নাই,—ইহা কি সম্ভব!

নিদ্রাভঙ্গে তারিণী দেখিল, রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে! কই, এখনও ত কাহারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না! অস্থির চিত্তে সে বাহির হইয়া পড়িল।

নদীর কিনারা ধরিয়া সে একেবারে বাবুদের বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া পড়িল। পথে কাঁটায় তাহার পা ছড়িয়া গিয়াছে,

কাদায় কাপড় ভরিয়া গিয়াছে। ঘাটের ধাপে বাবলা গাছের ঝোপের কাছে পড়িয়া রহিয়াছে, কি ও? ছুটিয়া গিয়া তারিণী দেখে, তাহারই হতভাগ্য স্বামী! নিস্পন্দ দেহ, মৃত্যুস্পর্শে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তখন নানা রাগিণীর আড়ম্বরে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে! বাবুদের বাড়ী হইতে মেয়েরা জল সহিতে আসিয়াছে! বিচিত্র বেশধারিণী রঙ্গিণীগণের মুখরিত উৎসব-কোলাহলে কেহ জানিতেও পারিল না যে, যে উৎসবের আনন্দ-ছটায় তাহারা অপূর্ব্ব পুলকে উচ্ছ্বসিত, এক দরিদ্রা নারী সেই উৎসবেরই একটি নির্ম্মম ইঙ্গিতে স্বামি-পুত্রহীনা, নিতান্ত দুর্ভাগিনী! এই বিশাল জগতে আপনার বলিতে তাহার আজ আর কেহ নাই!

নীরা

ভীষণ বসন্ত রোগে যখন বৃদ্ধ নন্দকিশোরের লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ ও উপযুক্ত একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকিশোর ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন শিশু পৌত্রী নীরাই তাহার একমাত্র অবলম্বন রহিল।

শোকের বেগ কতকটা কমিলে বৃদ্ধ আবার আপনার সেতার যন্ত্রটিকে ধূলি-জঞ্জালের কবল হইতে উদ্ধার করিল। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে বহুদিন ধরিয়া এই সেতারটি নন্দকিশোরের প্রিয় সহচরের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই যখন মধ্যে মধ্যে বিনিদ্র রজনীতে অতীতের সমস্ত ঘটনা সজীব হইয়া বৃদ্ধের প্রাণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত, তখন বৃদ্ধের পক্ষে সে যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ-লাভ নিতান্তই দুরূহ হইয়া পড়িত। বৃদ্ধের সব কথা মনে পড়িয়া যাইত! সেই ছোটখাটো সচ্ছল পরিবারটি, লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর স্নিগ্ধ প্রণয়, শিশু-পুত্রের সহাস সরল ছোট টুকটুকে মুখখানি, পুত্রের বিবাহ-রাত্রির আনন্দোৎসব, চাঁদের-মত-আলো-করা নববধূর ফুটফুটে মুখখানি,—এখন কোথায় সে সব! তাহাদেরই একটি ছোট স্মৃতি নীরা,—ফুলের মত সুন্দর কোমল মেয়েটি! এই নীরা যদি আবার একদিন সহসা তাহাদেরই মত

বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়! বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিত না। হা ভগবান! দুঃখের অংশটা তাহার অদৃষ্টে কেন এত প্রচুর করিয়া দিলে?

অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িত। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া সেতারটিকে প্রিয়তমের মত আপনার বক্ষে টানিয়া লইত, এবং ধীরে ধীরে তাহার তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলিত। স্তব্ধ বিজন নিশীথে সমস্ত অতীত বেদনা যখন বৃদ্ধের জীর্ণ হৃদয় চাপিয়া ধরিত, তখন এই প্রিয় সেতারটিই শুধু প্রিয়তম সুহৃদের ন্যায় তাহাকে সান্ত্বনা-আশ্বাস দিত।

সেতার বাজাইতে বসিয়া বৃদ্ধ ভুলিয়া যাইত, শয্যায় নাতিনীটি নিদ্রা যাইতেছে। সেতারের ঝঙ্কারে নীরার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে একেবারে ডাকিয়া উঠিত, "দাদা—"

বালিকার সেই কোমল কণ্ঠস্বরে, সুমিষ্ট নির্ভরপূর্ণ আহ্বানে, দাদার মোহ কাটিয়া যাইত। দাদা সেতার রাখিয়া তাড়াতাড়ি নীরার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া কোমল স্বরে কহিত, "ডাকৃছ কেন, দিদি? ঘুম হচ্ছে না?"

"না, দাদা।"

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিত। নীরার ঘুম হইতেছে না,—তাই ত, কি করা যায়। বৃদ্ধ নীরবে নীরার মুখে-চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, "একটু চোখ বুজে থাক দিদি, তা হলেই ঘুম আসবে এখন।" কিন্তু নীরা আবদার ধরিত, বলিত, "না দাদা, আমি আর শোব না।" দাদা তখন তাহাকে কোলে

তুলিয়া লইয়া তাহার ছোট মাথাটি বুকের মধ্যে চাপিয়া তাহাতে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে বলিত, "লক্ষ্মী দিদিটি, ঘুমাও, না হলে অসুখ করবে যে।"

বালিকা ছোট মাথাটি নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিত, "ঘুম যে কিছুতেই আসছে না।"

তখন স্নেহময় দাদার অস্থিরতার সীমা থাকিত না। তাড়াতাড়ি সে ঘরের জানালা খুলিয়া দিত। পরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে বহিঃপ্রকৃতির সুমোহন শোভার দিকে চাহিয়া দাদা নীরাকে বলিত, "ঘরে কেমন চাঁদের আলো এসেছে,—এবার ঘুমাও ত, দিদি!"

"তুমি একটা গল্প বল, দাদা!" বলিয়া নীরা জানালার ধারে বসিয়া পড়িত।

দাদা তখন ঈষৎ হাসিয়া গল্প বলিতে বসিত, "—এক যে রাজা, তাঁর দুই রাণী। বড় রাণীটি—"

নীরা সহসা বলিয়া উঠিত, "হাঁ দাদা, ঐ যে আকাশে তারাটি, তার পাশে আর একটি—ঐ বুঝি বাবা আর মা,—?" শুনিয়া বৃদ্ধের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিত। কোন গতিকে 'হাঁ' বলিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার গল্প সুরু করিয়া দিত, "—বড় রাণীটি বড় দুঃখিনী। রাজা তাঁকে দেখতে পারতেন না। ছোটরাণী সুয়োরাণী একদিন রাজাকে বললেন—" নীরা আবার গল্পে বাধা দিয়া বলিত, "আচ্ছা, বাবা মা আমাদের কাছে আসেন না কেন? আমার অমনি তারা হতে

ইচ্ছা করে, দাদা! কেমন আকাশ থেকে তোমাকে দেখ্‌বো!" বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিত। বৃদ্ধ বলিত, "গল্প শোন না, দিদি। —তারপর ছোট রাণী, রাজাকে বলে—"

নীরা সাভিমানে বলিয়া উঠিত, "আমি রাজার গল্প শুনতে চাই না—আমি যা বল্‌ছি, তা আগে বল না, দাদা!"

"কি বলব, নীরা?"

নীরা আব্‌দার ধরিত, "তুমি বাবা-মার গল্প বল।"

তখন সেই চন্দ্রালোকিত কক্ষে নিস্তব্ধ রাত্রে বুদ্ধিমতী পৌত্রীটির নিকট পিতামহ আপনার সুখ-দুঃখের গল্প করিত। সে যেন একটা স্বপ্ন! কতকটা সম্ভব, আবার কতকটা যেন অত্যন্ত অসম্ভব! গল্প করিতে করিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিত, নীরাও ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার সুন্দর কোমল মুখখানির উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িত। মৃদু মলয়স্পর্শে মুক্ত কেশের গুচ্ছ উড়িয়া মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। বৃদ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত! এই চন্দ্রালোকে কত কথাই বৃদ্ধের মনে উদয় হইত। এই সরলা বালিকা কি দোষ করিয়াছিল ভগবান, যে এই বয়সে তাহাকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ ভাবিত, সব গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিটুকু যে কিছুতেই যায় না!

২

ক্ষুদ্র পল্লীর সকলেই নন্দকিশোরকে শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত। এই সহায়হীন সম্বলহীন বৃদ্ধের উপকারের জন্য সকলেই

ব্যগ্র ছিল। সুবিধা-মত সকলেই বাগানের তরি-তরকারী, ফলমূল প্রভৃতি তাহাকে উপহার দিত। সেজন্য বৃদ্ধকে সংসার-সম্বন্ধে বড় একটা ভাবিতে হইত না। আর একজন বৃদ্ধকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। তিনি পল্লীর বিখ্যাত ধনী—গোবিন্দ বাবু। গোবিন্দ বাবু নন্দকিশোরের সমবয়স্ক, গীত-বাদ্যেও তাঁহার অনুরাগ ছিল, অসাধারণ। কাজেই সেতার-হস্ত নন্দকিশোরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ঈষৎ গাঢ় হইয়াছিল। পূর্ব্বে গোবিন্দ বাবু পল্লীতে বড় একটা থাকিতেন না, কলিকাতাব প্রশস্ত বাসাবাটীতেই বাস করিতেন। এখন সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর কলিকাতার মায়া কাটাইয়া পল্লী-ভবনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি। পৌত্র সুবোধচন্দ্র হেয়ার স্কুলে সেকণ্ড্ ক্লাসে পড়িতেছিল।

গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরকে সাহায্যও যথেষ্ট করিতেন। নন্দকিশোরও প্রিয় নাতিনী নীরাকে অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেতার শুনাইয়া যেমন আনন্দলাভ করিত, গোবিন্দবাবুকে সেতার শুনাইয়াও তদপেক্ষা অল্প আনন্দ অনুভব করিত না।

আজ দুইটি বৃদ্ধই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে,—ডাক পড়িলেই হয়! তবে একজন পৃথিবীতে আসিয়া লক্ষ্মীর শুভাশীর্ব্বাদধারা নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছিলেন, আর একজন হতভাগ্যের প্রতি চপলা লক্ষ্মী কখনও দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একজন পৃথিবীতে আসিয়া অমৃতের পাত্র হইতে আকণ্ঠ অমৃত পান করিয়াছেন, আর একজনের সম্মুখে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট চিরকাল হলাহলপূর্ণ পাত্রটিই ধরিয়া

আসিয়াছে! এই দুইটি মরণ-পথের যাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনটুকু ক্রমশই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল।

সেবার বড়দিনের ছুটিতে কয়েক জন বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রবোধ-চন্দ্র দেশে আসিল। ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে সমগ্র পল্লী প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। দরিদ্র পল্লীবাসীরা বাবুদিগের শালের বহর, অলঙ্কারের বিস্তার এবং ঘড়ি ও চেনের আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাদের কাজকর্ম্মও একরূপ বন্ধ হইয়া গেল! আজ বাবুরা পুকুরে মাছ ধরিবেন, কাল বাগানে চড়ুই-ভাতি, পরশু নদীতে নৌকায় বাচ! তাহাদের রসদ বহন করিয়া, নৌকার দড়ি খুলিয়া, পুকুরে 'চার' ফেলিয়া নানাবিধ উপায়ে বাবুদের মন যোগাইয়া পল্লীর অধিবাসিগণ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। সাত বৎসরের নীরা বাচ-খেলা দেখিল, ম্লান নয়নে দাঁড়াইয়া বাবুদিগকে দেখিল! বাবুদিগকে তাহার কিন্তু তেমন ভাল লাগিল না। ইহারা ত তাহার দাদার মত নয়—তাহার সঙ্গে একটা কথাও কয় না, তাহাকে একটু আদরও করে না।

প্রবোধচন্দ্রের এক সম্পাদক-বন্ধু বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে কহিল, "সেতারটা একবার শুনিয়ে দিন না, মশায়!" বৃদ্ধ সরলভাবে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া শুধু কৌতুকের সৃষ্টি করিল। সম্পাদক-বন্ধুটি হাসিয়া কহিল, "আপনার যে একেবারে ওস্তাদী

হাত দেখছি।” কম্পিত হস্তে সেতার নামাইয়া নন্দকিশোর নীরবে বসিয়া রহিল!

সত্য বলিতে কি, প্রবোধচন্দ্র ও তাহার বন্ধুবর্গের এই উচ্ছৃঙ্খল হাস্য-কলরব ও আমোদ-কৌতুক বৃদ্ধের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন শান্তি-ময়ী ক্ষুদ্রা পল্লীটির মধ্যে সহসা কোথা হইতে একটা তীব্র বিপ্লব-স্রোত বহিয়া আসিয়াছে! তাহার প্রভাবে গৃহের শান্ত কুললক্ষ্মীর মত পল্লীখানি সহসা যেন আজ বিলাসিনী নায়িকার ন্যায়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে! হায়, কোথায় আজ তাহার সেই চিরপুরাতন সরল সহজ আনন্দ-পরিপূর্ণ শ্রীটুকু!

ইংরাজী নববর্ষে প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে একটা ভোজের আয়োজন করিল! গোবিন্দ বাবু নন্দকিশোরকেও নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রবোধের জনৈক মক্কেল বন্ধু নববর্ষ-উপলক্ষে প্রবোধকে একটি হীরক অঙ্গুরীয় উপহার পাঠাইয়াছিল। আহারের পর বৈঠকখানায় বসিয়া সেই অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে সকলের আলোচনা চলিতেছিল। সকলেই প্রশংসা করিতেছিল। নন্দকিশোরও অঙ্গুরীটি দেখিয়া তাহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রশংসা করিল। নানাবিধ গল্পও চলিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবোধ তাহার উকিল বন্ধুটির দিকে চাহিয়া কহিল, “কৈ হে, আংটিটা দেখি! সওগাত সম্বন্ধে মন্মথর বেশ ‘টেষ্ট্’ আছে, কি বল?”

উকিল বন্ধু কহিল, “আংটিটা আমার কাছে নাই ত! নন্দ-বাবু দেখছিলেন না?”

নন্দকিশোর স্থির কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, আমি প্রবোধ-বাবুর হাতে দিয়েছি ত।"

প্রবোধ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "কখন আবার দিলেন?"

তখন আংটির অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সকলেই উঠিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। প্রবোধের অপর বন্ধু কহিল, "আচ্ছা, ভুলে কেউ পকেটে রাখেন নি ত?" সকলেই আপন আপন পকেট উল্টাইয়া দেখিল।

প্রবোধ কহিল, "নন্দবাবুর পকেটে নাই ত?" নন্দকিশোর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। প্রবোধের বন্ধুবর্গ বলিয়া উঠিল, "এ কি রকম, মশায়? আমরা সবাই যখন পকেট দেখাতে পারলাম, তখন আপনারই বা দেখাতে ক্ষতি কি? দেখান না পকেটটা!" নন্দকিশোর সবলে পকেট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রবোধ চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কিন্তু বড় আশ্চর্য্য, নন্দবাবু!" নন্দকিশোর কাতর দৃষ্টিতে গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। গোবিন্দবাবুর মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

উকিল বন্ধুটি কহিল, "শুধু পকেটটা একবার দেখাতে আর আপনার আপত্তি কি, বলুন? আপনি ত আর আংটি নেন নি। পকেটটা দেখালেনই বা, এই ত আমরা সবাই দেখালাম।"

নন্দকিশোর কম্পিত স্বরে কহিল, "আ-আমার একটু আপত্তি আছে।"

প্রবোধ হাঁকিয়া উঠিল, "কিসের আপনার আপত্তি? বাঃ!"

বৃদ্ধ নন্দকিশোরের দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দকিশোর সবলে আপনার জামার পকেট চাপিয়া কহিল, "আমাকে বিশ্বাস করুন, আ-আংটি আমি নিই নি। বিশেষ আপত্তি না থাকলে আ-আমি নিশ্চয় প-পকেট দেখাতাম।"

প্রবোধ গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল, "আচ্ছা বাবা, এটা কি নন্দবাবুর ভাল কাজ হচ্ছে?" গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের প্রতি স্তম্ভিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। নন্দকিশোর গোবিন্দবাবুর দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "আপনি যদি পকেট দেখাতে বলেন, তা হলে এখনই দেখাব, গোবিন্দবাবু! কিন্তু আমি যথার্থ বলছি, আংটি আমার কাছে নাই।"

গোবিন্দবাবু হঠাৎ উঠিয়া নন্দকিশোরের পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "না, না, আপনাকে পকেট দেখাতে হবে না। আপনি বাড়ী চলুন।" পরে পুত্র ও পুত্রের বন্ধুবর্গের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "কেন তোমরা নন্দবাবুকে অপমান করছ?" গোবিন্দবাবুর স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের সহিত বহির্দ্বার অবধি অগ্রসর হইলেন। বাহিরে আসিয়া কম্পিত স্বরে নন্দকিশোর কহিল, "গোবিন্দবাবু! আপনিও কি আমাকে সন্দেহ করেছেন?"

গোবিন্দবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন, চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। একটা ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "এ্যাঁ— না, সন্দেহ কি!" নন্দকিশোরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিল—

চারি দিক ধোঁয়ার মত বোধ হইল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল।

গোবিন্দবাবু পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রবোধ কহিল, "বাবার যেমন কাণ্ড! এই পাড়াগেঁয়েটাকে এখানে নিয়ে আসেন!"

গোবিন্দবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ কর, নন্দবাবু লোক ভাল!"

প্রবোধ কহিল, "লোক ভাল ত পকেট দেখালে না, কেন? যদি আংটি না নেবে, তা হলে পকেট দেখাতে আপত্তি কি? এঁরা সকলেই ত পকেট দেখালেন!" গোবিন্দবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

সেইদিন শেষ রাত্রে কম্প দিয়া গোবিন্দবাবুর জ্বর আসিল। গোবিন্দবাবুর পীড়ার জন্য পরদিন প্রভাতে প্রবোধের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ঘটিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে গোবিন্দবাবু পথ্য পাইলেন।

তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে প্রবোধের কলিকাতা-গমনের জন্য ভৃত্যবর্গ জিনিস-পত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল। প্রবোধ নীচের ঘরে বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিল। সহসা সে দেখিল, কক্ষের এক কোণে ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেটের পার্শ্বে কি একটা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে! উঠিয়া সে দেখে, সেই অঙ্গুরীয়! তাহার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই নন্দকিশোরের বেদনা-কাতর মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল।

আহা, বেচারার প্রতি বড়ই রূঢ় আচরণ করা হইয়াছে। তাহার মনে অনুতাপ হইতে লাগিল, বৃদ্ধ না জানি কত কষ্ট পাইয়াছে। বৃদ্ধের নিকট এখনই ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন, —না আর সময় নাই! এখনই যাত্রা করিতে হইবে! প্রবোধ স্থির করিল, এবার যখন দেশে আসিবে, তখন প্রথমেই সে বৃদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

প্রবোধ চলিয়া গেল। গোবিন্দবাবুর নিকট বাড়ীটা যেন অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "হ্যাঁরে ভোলা, নন্দবাবু আসেন নি?"

ভোলা কহিল, "আজ্ঞে, তিনি ত এ ক' দিন আসেন নি।"

"এ ক' দিন একবারও আসেন নি! কেন রে?"

গোবিন্দবাবু ভাবিলেন, বৃদ্ধের কি অসুখ করিয়াছে? সে রাত্রির প্রত্যেক ঘটনা গোবিন্দবাবুর মনে পড়িল। সেই কাতর কম্পিত কণ্ঠস্বর! সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ব্যাকুল নিবেদন! আহা, সেই লাঞ্ছনা ও অপমানে বৃদ্ধের প্রাণে কতই না কষ্ট হইয়াছে। তাই বৃদ্ধ লজ্জায় ঘৃণায় আর এ দিকে বুঝি পদার্পণ করে নাই! গোবিন্দবাবুর সামান্য একটু সর্দ্দি হইলে যে নন্দকিশোর এক দণ্ড কখনও কাছ-ছাড়া হইত না, সেতার বাজাইয়া, গল্প করিয়া তাঁহার কষ্ট-লাঘবের চেষ্টা করিত, সেই নন্দকিশোর আজ কয়দিন একবারও এ দিকে আসে নাই! সেই নন্দ-কিশোরকে, সেই প্রাণের বন্ধুকে গোবিন্দবাবু সে রাত্রে একটু সন্দেহ করিয়াছিলেন? হাঁ, করিয়াছিলেন বই কি! অনুশোচনায়

গোবিন্দবাবুর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। গোবিন্দবাবু ডাকিলেন, "ভোলা!"

"আজ্ঞে!"

"তুই চট্ করে একবার নন্দবাবুকে ডেকে আন্ত! আর বলিস্ যে, যে আংটি হারিয়েছিল, তা পাওয়া গেছে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ভোলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাড়ীতে কেউ নেই!"

অধীরভাবে গোবিন্দবাবু কহিলেন, "সে কি! কোথায় গেল, সব?"

"তা কেউ বলতে পারলে না—বাড়ীতে জিনিসপত্রও কিছু নেই।"

"কবে গেল?"

"পাড়ার লোকে বলে, যেদিন আপনার অসুখ করে, তার পরদিনই সন্ধ্যার সময় নাত্নীটিকে নিয়ে তিনি কোথায় চলে গেছেন, আর ফেরেন নি।"

গোবিন্দবাবুর প্রাণে আঘাত লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, হায় বন্ধু, এমন করিয়া আমার অপরাধের শাস্তি দিয়া গেলে! ক্ষমা-ভিক্ষার অবসরটুকুও দিলে না!

৪

প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই নাতি-সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের পশার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। তাহার পুত্রটিও বি,এ পড়িতেছে! চঞ্চলা কমলা এই পরিবারটির উপর

আপনার স্নেহদৃষ্টি অচঞ্চলই রাখিয়াছেন, কৃপা-প্রকাশে সরস্বতী দেবীরও কৃপণতা ছিল না।

পূজার ছুটিতে পক্ষি-শিকারের জন্য প্রবোধচন্দ্র নদীয়ার এক বিলে বেড়াইতে গিয়াছিল। খোড়ের নাতি-প্রশস্ত খালে নৌকা রাখিয়া প্রবোধচন্দ্র পল্লীগ্রাম-দর্শন-বাসনায় একাকী প্রান্তরমধ্যে বেড়াইতে চলিল। পল্লীর কুতূহলী বালকবালিকা ও বধূবর্গ সাহেবী-পোষাক-পরা প্রবোধচন্দ্রকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র মাঠের মধ্যকার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গ্রামের পথে পড়িয়াছে। এমন সময় সহসা একটি বালিকা অসঙ্কোচে প্রবোধচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা! তুমি কি ডাক্তার সাহেব?"

গ্রাম্য বালিকার এতখানি সাহস দেখিয়া প্রবোধচন্দ্র বিস্মিত হইল। সে কহিল, "কেন, বল দেখি।"

বালিকা তাহার করুণ ডাগর চোখ-দুটি প্রবোধের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "আমার দাদার বড় অসুখ করেছে, একবার দেখবে এস না!" বালিকার সে ব্যাকুল আহ্বানে প্রবোধ স্থির থাকিতে পারিল না। গৃহে সে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করিত। নৌকায় ঔষধের বাক্সও ছিল। সে ভাবিল, যদি তেমন দেখি ত, ঔষধ পাঠাইয়া দিব।

প্রবোধকে লইয়া বালিকা একটি ভগ্ন জীর্ণ বাটীতে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে শয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধের নিকট গিয়া বালিকা ডাকিল, "দাদা!"

বৃদ্ধ চোখ চাহিয়া কহিল, "এসেছিস, দিদি ?"

নীরা কহিল, "দাদা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন !"

ঈষৎ হাসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "কাছে আয়, ভাই !" বৃদ্ধের রোগশীর্ণ দেহে ও কণ্ঠস্বরে প্রবোধের একটা অতীত কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রবোধ ভাবিল, তাহা কি সম্ভব ! এই কি নন্দবাবু ! সে নীরাকে কহিল, "আচ্ছা, তোমরা কি আগে বাঁশগাছিতে কখনও থাকতে ?"

"হাঁ।"

"সেখান থেকে চলে এলে, কেন ?"

"তারা যে দাদাকে তাড়িয়ে দিলে !"

"কেন, তাড়িয়ে দিলে ?"

"সে অনেক কথা। এখন দাদাকে তুমি ওষুধ দিয়ে ভাল করে দাও না, ডাক্তার সাহেব !"

প্রবোধ বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, ঔষধের বড় একটা প্রয়োজন নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে বৃদ্ধের জীবন-দীপটি নিবিয়া যাইতে পারে।

নীরাকে ডাকিয়া প্রবোধ কহিল, "কোন ভয় নাই। এখন বল দেখি, তোমরা এখানে এলে কেন ?"

নীরা সরলভাবে কহিতে লাগিল, "দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি। বাঁশগাছির গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল। তাঁর ছেলে একবার বাঁশগাছিতে আসেন, সঙ্গে আরও কে কে সব আসেন। তাঁরা দাদাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেন। একদিন তাঁদের একটা আংটি হারিয়ে যায়। তাঁরা দাদাকে

পকেট দেখাতে বলেন, মনে করলেন, দাদাই চুরি করেছে। কিন্তু দাদা তা করেনি—দাদা ত চোর নয়! তাঁরা দাদাকে চোর বললেন—তাই দাদা আমাকে নিয়ে এখানে চলে এল। এখানে খুব আগে আমাদের বাড়ী ছিল। দাদা চাষাদের ছেলে পড়ায়, তাই তারা চাল ডাল দিয়ে যায়। তাতেই আমাদের চলে। দাদা বলে, বাঁশগাছিতে আর যাবে না—সেখানকার লোকগুলো দাদাকে যদি আবার চোব বলে! গোবিন্দবাবুর ছেলে দাদাকে বড় বকেছিলেন।" বালিকার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

প্রবোধ গম্ভীব স্বরে কহিল, "তা, তোমার দাদা যদি চুরি করেন নি ত পকেট দেখালেন না কেন?"

বালিকা ছলছল-নেত্রে কহিল, "বাঃ, কেমন করে দেখাবে? গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে দাদার যে নিমন্ত্রণ ছিল। তাবা দাদাকে কমলালেবু, আঙুর, আপেল, এই সব খেতে দিয়েছিল। দাদা নিজে না খেয়ে সেগুলি চুপি-চুপি পকেটে করে আমার জন্যে নিয়ে আসছিল। পকেট দেখালে গোবিন্দবাবুর ছেলেটেলেরা পাছে ঠাট্টা করেন, তাই দাদা পকেট দেখায় নি। দাদা যখন যেখানে খেতে যায়, তখনই নিজে না খেয়ে আমার জন্যে, ভাল যা কিছু সব নিয়ে আসে। আমি এত বারণ করি, তবু দাদা শোনে না।"

প্রবোধের হৃদয় অসহ্য বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হায়! শুধু স্নেহের অনুরোধে বৃদ্ধ সে রাত্রে দারুণ অপবাদ বহন করিতে কাতর হয় নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধ কহিল, "তোমার বাবা মা কোথায়?"

" স্বর্গে।"

নীরার চোখে জল আসিয়াছিল। প্রবোধ কহিল, "তাঁদের কথা তোমার মনে পড়ে ?"

"না। দাদা বলে, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম।"

প্রবোধের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটি কাতর স্বর বাহির হইল, 'আহা!' প্রবোধ ভাবিল, ইহাদেব প্রতি সে কি গভীর নৃশংসতা করিয়াছে! এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার একমাত্র আশ্রয়, সেই হতভাগ্য বৃদ্ধকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাকে কি বর্ব্বরভাবেই না সে লাঞ্ছিত করিয়াছে! হায়, কি করিলে সে গভীর পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হয়? প্রাণ দিলেও যদি এ পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হয় ত তাহাতেও প্রবোধ প্রস্তুত আছে!

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ডাকিল, "দিদি!"

"কেন, দাদা ?"

"আমাব কাছে একবার আয় না, ভাই!"

বৃদ্ধেব শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরা তাহার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিল, "এত বড় পৃথিবী, কিন্তু তোকে কার কাছে রেখে যাব, দিদি ?"

বালিকা রুদ্ধস্বরে কহিল, "না দাদা, ও কথা বলো না, আমার বড় কান্না পায়। তুমি ভাল হবে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন।"

প্রবোধ ধীরে ধীরে ডাকিল, "নন্দবাবু!"

বৃদ্ধ অতি কষ্টে চোখ চাহিল। প্রবোধ কহিল, "আমাকে মাপ করবেন আপনি। আমি প্রবোধ, বাঁশগাছির গোবিন্দবাবুর ছেলে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমিই আপনাদের এ দুর্দ্দশার কারণ। বলুন, কি করলে এখন আপনাকে একটু শান্তি দিতে পারি ?”

বৃদ্ধের মৃত্যুচ্ছায়া-মলিন মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। শীর্ণ হাতখানি নীরার অঙ্গে স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে বৃদ্ধ বলিল, “নীরাব আর কেউ নাই। ওকে দেখো।”

প্রবোধ কহিল, “আমার একটি মাত্র ছেলে, সুবোধ। তার সঙ্গে আমি নীরাব বিবাহ দিব, প্রতিজ্ঞা করছি। বলুন, এতে আপনার মত আছে ?”

বৃদ্ধ প্রবোধের দিকে চাহিল। তাহার নয়ন-প্রান্তে কৃতজ্ঞতার দুই বিন্দু অশ্রু, মুক্তার মত, গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কহিল, “নীরা সুখী হবে, ভগবান তোমার ভাল করুন!” বৃদ্ধ স্থির হইল। নীরার হাতখানি আপনার বুকের উপর টানিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, “সুখী হও, নীরা, দিদি আমার!” তাহার পর কণ্ঠ নীরব হইল।

প্রবোধ দেখিল, সব ফুবাইয়াছে। বৃদ্ধের জীবন-দীপ চির-দিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আশ্রয়হীনা নাতিনীটির সংস্থান করিয়া দিবার জন্যই যেন এতক্ষণ সে জীবিত ছিল।

নীরা বৃদ্ধের বুকের উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল, “দাদা—”

কে উত্তর দিবে? তাহার স্নেহময় সরল-হৃদয় দাদা আজ এতদিন পরে ছুটি পাইয়াছে! আজ তাহার সকল দুঃখ, সকল শোকের অবসান হইয়া গিয়াছে!

নীরা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুরানো চিঠি

টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়াছিল।

জমিদার রুদ্রনারায়ণ কম্পিত হস্তে পত্র দুইখানি তুলিলেন। প্রথমখানির হস্তাক্ষর দেখিতেই তাঁহার শিরায় দ্বিগুণ বেগে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইল। এতদিন পরে তবে হরেন্দ্র পত্র লিখিয়াছে।

সে আজ কতদিনের কথা। প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল। রুদ্রনারায়ণ প্রত্যহই ভাবিতেন, কাল তাহার পত্র আসিবে। কিন্তু পত্র আসে নাই। আজ এখন বহুদিন পরে সেই চিরবাঞ্ছিত সে পত্র আসিলে, পুত্রের প্রতি পিতার রোষ-বহ্নি অতিরিক্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সেদিনকার প্রত্যেক কথা রুদ্রনারায়ণের মনে পড়িল। এই ঘরে এই স্থানেই কথা হইয়াছিল। ঐ স্থানে যথায় পেণ্ট-করা দেয়ালের গায় লম্বিত ছবির উপর প্রভাত-সূর্য্যের তরুণ স্নিগ্ধ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই নিম্নে পুত্র দাঁড়াইয়াছিল। এখন ফাল্গুন মাস। বসন্তের নিশ্বাস-সমীর-স্পর্শে জগৎ সুপ্তোত্থিত, বিহঙ্গের কল-সঙ্গীতে মুখরিত। তখনও সেই শোভা-সম্পৎ-শালী বসন্তের রাজত্ব। দিনটি এমনই প্রশান্ত ও কোমল। তাঁহার মনে পড়িল, তখন বারাণ্ডার পশ্চিমে

কানন-তরুর শাখায় বসিয়া একটা ঘুঘু সকরুণ তান ধরিয়াছিল, এখনও না সেই তান শুনা যায়! এমনই সময়ে ব্যথিত পুত্র অভিমান-কাতর স্বরে বলিয়াছিল, "বাবা, আমি এমন কিছু অন্যায় করি নাই। ভদ্রবংশ-সম্ভূতা দরিদ্রা বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার মর্য্যাদার তিলমাত্র হানি করি নাই। তবে পাছে অমত করেন, এই ভয়ে আপনাকে জানাইতে সাহস পাই নাই, ইহাই শুধু আমার দোষ।" তাহার উত্তরে পিতা অবিচলিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "হয় তাহাকে ত্যাগ কর, নয় জীবনে আর আমার বাড়ীতে কখনও আসিয়ো না।" এই কথায় সাশ্রু নয়নে তরুণ পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ চিরদিনের স্নেহ-ঋণ ভুলিয়া গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছিল।

রুদ্রনারায়ণ অনেকখানি আশা করিয়াছিলেন। রামনগরের জমিদারের একমাত্র কন্যা, রামনগরের বিষয়-সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী পুণ্যপ্রভার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন, এবং এই বধূরত্নটির সাহায্যে আপনার ঐশ্বর্য্য-সম্পদটিকেও সমধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন! স্নেহপরায়ণ পিতার এমন পরম শুভকর আশা-সূত্রের মূলে নির্ম্মম ও অবাধ্য পুত্র কি না সবলে কুঠারাঘাত করিল! ইহাতে রুদ্রনারায়ণের চিত্তের রৌদ্রভাবধারণ অসঙ্গত নহে ত! আবার তাহার উপর তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এক অপদার্থ দরিদ্র নাগরিকের কন্যাকে পুত্রটা বিবাহ করিল! লীলাবতীর রূপ-লাবণ্য আছে ত কি হইয়াছে! দরিদ্র বংশের কন্যা কি সম্ভ্রান্ত কুলের বধূর রীতি-নীতি বুঝিয়া চলিতে

পারে? অসম্ভব! তদ্ভিন্ন আর্থিক লাভও ইহাতে কিছু মাত্র দেখা যায় না।

রুদ্রনারায়ণ পত্রের খামখানি আর একবাব নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন; পরে ভাবিলেন, নিশ্চয় এ পত্রখানা অনুতপ্ত পুত্রের নিকট হইতে ক্ষমাব প্রার্থনা বহন করিয়া আনিয়াছে—ইহাতে লেখা আছে, আপনাব মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। এখন আমার সে ভ্রম আমি বেশ বুঝিয়াছি। এ বিবাহে একদিনেব জন্যও সুখী হইতে পারি নাই। লীলার মৃত্যু হইয়াছে। আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

আশায় উন্মত্ত হইয়া তিনি পত্র খুলিলেন, কিন্তু কি এ! তাঁহার বোধ হইল, বুঝি চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছে! হরেন্দ্র লিখিয়াছে, তাহারা সুখে আছে, খুব সুখে আছে! এ বিবাহে চির-ঈপ্সিত শান্তি লাভ করিয়া হরেন্দ্রর জীবন এক সুমহান আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে। অন্নের জন্য তাহাকে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। সুদূব মফঃস্বলে প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করিয়া ছাত্রগণের সম্মানে ও সহযোগিবর্গের স্নেহ-বাৎসল্যে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই তাহার দিন কাটিতেছে। জীবনে তাহার কিছুরই অভাব নাই। আবার অবসাদহীন নির্ম্মল জীবনে নবীন অতিথি, পুত্র 'খোকা' তাহাদের চিত্তে সুখের শুভ্রোজ্জ্বল আলোকের প্রভা বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

পুরানো চিঠি

হরেন্দ্র লিখিয়াছে, "আশা করি, এত দিনে আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। পুত্র দোষ করিলেও পিতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। আপনি কি বিনাদোষেই আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন—আমরা নির্দোষ!

"কথাটা আপনাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি। প্রেসিডেন্সী কলেজে যতীশ আমার সহপাঠী ছিল। থার্ড ইয়ারে পড়িবার সময় যতীশের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়ে। আমি প্রায়ই যতীশদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। যতীশের পিতা-মাতাও আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

পিতার ঋণের দায়ে বাধ্য হইয়া যতীশকে লেখাপড়া ছাড়িতে হয়। অবশেষে নানারূপ দুর্ভাবনায় পড়িয়া দুই বৎসরের মধ্যেই যতীশের স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং তাহার মৃত্যু হয়। তখন আমিই যতীশ-দের সমস্ত ভার গ্রহণ করি। আপনি আমাকে যে টাকা পাঠাই-তেন, তাহাতে নিজের ব্যয় কোনরূপে সঙ্কুলান করিয়া আমি যতীশদের সাহায্য করিতাম। যতীশদের সংসারে তখন যতীশের হতভাগিনী মাতা ও কুমারী ভগ্নী লীলা। যতীশের মাতার শরীরও এই সকল দুর্ঘটনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে এক বর্ষা রাত্রে অভাগিনী বিধবা তাঁহার একমাত্র কন্যা লীলাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন্ অজ্ঞাত লোকে যাত্রা করিলেন। এমন অবস্থায় লীলাকে বিবাহ করায় কোন

দোষ হইয়াছে কি? যদি দোষ বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে এখন অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার পত্র পাইলেই আমরা খোকাকে লইয়া—”

রুদ্রনারায়ণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল, ধরণী যেন কক্ষ-চ্যুত হইবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে—তিন জনকেই অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র, সুবিস্তৃত সুন্দরগড়ের ভাবী জমিদার, আজ কি না সামান্য উদরান্নের জন্য মাষ্টারী করিতেছে? অসহ্য!

শিরায় শিরায় রুদ্রনারায়ণ যেন বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন। না, না, কাহাকেও মার্জ্জনা নহে। এ জীবনে তাহারা এ গৃহে আর পদার্পণ করিবে না। তাঁহার সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবাধ্য পুত্রের রূপ-লালসার জন্য তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না!

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রুদ্রনারায়ণ আবার চেয়ার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অর্দ্ধপক্ক কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া দ্বিতীয় পত্রখানির প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। একটা বড় খামে সে পত্রখানি তখনও টেবিলের উপর পড়িয়াছিল। খামখানা খুলিতেই এক টুক্‌রা কাগজ ও স্বতন্ত্র খামে মোড়া আর একখানা চিঠি রুদ্রনারায়ণের চোখে পড়িল। কাগজের টুকরাটায় লেখা আছে,—“শারীরিক কুশল জানিবেন। আপনার নিকট হইতে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়াছি, তাহার মধ্যে অত্র-

সংক্ষিপ্ত পত্রখানি ছিল। পত্রের খামখানি কখনও খোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ হস্তাক্ষর-দৃষ্টে এখানি স্ত্রীলোকের পত্র বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইলাম। গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পাঠ করিতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিবে। অপরের পত্র পাছে হারাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করি; সুতরাং পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন। শ্রীভগবানের নিকট নিত্য আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি।

ইতি নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ ন্যায়ালঙ্কারস্য।"

দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিতেই বহুদিনকার একটা হারাণো স্মৃতির তরঙ্গ তাঁহার বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্দাম বাসনার একটা তীব্র হিল্লোল তাঁহাব প্রৌঢ় প্রাণখানাকেও ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল। এ যে তাঁহারই একটা পাপের সাক্ষ্য!

সে-ও অনেক দিনের কথা। প্রায় বার-তের বৎসরের ঘটনা। তখন হরেন্দ্রনারায়ণের জননী জীবিতা ছিলেন। যখন হরেন্দ্র-জননী বহু সাধ্য-সাধনায়, বহু ক্রন্দন-অভিমানেও পতির দর্শন পাইতেন না, যখন উচ্ছৃঙ্খল পতি পাপিনী-সংসর্গে আপনার জীবন-স্রোত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, এ

তখনকার কথা। তাহার পর হরেন্দ্রর জননীর মৃত্যু হইয়াছে।

অন্তিম শয্যায় পত্নীর কাতর অশ্রুতে রুদ্রনারায়ণের চরিত্র-গতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার প্রবৃত্তি কি কুৎসিতই না ছিল!

গৌরী রুদ্রনারায়ণের মৃত নায়েবের আশ্রয়-হীনা রূপবতী পত্নী। রুদ্রনারায়ণের প্রতারণায় মজিয়া হতভাগিনী পাপের পথে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিল। এ পত্র, সেই গৌরীর। গৌরী লিখিয়াছে,

"প্রিয়তম

এত সাধিয়া কাঁদিয়াও তোমার দর্শন মিলিতেছে না। এখন জানিলাম, তুমিও আমাকে ঘৃণা কর। কেন না করিবে, বল? আমার ন্যায় পাপিনীকে ঘৃণা না করাই যে অসম্ভব। কিন্তু প্রিয়তম, আমার এ দশা কাহার জন্য? আমি শুধু তোমাকেই জানিতাম। শুধু তোমার ভালবাসার জন্যই কূল মান সব ত্যাগ করিয়াছি। আমার কিছুই ত আমি তোমার নিকট লুকাই নাই। তোমার নিকট আমার হৃদয় মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম ত। তবু তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে, এবং তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দিয়াছিলে! আজ তবে একটি বারও দেখা পাই না কেন? আজ যদি সত্যই আমাকে ঘৃণা কর, তাহা হইলে—? তাহা হইলে আর আসিয়ো না, আর দেখা দিয়ো না। আমি আর তোমার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইব না।

"আজ দুই মাস তোমার দেখা পাই নাই, সে জন্য কি কষ্ট

সহ্য করিতেছি, তাহা আমিই জানি! তুমি বলিবে, আমার অন্ন-বস্ত্র, অর্থ-ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী কিছুরই ত অভাব নাই। তাহা সত্য, প্রিয়তম, কিন্তু আমি কি তুচ্ছ অর্থ ও অন্ন-বস্ত্রের জন্যই তোমার চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছি! এ দুঃখ আর সহিতে পারি না,—এত বল আমার প্রাণে নাই!

"প্রিয়তম, এত দিনে আমার মোহ কাটিয়াছে! এখন বুঝিয়াছি, হৃদয়-প্রাণ দিয়া কেবল আমি কলঙ্ক কিনিয়াছি! যাই হোক, তোমাকে ত সুখী করিয়াছিলাম, ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা!

"আজ সব শেষ। আপনাকে কখনও আমি বুঝাইতে পারি নাই, তবু বিশ্বাস কর, আর আমি তোমার পথে দাঁড়াইব না। আজ আমার সব ভুল সব দোষ মার্জ্জনা করিয়া হে আমার জীবন-দেবতা, প্রসন্ন চিত্তে আমাকে বিদায় দাও! তোমার চরণে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা! আজ আমি জন্মের মত চলিলাম। আর আমার দেখা পাইবে না! এ পৃথিবীতে কলঙ্কিনী গৌরীর নাম আর কখনও শুনিবে না! আজ বিদায় দিতে যদি তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল আসে ত সেটুকু জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিয়ো না। বিদায়ের দিনে শুধু এক ফোঁটা চোখের জলও কি তোমার কাছে চাহিতে পারি না?

গৌরী।"

আহা! অভাগিনী আর তাহার হৃদয়-দেবতার দর্শন পায় নাই! যে আপনার সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিয়া, একমাত্র রুদ্রনারায়ণকেই

আশ্রয় করিয়াছিল, যাহার হাসি, অশ্রু, গান, কথা ও বেশভূষা সমস্তই রুদ্রনারায়ণের সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল, আজ কোথায় সে, কোথায় সে ? রুদ্রনারায়ণের চিত্ত-সমুদ্রে পবনবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ন্যায় এই আকুল প্রশ্ন বারবার উত্থিত হইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রুদ্রনারায়ণেব মোহ ভাঙ্গিল। এতক্ষণ স্বপ্নে যেন তিনি কাহার আকুল বিলাপ-সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। চোখের জল মুছিয়া রুদ্রনারায়ণ পত্র লিখিতে বসিলেন,—

"স্নেহাস্পদেষু,

হরেন, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য মনে আর ক্ষোভ রাখিয়ো না। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, এবং হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। বৃদ্ধ পিতার উপব কি এতটা অভিমান করিতে হয় ?

"পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবে। বধূমাতা ও খোকাকে দেখিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। আমার শরীর ও মনেব অবস্থাও ভাল নয়। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরুদ্রনারায়ণ রায়।"

বাহিরে পথে খঞ্জনী বাজাইয়া একটা ভিখারী গান গাহিতেছিল,—

"মুছে ফেল্ মা, নয়নের জল, হাস্ মা মুখে মধুর হাসি,
নীলমণি তোর আস্‌ছে ফিরে, ঐ বুঝি তার বাজে বাঁশী !"

শাস্তি

রায়গঞ্জের উমাচরণ বসু যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে পত্নীর অনুসরণ করিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদচন্দ্র বিবাহিত এবং সবে মাত্র এফ, এ পাশ করিয়াছে। কনিষ্ঠ প্রমোদচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে বিধবা পিসিমার আদরে ঘুড়ি-লাটাই লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, এবং তাহার শৈশবের অমূল্য সময়টুকু রায়গঞ্জের জমিদার বাবুদের এণ্ট্রান্স স্কুলে অতিবাহিত না হইয়া রামধন মুদি ও মদন কলুর দোকান-ঘরেই কাটিতে লাগিল। বিনোদচন্দ্র রামনগরে শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া বি, এ, পড়িত, এবং মহার্ঘ্য অবসরটুকু বৃথা নষ্ট না করিয়া জরির ফিতা, পশম ও এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিয়া আপনার বালিকা পত্নীর হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিবার মহৎ সংকল্পে অহরহ ব্যস্ত থাকিত।

অবশেষে একদিন আইন পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিনোদচন্দ্র ওকালতি করিবার জন্য রায়গঞ্জের জেলা-কোর্টে সামলা মস্তকে বহির্গত হইল, এবং চতুর্থ শ্রেণীতেই সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রমোদচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন-পরিপাক-কার্য্যে অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিল।

বিনোদচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী মোহিনীসুন্দরী কিন্তু প্রথম হইতেই

এই অকর্ম্মণ্য দেবরটিকে তেমন স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিল না। পিসিমার ভয়ে সে কখন আপনাব হৃদয়ের অপ্রীতি ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, প্রমোদচন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, তাহার চালচলন কথা-বার্ত্তা প্রভৃতি সমস্তই বধূঠাকুরাণীর নিকট নিতান্ত অশোভন দেখাই-তেছে। এ জন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়া সে বেচারা রামধনের দোকানে গান গাহিয়া ও তবলা বাজাইয়াই দিবসের অধিকাংশ সময় অবাধে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। তার পর পিসিমার অশ্রু, অনুরোধ ও আবেদন প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া, শঙ্খরোলে সমগ্র পল্লী সচকিত করিয়া অবশেষে প্রমোদচন্দ্র একদিন নববধূ গৃহে আনিল।

বধূটির নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর রূপে এমন একটি স্নিগ্ধ লাবণ্য বিকশিত ছিল যে, তাহা দেখিয়া পল্লীবাসিনীগণ সকলেই তাহার প্রশংসা করিল। চক্ষু-দুইটিতে এমন কমনীয় করুণ ভাব ও সমগ্র দেহশ্রীতে এমন একটি সলজ্জ সঙ্কোচ বর্ত্তমান ছিল যে, দেখিলে মেয়ে-টিকে ভাল না বসিয়া থাকা যায় না। স্বর্গগত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়া পিসিমা সাদরে নববধূকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। বিনোদচন্দ্র আসিয়া বধূর মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। কেবল বধূর রূপের প্রশংসায় মোহিনীর হৃদয়ে হিংসার বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল।

২

তাহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এ কয় বৎসরে বিনোদচন্দ্রের সংসারে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পিসিমার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহার একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসিমার মৃত্যুর পর মোহিনীর হৃদয়-সঞ্চিত বহ্নি-কণাটুকু দীপ্যমান হইয়া শত সহস্র ছিদ্র-পথ দিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতে উদ্যত হইল!

রাত্রে শয্যায় পড়িয়া লক্ষ্মী যখন নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, তখন প্রমোদ আসিয়া সাদরে তাহার মুখে চুম্বন করিয়া অশ্রু মুছাইয়া কহিত, "গুরুজনের কথায় দোষ ধরতে নাই। ছি লক্ষ্মী, কেঁদো না। সব সহ্য করে থাক।" সে আদরে লক্ষ্মীর হৃদয়েব সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া যাইত। স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া সে অশ্রু-প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিত! প্রমোদ কহিত, "আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে, আর কারো সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হত লক্ষ্মী তা হলে তুমি সুখী হতে!" এই কথায় লক্ষ্মী স্বামীর বক্ষ হইতে মস্তক তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিত, "যাও, তোমার ও কথা বলা কিন্তু ভারি অন্যায়!" লজ্জায় সহসা লক্ষ্মীর কথা বাধিয়া যাইত, সে আব কিছু বলিতে পারিত না।

একদিন মোহিনীর চট্ করিয়া মনে পড়িল যে, তাহার নির্ব্বোধ স্বামীটির প্রতি চতুর দেবর নিতান্ত অবিচার করিতেছে! একজন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, আর একজন নিশ্চিন্ত মনে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে, ইহা ভাবিয়া তাহার নিরপেক্ষ দয়ার্দ্র নারী-হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল! সেদিন দেবর যখন ভোজনকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তখন মোহিনী নিকটে বসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো একটা কথা আছে!"

"কি কথা, বৌদি?"

"এই, ভাই, তোমার দাদা তোমাকে একটা চাকরির চেষ্টা দেখ্‌তে বল্‌ছিলেন।"

মৃদু হাসিয়া প্রমোদ কহিল, "হুঁ, চাকরি! এতদিন পরে হঠাৎ চাকরির চেষ্টা যে!"

মুখটা একটু ঘুরাইয়া মোহিনী কহিল, "কি জানি, ভাই! তবে উনি বল্‌ছিলেন যে, 'আমি একা কাঁহাতক পেরে উঠি? আর একা কতই বা উপার্জ্জন করবো'?"

প্রমোদ কহিল, "ছেলে বেলা থেকে নিজেকে আমি যে ভাবে গড়ে তুলেছি, তাতে সুস্থির হয়ে যে কোন কাজকর্ম্ম করতে পারব এমন ত মনে হয় না। আর তা ছাড়া চাকরি আমাকে কে দেবে বলত, বৌদি?"

মোহিনী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তা আমি মেয়েমানুষ, সে কথা কি জানি, বল? তবে উনি বল্‌ছিলেন কি না যে, 'হাত পা আছে! আপদে-বিপদে স্ত্রী-পুত্রের জন্য-আমারও ত একটা সংস্থান করা চাই!"

প্রমোদ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তা হলে দাদা কি আমাদের ত্যাগ করবে না কি?" মোহিনী কোন উত্তর দিল না।

আহারের পর জলের গ্লাস মুখ হইতে নামাইয়া প্রমোদ কহিল, "দাদা যদি এমন কথা বলে থাকে, তবে আজ থেকে চাকরির চেষ্টায় থাক্‌বো!" অভিমানে প্রমোদচন্দ্রের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এ দিকে মোহিনীসুন্দরী অন্তরালে নির্ব্বোধ স্বামীর বুদ্ধি

মার্জ্জিত করিতে এতটুকু নিশ্চেষ্ট ছিল না। কৃষক যেমন কঠিন মৃত্তিকাকে অবিরাম বারি-বর্ষণ দ্বারা উর্ব্বর ও বীজ-বপনের যোগ্য করিয়া তুলে, এই বুদ্ধিমতী রমণীটিও তেমনই তাহার স্বামীর হৃদয়-ক্ষেত্রটিকে কখনও অশ্রু-বর্ষণে, কখনও বা উপদেশ-ধারা-সেচনে ক্রমশঃ উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছিল।

রাত্রে মোহিনী স্বামীকে কহিল, "ঠাকুরপো বল্‌ছিল চাকরি করবে!"

বিনোদচন্দ্র তখন নিবিষ্ট চিত্তে একটা মকদ্দমার কাগজে জজের রায় দেখিতেছিল। তাহার উপর হইতে চক্ষু না তুলিয়াই সে কহিল, "বটে! তা এ চাকরি দিচ্ছে কে?"

মোহিনী ধীরে ধীরে কহিল, "কলকেতায় কে ওর বন্ধু আছে, সেই নাকি করে দেবে।"

বিনোদচন্দ্র কাগজ দেখিতে দেখিতে কহিল, "সে ত আর তোমাদের মত পাগল হয় নি! চাকরি গাছের ফল নয় ত যে পেড়ে দিলেই হল! কি লেখা-পড়া জানে, যে চাকরী করবে?"

ছোট-একটু ভ্রূকুটি করিয়া মোহিনী কহিল, "ঐ তোমার এক কথা, বাবু! ও ত আর বলছে না যে জজ হব! যেমন বিদ্যে, তেমনি চাকরি করবে বলছে!"

বিনোদচন্দ্র কহিল, "কেন, এত কি অভাব পড়ে গেল হঠাৎ যে, চাকরির জন্য মাথা-ব্যথা ধরেছে?"

পানের ডিবাটা বিনোদচন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া মোহিনী কহিল, "কেন প্রায়ই ত বলে, 'পরের ভাত খেয়ে আর

থাকতে পারি না! নিজের পায় ভর করে দাঁড়াবো, কারও কাছে কোন জবাবদিহি থাকবে না।"

বিনোদচন্দ্র মকদ্দমার কাগজখানা রাখিয়া দিল।

মোহিনী কহিল, "ছোট বৌকে ও বাঘের মত ভয় করে! ছোট বৌ কি কম শোনায়? ছোট বৌ কত বলছিল, 'পুরুষ মানুষ হয়ে পরের ভাত খেতে লজ্জা করে না? যার খেটে খাবার সাধ্যি নেই, তার আবার বিয়ে করা কেন?' তা আমি বল্লুম, 'বড় ভাইয়ের খাবে, বড় ভাই কি আর পর হল!' শুনে আমাকে এমন মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠল!"

বিনোদ কহিল, "প্রমোদ কি বল্লে?"

মোহিনী কহিল, "ঠাকুরপো বল্লে, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবাইকেই জানি! চাকরি একটা জোটাতে পারলে কি আর এখানে পড়ে থাকি?"

"বটে!" বলিয়া বিনোদ গম্ভীর হইল।

৩

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোন অশুভ সংকল্পে আপনার সমস্ত শক্তি পরিচালিত করে, তখন বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া এমন একটি নিগূঢ় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেন যে, একদিন তাহা বজ্রের ন্যায় পাপীর হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহার সমস্ত সংকল্প বিধ্বস্ত করিয়া দেয়! যখন মোহিনী এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন-ছেদন ও গৃহবিচ্ছেদ-কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়টুকুর মধ্যে তাহার শিশু পুত্র নলিন

আপনার সুকোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়া কাকাবাবু ও কাকিমাকে নিবিড় বন্ধনে বেষ্টন করিতেছিল। তাহার প্রতি কাকাবাবু ও কাকিমারও স্নেহের সীমা ছিল না। কাকাবাবু যেখানে যাইবে, নলিনকে সঙ্গে লইতেই হইবে, নচেৎ সে কাঁদিয়া-কাটিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিবে।

এইরূপে ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে নলিন কাকাবাবুর নিত্য সহচর হইয়া উঠিল। পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে মোহিনী বিরক্ত হইত, মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কারও করিত। কিন্তু পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ বিষয়ে সে অধিক হস্তক্ষেপ করিত না।

সেদিনও নলিন কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়াছে। বিনোদও সে দিন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বাহিরে কোথায় গিয়াছিল।

নলিনকে লইয়া প্রমোদ ফিরিয়া আসিলে মোহিনী বাতাসের সহিত কথা সুরু করিয়া দিল, "ছেলেটাকে আর বাঁচতে দেবে না, দেখছি! এত বেলা অবধি ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হল! ওটা ত মরেও না। দু চক্ষুর বিষ হয়েও বেঁচে আছে! কেন রে বাবু, তোর বিষয়ের বখরা নিতে যাচ্ছে না ত! আর ছেলেটাও হয়েছে তেমনই! 'কাকাবাবু' বল্‌তে অজ্ঞান, কাকাবাবু ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে!"

লক্ষ্মী প্রমোদকে কহিল, "শুনছ?"

"কি?"

"দিদি কি বলছে!"

ঈষৎ হাসিয়া প্রমোদ কহিল, "তোমার দিদির মাথা খারাপ হয়েছে!"

সন্ধ্যার পর বিনোদ বাড়ী ফিরিল। সেদিন কোর্টে একটা মকদ্দমায় হারিয়া বিপক্ষ পক্ষের উকিল কর্ত্তৃক সে বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাই মনটাও অত্যন্ত খারাপ ছিল! গৃহে ফিরিতেই নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রভাতের ক্ষুদ্র ঘটনাটি মোহিনী স্বামীর কর্ণে উপহার প্রদান করিল।

সয়তান ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া সরলা ঈভকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। আর মায়াবিনী মোহিনী যে প্রখর রূপের মোহে ও সুসম্বদ্ধ বচন-বিন্যাসে বিনোদচন্দ্রের মত একটি পত্নীপরায়ণ যুবকের দুর্ব্বল চিত্ত বশীভূত করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে!

মন্ত্র-দীক্ষিত বিনোদ বাহিরে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "প্রমোদ!"

"দাদা—" বলিয়া প্রমোদ বাহিরে আসিল।

বিনোদ কহিল, "তুমি চাকরির চেষ্টা দেখবে বলছিলে, তাই দেখ। এ বাড়ীতে সকলের অসুবিধা হচ্ছে, অন্যত্র থাকলে ভাল হয়! দিবারাত্রি এ সব খিটিমিটিও আমার আর সহ্য হয় না!"

অবনত মস্তকে প্রমোদ কহিল, "বল, কোথায় যাব!"

বিনোদ এক-নিশ্বাসে কহিল, "এ বাড়ীর অংশ যা আছে, তার

ন্যায্য দাম দেব, তা ছাড়া আরও কিছু টাকা তোমায় দেব, তুমি চাকরির চেষ্টা দেখ। অবশ্য বাড়ীর অংশ——"

বিনোদের কথায় বাধা দিয়া প্রমোদ কহিল, "কিছু দরকার নেই, দাদা! সে সব নলিনীর জন্য থাক্।"

বিনোদ কহিল, "না, না, তোমার চল্‌বে কিসে?"

প্রমোদ কহিল, "তার জন্য কিছু ভেবো না, দাদা! আমি সে ঠিক করে নেব!"

"মনে করো না প্রমোদ, আমি তোমায় ফাঁকি দেব!"

"এমন কথা কোনদিন ত আমার মনে হয়নি, দাদা! আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছ, তুমি। তোমার ঋণ কখনও শোধ দিতে পারব না। আমার সহস্র দোষ আছে, ছোট ভাই বলে তা মাপ করো।"

* * * *

নানাবিধ উপকার-সহায়তা প্রভৃতির দ্বারা প্রমোদ সমগ্র পল্লীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার আবার আশ্রয়ের অভাব! সেই রাত্রেই উত্তম মণ্ডলের খাপরার ঘর ঠিক করিয়া আসিয়া সে দাদাকে প্রণাম করিতে গেল, কহিল, "দাদা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখনও মনুষ্যত্ব না হারাই!" বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। অনুতাপে, যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কতবার সে ভাবিল, প্রমোদের দুই হাত ধরিয়া ফিরাই! বলি, 'অভিমান করে কোথায় যাচ্ছিস ভাই?' কিন্তু—না, লজ্জা করে!

মোহিনীকে প্রণাম করিয়া প্রমোদ কহিল, "বৌদি, তুমি

বড় হচ্ছ, গুরুজন হচ্ছ! রাগ রেখো না, আমাদের মাপ করো।"

লক্ষ্মী কহিল, "নলিকে একটিবার দেখতে দেবে, দিদি?"

"না ভাই. সে এখন ঘুমোচ্ছে, তাকে আর জাগিয়ো না।"

"সে ঘুমোচ্ছে,—তবে থাক্, দিদি! এখান থেকেই তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, সে যেন চিরজীবি হয়ে থাকে!"

প্রমোদ ও লক্ষ্মী সরিয়া আসিলে মোহিনী কহিল, "একেবারে ডাইনে মায়ায় ছেলেটাকে ঘিরে রেখেছিল! এবার ছেলেটা বাঁচবে বলে ভরসা হচ্ছে!" কথাগুলা প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল! সে শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে কহিল. "ভগবান, এ সমস্ত অকল্যাণ থেকে আমার নলিনকে রক্ষা করো! কোন অমঙ্গল যেন তাকে না স্পর্শ করে!"

পরে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে প্রমোদ অশেষ সুখ-দুঃখের স্মৃতি-মণ্ডিত আজন্মের গৃহ ত্যাগ করিল। দারুণ বেদনায় তাহার অস্থি-পঞ্জরগুলা অবধি চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল!

৪

পরদিন প্রভাতে নলি যখন তাহার কাকাবাবু ও কাকিমাকে কোথাও দেখিতে পাইল না, তখন সে অস্থির হইয়া উঠিল। মাতা আসিয়া পুত্রকে প্রহার করিয়া কহিল, "কাকাবাবুর উপর যে ভারী টান দেখছি!"

বিনোদ কহিল, "কেন, ছেলেটাকে মারছ?" পিতাকে

দেখিয়া নলি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাকাবাবুল কাছে দাব, বাবা!"

কাকাবাবু ও কাকিমাকে সেদিন নলি অনেক বার খুঁজিল, পরে তাহাদের অভাব বালকের অসহ্য বোধ হইল! মনের কষ্টে ও দুর্ভাবনায় একদিন অপরাহ্নে নলির জ্বর আসিল, এবং সেই জ্বর প্রবল বিকারে পরিণত হইল। বিকারের ঘোরে শিশু বার বার তাহার কাকাবাবুকে ডাকিতে লাগিল। অপরাধী বিনোদ মানসিক দুর্ব্বলতায় প্রমোদকে ডাকিতে সঙ্কোচ বোধ করিল।

অবশেষে একদিন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় রোগতপ্ত শিশু তাহার মানব-জীবনের সমস্ত অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া, শুভ্র অকলঙ্ক হৃদয় লইয়া ভগবানের চরণ-প্রান্তে যাইয়া শান্তিলাভ করিল।

যেদিন নলি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার পরদিন প্রভাতে প্রমোদ নিতান্ত অপরাধীটির ন্যায় আসিয়া বিনোদচন্দ্রের দ্বারদেশে দাঁড়াইল। শিশুর পীড়ার সংবাদ তাহাকে কেহই জানায় নাই। এ দুর্ঘটনার বিষয় সে কিছুই জানিত না। বহুদিন নলির সংবাদ না পাইয়া তাহার ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই আজ প্রমোদ কম্পিত হৃদয়ে, যে গৃহ হইতে একদিন চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া ধীর স্বরে বাহির হইতে সে ডাকিল, "নলি!"

কেহ উত্তর দিল না! একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার

সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। দ্বারের নিকট আর একটু অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে সে আবার ডাকিল, "নলি!" এবারও কোন উত্তর নাই!

তবে কি নলির অসুখ করিয়াছে? হে ভগবান, তাহাকে সুস্থ করিয়া দাও! প্রমোদ আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা।" তবু কোন উত্তর নাই!

অবশেষে সাহসে ভর করিয়া প্রমোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে ডাকিল, "বৌদি!" সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কাহার রোদন-ধ্বনি শ্রুত হইল! আশঙ্কায়, ভাবনায় অস্থির হইয়া প্রমোদ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল!

মোহিনী বসিয়াছিল। প্রমোদকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে কাঁদিয়া উঠিল! কহিল, "ঠাকুরপো এসেছ? এস ভাই, বস!"

প্রমোদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "নলিকে শুধু একটিবার দেখতে এসেছি! এখনই যাব।"

মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার নলিকে তুমি ফিরিয়ে আনো, ঠাকুরপো! ফিরিয়ে আনো—"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমোদ কহিল, "কেন, কোথায় গেছে, নলি?"

"সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চিরকালের জন্য চলে গেছে গো! তাকে তুমি ফিরিয়ে আনো, ঠাকুরপো, ফিরিয়ে আনো! আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে—"

এ্যাঁ! সে কি কথা! নলি নাই?

প্রমোদ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িল। মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "শেষ পর্য্যন্ত সে তোমাকে দেখতে চেয়েছিল, তবু আমি হতভাগী তোমায় ডাকি নি!"

প্রমোদ চোখের জল মুছিল। এমন সময়ে আর্দ্র কণ্ঠে বিনোদ ডাকিল, "প্রমোদ!"

"দাদা—" বলিয়া প্রমোদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জড়িত কণ্ঠে বিনোদ কহিল, "প্রমোদ, বাড়ী এস, ভাই! আমি দাদা হচ্ছি, আমার কোন অপরাধ মনে রেখো না! ছোট বৌমাকে নিয়ে এখনই বাড়ী এস!" প্রমোদ কিছু বলিল না। তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নলি এ জগতে নাই। সে কি কথা! বিনোদ কহিল, "আমার মতিভ্রম হয়েছিল, সে সব কথা মনে রেখো না। ছোট বৌমাকে নিয়ে এস গে।"

বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে প্রমোদ ডাকিল, "দাদা।"

"ভাই!" বলিয়া বিনোদ প্রমোদকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। উভয়েরই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। মোহিনী চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমার মত পাপী নেই গো! এ সব আমারই পাপের শাস্তি। নলি আমাকে খুব শাস্তি দিয়ে গেছে। ঠাকুরপো, আমাকে মাপ কর, ভাই! যাও, ছোট বৌকে এখনই নিয়ে এস। আর আমি এ শূন্য পুরীতে থাকৃতে পারচিনে!"

অসহ্য শোকের মধ্য হইতে আজ এই যে অপূর্ব্ব শান্তি-সঙ্গীত উত্থিত হইতেছিল, তাহা বিধাতার আশীর্ব্বাদের ন্যায়ই পবিত্র ও নির্ম্মল! আজিকার এই অশ্রু-ধারায় বহুদিনের সঞ্চিত হিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু হায়, যে ক্ষুদ্র শিশু তাহার সুকোমল নির্ম্মল প্রাণপুষ্পটি মৃত্যুর অনলে আহুতি দিয়া এই বিচ্ছেদাহত সংসারটিতে পুনর্ম্মিলনের নিবিড়তা দান করিয়াছে, সে এখন কোথায়!

ময়ূরপুচ্ছের বিপদ

সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বন্ধুবর শচীনাথের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। শচীর বৈঠকখানায় তখন ভারী ভিড়! দেশোদ্ধার-সমিতি, সাহিত্য-সেবক-মণ্ডলী, অনাথ-ভাণ্ডার প্রভৃতির প্রতি-নিধিবর্গ তাহাদের চক্‌চকে চাঁদার বহি বাহির করিয়া বন্ধুবরকে নিতান্তই কাবু করিয়া তুলিয়াছে! ঘরের এক পাশে একটি সাহেব চুরুট-মুখে একখানা খবরের কাগজের আড়ালে আপনাকে এতদূর প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে যে, তাহার মুখখানা দেখাই যাইতেছে না।

শচীর দয়া-দাক্ষিণ্যটুকু বেশ আছে, এবং সেটি নিতান্ত অকারণও নহে। শচীনাথ এটর্ণি। পাবলিক্ কাজে যোগদান করিলে পসার-প্রতিপত্তির স্ফূর্ত্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই তাহার বিশ্বাস। কিন্তু সে সব কথা এখানে সবিস্তারে খুলিয়া বলিয়া আপ-নাকে পিনাল কোডের ধারা-স্নাত করিবার প্রয়োজন দেখি না!

প্রতিনিধিবর্গকে যথাযোগ্য মিষ্ট কথা ও মুদ্রায় সন্তুষ্ট করিয়া শচী কহিল, "কি হে, দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

আমি কহিলাম, "চাঁদার ভয়ে আত্মগোপন করছিলাম!"

এমন সময় সাহেবটি কাগজ রাখিয়া কহিল, "হ্যলো বনার্জি, গুড্ ইভনিং।"

"আরে কে—লাহিড়ী! তারপর, খপর কি? ছুটিতে কোথাও বেরিয়ে পড়নি যে!"

নীহার লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার! সেই আমাদের কলেজের বাঙ্গাল নীহার, এখন পূরাদস্তুর সাহেব! অদৃষ্ট-চক্রের অলঙ্ঘনীয় গতি,—সন্দেহ নাই! কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!

ক্রিড়িরিং! বাহিরে বাইসিক্লের বেলের শব্দ শুনা গেল, এবং তাহা মিলাইতে না মিলাইতে সাহেব-বেশী জনৈক বাঙ্গালীর প্রবেশ! অভিবাদনান্তে কতকগুলা প্রয়োজনীয় কথা-বার্ত্তা চট্‌পট্ শেষ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

লাহিড়ী কহিল,"দেখলে হে বাঁড়ুয্যে, লোকটা সাহেবিয়ানাতে সবে এপ্রেন্টিসি সুরু করেছে।"

"কি রকম?"

"দেখলে না?"

"কি আবার দেখব হে?"

লাহিড়ী কহিল, "এঃ তোমাদের দৃষ্টি-শক্তিটা ভারী কমে গেছে! দেখলে না, লোকটা যতক্ষণ এখানে ছিল, কেবল টাইটা ধরে টানছিল—পাছে তার তলায় কলারের বোতামটা দেখা যায়! টুপিটা তেমন দস্তুরমাফিক রাখতে পারছিল না, অথচ তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না! নূতন সাহেবিয়ানা করবার সময় ও সব খুঁটিনাটিগুলোর জন্য ভারী বিব্রত হতে হয়! যদিও এগুলো কেউ

নজর করে না, তবু মনে হয়, যেন বিশ্বশুদ্ধ সবার চোখ ঐ খুঁত-গুলোর দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!"

আমি কহিলাম, "বহুৎ আচ্ছা! খাসা আবিষ্কার বটে! আবার বলবারও তারিফ্ আছে! বাঙ্গলা কাগজে প্রবন্ধ লেখ না কেন?"

লাহিড়ী কহিল, "তা বুঝি জান না—প্রথম সাহেবিয়ানা ধরবার সময় আমি কি বিপদেই পড়েছিলাম!"

"কৈ, না!"

"তবে শোন!"

শচী কহিল, "ওহে, সমস্ত দিন ঘরে বসে থেকে অসহ্য হয়ে উঠেছে! চল, একটু খোলা বার্ণ্ডাসে যাওয়া যাক্।"

লাহিড়ী আমাদের সহপাঠী। বরাবরই সে য়ুনিবার্সিটির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী সামান্য সেরেস্তাদারের পুত্র হওয়া-সত্ত্বেও, বি-এ পড়িবার সময়, মজঃফরপুরের ব্যারিষ্টার-প্রবর এস্ স্যানিয়ালের কন্যাকে বধূরূপে আয়ত্ত সে করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লাট-কৌন্সি-লের মেম্বর ব্যারিষ্টার 'স্যানিয়ালের' পরিচয়-প্রদান, বোধ হয়, অনাবশ্যক।

২

খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া ইজি চেয়ারে পা ছড়াইয়া লাহিড়ী একটা সিগার ধরাইল; দুই একটা টানের পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিল, "হাঁ, তারপর যাহা বলিতেছিলাম, তোমাদের, বোধ হয়, মনে আছে যে, বিবাহের পর, শ্বশুর মশায় বারবার অনুরোধ

করা-সত্ত্বেও আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিতাম না। তার প্রধান কারণ, য়ুনিবার্সিটি আমাকে হাজার মার্কা মারিয়া দিলেও, আমি সামান্য সেরেস্তাদারের পুত্রমাত্র এবং শ্বশুর মশায়, আজ এ স্বদেশীর দিনেও—সত্য কথা বলিতে আর হানি কি—পূরা রকম সাহেব! বাড়ীর পুরুষেরা কাপড়ের ধার ধারিতেন না, বিসদৃশ হইলেও ঢিলা পায়জামার একান্ত ভক্ত! বাড়ীতে রীতিমত খানা-টেবিল, পিয়ানো-বিলিয়ার্ড প্রভৃতির সরঞ্জাম, অর্থাৎ একেবারে চৌখসভাবে সাহেবী আর কি! তবে অন্তঃপুরের মধ্যে শাড়ীর প্রথাটা অবশ্য বয়কট হয় নাই! আর দেখিও ভাই, কাহাকেও প্রকাশ করিয়ো না, আমার এক শ্যালিকা ও শ্যালকপত্নীর চক্ষুদুইটি সুদৃশ্য চশমাবরণে মণ্ডিত! যাহাই হউক্, এ-হেন শ্বশুরালয়ে যাইতে আমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত। বল কি হে, বিবাহের পর চিঠিতে ছাড়া আমার প্রিয়তমা জোটি ওরফে জ্যোৎস্নাবালার সঙ্গে আর আলাপের সুবিধাই ঘটিয়া উঠে নাই। তোমরা যে কালে রাত দশটা-এগারটার সময়, আকাশ সহসা মেঘ-ভরা দেখিয়া মেঘদূতের শ্লোক আওড়াইয়া বাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গোপনে শ্বশুরবাড়ীর দিকে moonlight masquerade চালাইতে, সে সময় আমি বেচারী প্রিয়ার পত্র বুকে করিয়াই দীর্ঘ বিরহের রাত্রি কাটাইয়া দিতাম। যৌবনের সেই মধুময় মুহূর্ত্তগুলা এমনই বিফলে কাটিয়া গিয়াছে যে, সে কথা মনে হইলে এখনও চোখ ছল-ছল করে!

আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, বিলাতী এটিকেটগুলার

সহিত বেশ খানিকটা পরিচয় না হওয়া অবধি শ্বশুরবাড়ী যাইব না। সেখানে চাল-চলনে পাছে কেহ আমাকে 'বাঙ্গাল' ঠাওরায়, কাহারও কাছে পাছে কোন বিষয়ে আনাড়ি বনিয়া যাই—এইটাই ছিল বিষম আশঙ্কার কথা। কিন্তু, উঃ, ভগবান শেষে কি কঠিন শাস্তিই দিলেন!

শ্বশুরবাড়ী একদিন যাইতেই হইবে জানিতাম, বিশেষ যখন আরও স্থির ছিল, যে এম্ এ, পাশ হইলে শ্বশুর মশায় আমাকে বিলাত পাঠাইবেন! কাজেই ক্লাশে ডব্লিউ মিটার, গোভিন্ চন্দর-দের দলে অতটা ভিড়িতাম্। তোমরাও কি তখন আসল কারণ ঠাওরাইতে পারিয়াছিলে হে, কেবল ত ঠাট্টাই করিতে!

যাহা হউক, অবশেষে এম্, এ, একজামিনের পর শ্বশুর মশায়ের পত্রাঘাতে অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম! অন্তঃপুর হইতেও পত্র-শরের অভাব ঘটে নাই! সেগুলা যে আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্ম্মস্পর্শী, সে কথা বলাই বাহুল্য! তখন আমি "বিলাত-ফেরত"-সমাজরূপ ষ্টেজে নামিবার জন্য দস্তুরমত রিহার্স্যাল দিতে ব্যস্ত। কি করিয়া কাঁটা-চামচের ব্যবহারটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, কি রকমে টাই, কলার ও সার্টের প্লেটের মধ্য দিয়া আমার সাহেবিয়ানা পূর্ণ তেজে মাথা তুলিতে পারে, তাহারই নিয়মিত "জবরদস্ত" রিহার্স্যাল! একজামিনের পড়া লইয়াও ত মাতা যায়;—কিন্তু এ তার চেয়েও মাতিয়া উঠিয়াছিলাম। 'হোটেল', 'নিবাস', ও 'আশ্রমে' প্রত্যহ আহারাদি চলিতেছিল, সঙ্গে 'মোণি গুপ্টু'কে 'ল্যাংবোটের' মত বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। সে

আমাকে খানার আদব-কায়দা শিখাইত। কিন্তু গুপ্টু যে বড় বিশ্বাসযোগ্য 'সদ্‌গুরু' নয়, তার প্রমাণ পাইয়াছিলাম,—পরে বলিতেছি।

এইভাবে দিনকতক হোটেলাদিতে আনাগোনা করিয়া যখন মনে হইল, কাঁটা-চামচের ব্যবহার বেশ এক রকম 'রপ্ত' হইয়া আসিয়াছে, তখন বাবার কাছ হইতেও এক চিঠি আসিয়া হাজির—মজঃফরপুর যাইবার জন্য তাগিদ! ব্যস, সেইদিনই শ্বশুরমশায়কে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম, "সপ্তাহ-শেষে মজঃফরপুর যাচ্ছি।" অচিরে তিনি ট্রেণের ভাড়া, কোট-প্যাণ্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় তৈয়ার করাইবার 'পকেট-মনি' প্রভৃতি পাঠাইলেন, এবং প্রিয়া-দর্শন-প্রার্থী আমিও আসন্ন বিরহ-অপনোদনের আশায় ঈষৎ উল্লসিত হইয়া উঠিলাম!

দুই-চারি দিনের মধ্যে মহা-উৎসাহে ট্রাঙ্ক পোর্টম্যাণ্ট সাজাইয়া ব্যারিষ্টার-জামাতার যোগ্য বেশে শ্বশুর-মন্দির ভেটিবার শুভ উদ্দেশ্যে বোর্ডিঙের ভৃত্যকে হাবড়ার জন্য গাড়ী আনিতে আদেশ দিলাম। সে দিনের আনন্দ? ওঃ, সে ভাষায় প্রকাশ হয় না! দীর্ঘকাল পরে শ্বশুর-মন্দিরে প্রেয়সীর ভুজবন্ধন-প্রয়াসী কাতর বিরহী ভিন্ন সে উল্লাস সহজে কাহারও বোধগম্য হইবে না! তবে আনন্দের আতিশয্যে, বোর্ডিঙের বন্ধুগণকে সেদিন 'পেলিটি'-ভবনে 'বিশেষ ডিনারে' আপ্যায়িত করিয়া ছিলাম!

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় নিজের ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম। অথ নায়কের রাজবেশ-ধারণ! 'মোণি-গুপ্টু'র

শিক্ষায় সাহেবী-বেশটা বেশ এক রূপ অভ্যস্তই ত হইয়া ছিল, কিন্তু এখন আবার এ কি উপদ্রব! প্রত্যেক জিনিষটা যেন বিদ্রোহী হইয়া বসিয়া আছে! ইংরাজী বেশটার উপর হাড়ে চটিয়া গেলাম! বেশভূষাগুলা সংখ্যায় এত অধিক, আর জাতটার মতই তাহারা যেন কিছুতে বাগ মানিবে না, বরং অবনত মস্তকে আমাকেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে! উপদ্রব আর কাহাকে বলে? আগাগোড়া সব নূতন স্যুট ছিল। কলারকে অনেক কষ্টে আয়ত্ত করা গেল। পরে টাইটাকে লইয়া ত বিষম বিপদ! কিছুতেই তাকে বাগাইতে পারি না, কলারের মাঝামাঝি কিছুতে সে আসিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়া যেন বসিয়া আছে! ওদিকে ভৃত্য গদাধর হাঁকিতেছে, "দাদাবাবু, গাড়োয়ান হাঁকাহাঁকি কচ্ছে!" মেসের সঙ্গীরা হাঁকে, "ওহে সময় হয়ে এল যে, দরজা বন্ধ করে হচ্ছে কি?" মুণ্ড করিতেছি! শ্রাদ্ধ হইতেছে!

রাগে তখন আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছে! অবশেষে টাইটাকে লইয়া পৈশাচিক বলে টানাটানি আরম্ভ করিলে হ্যাথাওয়ের বাড়ীর রীতিমত দামী সিল্ক টাই 'দ্বিধা-ভিন্ন' হইল! অবশ্য তোমার রঘুবংশের 'শিখণ্ডীর কেকা'র মত নয়! উঃ, তখন আমার কপালে ঘাম বাহির হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া দ্বিতীয় টাইয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময় প্রাণে গভীর ত্রাস ও বিষাদের সঞ্চার করিয়া স্পষ্ট "গুড়ুম" শব্দে সাড়ে নয়টার তোপ পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি

ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখি, সত্যই ত সাড়ে নয়টা! অবসন্নভাবে আমি নেয়ারের খাটের উপর বসিয়া পড়িলাম। যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পরদিন মজঃফরপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শ্বশুরমশায়ের গাড়ী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। শ্বশুরালয়ে একটা ভাবনার তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে সজ্জিতা, মিলন-আশায় উৎফুল্লহৃদয়া, প্রতীক্ষা-কারিণী হৃদয়-লক্ষ্মীর নয়নপল্লব-দুইটি অপ্রত্যাশিত আশা-ভঙ্গে একেবারে অশ্রুভারাক্রান্ত! আহা, সে যে লিখিয়াছে,—বুকপকেট হইতে ধাঁ করিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম,—সে লিখিয়াছে, "তুমি এসো, নিশ্চয় এসো। কত দিন বল দেখি, আশাপথ চেয়ে বসে থাকব? এবার না এলে তোমার জোটিকে আর দেখতে পাবে না, এ নিশ্চয় জেনো!" এই দুইটি ছত্র হইতে আমি তাহার ছোট হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ অনুভব করিয়া যে, আপনাকে নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বসিয়া আছি! হায়, কি এ গ্রহ! এ কি বিড়ম্বনা! ভাবিলাম, কি আর করি, কাল যাইব!

রুমালে চোখ মুছিয়া দরজা খুলিয়া ডাকিলাম, "গদাধর!"

গদাধর নিকটেই ছিল, আসিল, "কেন, দাদাবাবু?"

আমি বলিলাম, "গাড়ী চলে গেছে?"

"না।"

"আচ্ছা, আজ আর আমার যাওয়া হল না! বড় মাথা ধরেছে, তাই শুয়েছিলাম। মাথা-ধরা ক্রমশই বাড়ছে, ঐ গাড়ী

নিয়ে লালদীঘির টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে একটা টেলি-
'গ্রাম করে দিয়ে আসি।"

গদাধর বলিয়া উঠিল "ইঃ, তাইত, দাদাবাবু, তা হলে আর দেরী কর্‌বেন না। তাঁরা আবার ভাববেন! আপনার মুখখানাও যে, উঃ, জ্বর-জ্বর মত দেখাচ্ছে!"

আর জ্বর-জ্বর! আমার কান্না আসিয়াছিল। বল কি হে, কতকাল পরে এই প্রিয়া-সম্মিলন, আর তা-ও এই প্রথম! তাহাতে এমন ব্যাঘাত! দুই একজন বন্ধু আসিলেন। তাঁহারা গদাধরের কাছে সমস্ত শুনিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন, "কাল যেয়ো, তার আর কি?"

আমিও বলিলাম, "হাঁ, তা না ত কি!" কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে বেদনা হইতেছিল, হে ভগবান্ তেমন দুর্দ্দশা তেমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়!

বিলাতী বেশ ত্যাগ করিয়া একজন সহবাসীকে লইয়া টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইলাম, "বড় মাথা-ধরা—কাল যাব—পঞ্জাব মেল—!"

তার পর ভাবিলাম, আজিকার এ উদ্বেগ লইয়া শয্যায় আশ্রয়-গ্রহণ বিড়ম্বনা হইবে। একটা সৌভাগ্য যে, সে দিন শনিবার। ষ্টার থিয়েটারে নূতন "বিষবৃক্ষ" খুলিয়াছে—অভিনয় দেখিতে গেলাম। উঃ, কি ভিড়! আট টাকা দিয়া দুইখানি ড্রেস্-সার্কেলের টিকিট কিনিয়া উপরে গেলাম! খানিকটা প্লে দেখার পর মন কিছু সুস্থির হইল। নিজের অবস্থাটা একবার ভাবিলাম,

কোথায় ট্রেণের প্রথম শ্রেণীতে বসিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি, তা না ষ্টার থিয়েটারে "বিষবৃক্ষের" অভিনয় দেখিতেছি! ভাবিলাম, অমৃত বসুকে ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিলে এখনই একখানা মজার ফার্স লিখিয়া ফেলে! স্থির করিলাম, আগে ত শ্বশুরবাড়ী যাই, তারপর নিজেই না হয় একখানা ফার্স লিখিব!

যাই হোক্, পরদিন সন্ধ্যাবেলায় 'মোণি গুপ্টু'কে ডাকিয়া বসাইয়া তাহাকে দিয়া নিজের বেশভূষা ঠিক করিয়া, সাতটার মধ্যেই ফিট্ হইয়া রহিলাম। তারপর সে রাত্রে যখন সাড়ে নয়টার তোপ পড়িল, তখন দেখি, আমি ট্রেণে! একবার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, বুঝি এ স্বপ্ন! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। পরে দেখি, না সত্যই ত বটে! এই যে গাড়ী বেশ চলিয়াছে, আর আমিও তার প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়া মজঃফরপুর চলিয়াছি।"

লাহিড়ী স্থির হইয়া সিগারে টান দিল। আমরা বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম। আমি কহিলাম, "তা হলে সাহেবের প্রাণেও দৌর্ব্বল্য আছে।"

লাহিড়ী কহিল, "কিসের দৌর্ব্বল্য?"

আমি কহিলাম, "নবোঢ়া পত্নীর জন্য কাতরভাবে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হওয়া!"

লাহিড়ী কহিল, "কেন, এ উদ্ভট প্রশ্নের অর্থ কি?"

আমি কহিলাম, "ছুটি পেলে, কিম্বা কলেজ পালিয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতাম বলে আমাদের ভারী ঠাট্টা করতে কি না!"

লাহিড়ী কহিল, "সেটা ভাই গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নয়! বল কি, তোমার স্ফূর্ত্তি করে বেড়াবে, আর আমি খালি চিঠি নিয়েই থাকব!"

শচী হাত বাড়াইয়া কহিল, "পথে এসো দাদা, অমন কাব্য-সুখের লোভ সুবিধা পেলে যে ছাড়ে, সে-ত অতি হতভাগা!"

আমি কহিলাম, "থাক্, থাক্, এখন যা বলছিলে, বল। ভারী জমিয়ে তুলেছ—"

লাহিড়ী কহিল, "সত্য না কি? থ্যাঙ্ক্‌স্‌!"

৩

লাহিড়ী আবার আরম্ভ করিল, "ষ্টেশনে দুইটি সম্বন্ধী আসিয়াছিলেন, আমার অভ্যর্থনার জন্য। সাহেবী বেশ ও আমার কাছে ফটো ছিল, তাহা হইতেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অসুবিধা ঘটে নাই। বাহিরে ল্যাণ্ডো ছিল, আমরা গৃহাভিমুখে চলিলাম।

বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে কখনও ত এমন ভাবে মিশি নাই, আর এ একেবারে অন্তরঙ্গ বলিয়া অন্তরঙ্গ! পদে পদে অপ্রতিভ হইতেছিলাম। কথা-বার্ত্তা, চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ান কিছুই যেন তেমন সুবিধা-গোছ মনে হইতেছিল না। এ সব আদব-কায়দা ত দুরস্ত নাই! ইহাদের দলে পড়িয়া কেবলই আমার মনে হইতেছিল, ইহারা যেন কতকগুলা রূপার টাকা-আধুলি, আর তার মধ্যে আমি নেহাৎ একটা পারা-মাখান পয়সা কোন মতে সেঁধিয়া পড়িয়াছি!

হঠাৎ আদেশ শুনা গেল, "ফুলচাঁদ, গোসলখানা—"! শ্বশুর-মশায়ের মুখ হইতে এ আদেশবাণী নিঃসারিত হইল! ফুলচাঁদের ব্যগ্রতায় ত আমি সন্ত্রস্ত! হক্ কথা বলিতে কি, বাড়ীর লোক-দের কাছে যেন কতকটা থই পাইতেছিলাম, এ ফুলচাঁদ-মহীপতের কাছে আরও আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ইহারা মুখের সম্মুখে তড়বড় করিয়া নাটকোচিত ভাবে এমন অনর্গল হিন্দী বলিয়া যায় যে, আমার তাক্ লাগে! আমি সত্যই ভাবি, হা আমার সোনার দেশ! ইহাদের বাড়ী বিবাহ করিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছি!

যাক্, তার পর খাইবার পালা! শ্বশুরমশয়ের সঙ্গে এক টেবিলে ত খাইতে বসা গেল। দুই তিনটি ছোট মেয়েও আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিল। আমাকে খাতির করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য! রকমারি সে ডিস দেখিয়া আমার রসনা সবিশেষ প্রলুব্ধ হইলে হইবে কি, আপনার দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া আমিই অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম! ইহারা কেমন নিঃশব্দে ক্ষিপ্র হস্তে আপনাদের ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া চলিয়াছে, আমার প্লেট আর খালি হয় না! যত সতর্ক হইতে যাই, ততই প্লেটে-কাঁটায় ঠোকাঠুকি হইয়া এক অপূর্ব্ব কিঙ্কিণী-রাগিণীর সৃষ্টি করে! কাঁটা-বিদ্ধ আলু ও মাংসের টুকরা মুখের কাছ অবধি আসিয়া হঠাৎ কাঁটা-চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়! কোন্ দিক সামলাই, ঠিক করিতে পারিতেছি না, এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ বাবা, লাহিড়ী মশায় বাঁ হাতে ছুরি ধরেছে, আর ডান হাতে কাঁটা!" শ্বশুরমশায় বলিলেন, "নীহার, ছুরিটা ডান হাতে ধরলে

সুবিধা হবে, বোধ হয়!" তখন ফক্কড় 'মোণি গুপ্টুর' মস্তক-চর্ব্বণের বিফল বাসনা আমার অন্তরের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। পাজী, নিমকহারাম!

আবার এক বিপদ! একটু পরেই এক জ্যাঠা ছেলে—আমার এক শ্যালক মহাশয়ের বংশধর—বলিয়া উঠিল, "কেমন করে 'স্যালাড' খাচ্ছে, দেখ।" কথাটা বলিয়া সে তাড়া খাইল বটে, কিন্তু আমার মনে পড়িয়া গেল, সেই কথামালার মৃণ্ময় ও কাংস্যপাত্রের গল্প! কেন, আমার এ সাহেবিয়ানা-প্রকাশের কি কারণ ছিল, আর এই কি তাহার উপযুক্ত স্থান? এমন নির্লজ্জভাবে হাস্যাস্পদ হইবার কি প্রয়োজন ছিল? স্পষ্ট নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিলেই হইত ত! দিব্য আসনে বসিয়া বাঙ্গালীর ছেলে সেরেস্তাদার-পুত্র পূর্ণ আরামে ভোজ্য বস্তুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম, তাহাতে আপনার দৈন্যটাকে এমন মর্ম্মঘাতীভাবে সকলের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিতে হইত না ত!

আহারাদির পর বিশ্রামের আয়োজন হইল। কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা দেওয়া গেল। শয্যা ত্যাগ করিতেই শ্বশুরমশায়ের আহ্বান আসিল। গেলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া কংগ্রেসের আলোচনা চলিল। পরে জলখাবার আসিল। আমি বিস্মিত হইলাম। কৈ, শাশুড়ী ঠাকুরাণী ত জামাতাকে নিকটে বসাইয়া খাওয়াইলেন না! আর ততোধিক মর্ম্মবেদনা, এখনও অবধি জোটির সঙ্গে দেখা হইল না, বিদ্যুৎচমকের মত একটা ক্ষণিক দৃষ্টি-বিনিময়ও নয়! আমি যে হায় সেই আশায় দিবানিদ্রার ভাণ করিয়া কক্ষ হইতে

সকলকে বিদায় দিয়া তাহারই নূপুর-শিঞ্জিতের প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম! নাঃ, এ কষ্ট অসহ্য! শ্বশুরবাড়ীতে এতদিন পরে, এবং এই প্রথম আসিয়া এখনও যাহার অদৃষ্টে প্রিয়া-সন্দর্শন না ঘটে, সে অতি বেচারা!

অপরাহ্ণে শ্যালকবৃন্দে পরিশোভিত হইয়া ক্লবে চলিলাম। সেখানে দুই-চারিজন ঘোষ-বোস-চৌধুরীর সহিতও আলাপ হইল। মধ্যম শ্যালক কহিলেন, "টেনিস খেল্‌তে জান, বোধ হয়?" টেনিসের নিয়মগুলা শুধু জানিতাম, আর খেলাও এক রকম দেখিয়াছিলাম, তবে হাতে-কলমে কখনও অভ্যাস করি নাই। নেহাৎ এতগুলা লোকের সমক্ষে হঠিয়া যাইব! তাই বলিলাম, "হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি! তবে আজ প্রায় বছরখানেক অভ্যাস নাই!"

"O! Never mind. Come along, old chap" বলিয়া মধ্যম শ্যালক সোৎসাহে আমার হাত ধরিয়া আপনার দলে টানিয়া একেবারে মুক্ত অঙ্গনে খেলিতে হাজির! তখন আমার হঠ-কারিতার ফল হৃদয়ঙ্গম করিলাম। 'খেলিতে জানি' বলিলেই কি খেলিতে হয়, রে ভাই! এ কি বদ্ এটিকেট!

নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্য ভাবিয়া নামিয়া ত পড়িলাম। ভাবিলাম, মরি আর বাঁচি, সটাসট্ ব্যাট হাঁকড়াইব! হাঁ, হাঁকড়াইব— হাসিয়ো না, তাকে হাঁকড়ানোই বলে হে, খেলা বলে না—দেখি, যা থাকে বরাতে! এমনই গোঁ লইয়া ত ব্যাট ধরিলাম। যেমন বল আসে, অমনি চোখ কাণ বুজিয়া সজোরে ব্যাট চালাই,

আর অদৃষ্টের গুণে লাগিয়াও বেশ যাইতেছিল! বলিব কি, চারিধারে আনন্দধ্বনিও উঠিয়াছিল। কিন্তু উঃ, কি ভারী ব্যাট হে, চালাইব কি বল, ধরিবারই যুৎ হয় না। আর একটু হাল্কা হইলে না হয় টেনিসে ওস্তাদ্ হইবার চেষ্টা দেখা যাইত! তার উপর টেনিস্ স্থ নাই, যদিও তা থাকিলে কতটা সুবিধা করা যাইত, সেটা দারুণ গবেষণার বিষয়! এই রকম ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একবার যেমন লাফাইয়া সজোরে বল মারিতে যাইব, অমনি পা পিছলাইয়া একেবারে পপাত "ধরণীং ভরণীং মাতরম্!"

মূর্চ্ছা যাই নাই, নিশ্চয়। কেন না তদ্দণ্ডেই চারিধারে যে বর্ব্বর হাস্যধ্বনি উঠিয়াছিল, মূর্চ্ছা গেলে কখনই তাহা শুনা যাইত না! কিন্তু ভাই, ভয়ঙ্কর লাগিয়াছিল। মানুষের এই যে কেমন দুর্ব্বল স্বভাব, একজন পড়িয়া গিয়া জখম হইতেছে, আর সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা দেখিয়া অপরে অকাতরে কি করিয়া যে দন্তোন্মীলন করিয়া হাসে, ইহা এক প্রকাণ্ড দার্শনিক সমস্যা! নিশ্চয় ইহা মানুষের আদিম অসভ্যতার একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, ইহা মনে করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ত উঠিলাম। তখন চারিধার এমন শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে যে, মনে হইল, কিছু পূর্ব্বে যে বর্ব্বর হাস্য-ধ্বনি শুনা গিয়াছিল, তাহা এখান হইতে উঠে নাই! যেন কোন্ অদৃশ্য দানব-রাজ্য হইতে হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। দুই একজন সান্ত্বনা দিলেন, "জমি পিছল, আর পায় কোর্ট স্থ!" আমি নতমুখে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু চাহিয়া যখন দেখিলাম যে, ব্যাটখানা একেবারে লাইনের ধারে

যাইয়া পড়িয়াছে, তখন ইঁহাদের হাস্যরসের উৎস কোথায়, বুঝিতে পারিলাম। হাসাটা ইঁহাদের সত্যই অন্যায় হয় নাই! যাই বল, এমন নিষ্ঠুরভাবে কেহ কথনও টেনিস খেলে নাই! আমি স্তম্ভিত হইলাম, আমার হাতের জোর দেখিয়া। ব্যাটখানা এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে, তাই ত! আশ্চর্য্য!

বাড়ী ফিরিলাম। ভাবিলাম, এ সব দুঃখ এখনই ভুলিয়া যাইব। এবার জোটিকে দেখিব! রাত্রে আহারাদির পর হল-ঘরে বসিয়া সব গল্প চলিতেছে, আমি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতেছি, কখন শয়নমন্দিরে যাইবার ডাক পড়ে, এমন সময় বাহিরে একখানা গাড়ী থামিল। হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকুরাণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওদের আর আসা হল না! তাঁরা কিছুতে ছাড়লেন না। নাচ হবে, সখের থিয়েটার হবে, নেলি, জোটি, মেজবৌমা রইলেন! দত্ত সাহেবের স্ত্রী কিছুতে ছাড়লেন না।"

এ কি কথা! জোটি তবে এ বাড়ীতেই আজ নাই? বাঃ!

সমস্ত ব্যাপার শুনিলাম। এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট জজ দত্ত সাহেবের পুত্রের অন্নপ্রাশন, তাই তাঁহার গৃহে আজ নাচ, থিয়েটার! গৃহিণী, কন্যা ও বধূবর্গকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। নিজে ত ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু নেলি-জোটির দল সেখানে পড়িয়া রহিল! আমার ভারী রাগ হইল। কতকাল পরে আজ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি, স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর মোটে দেখাই হয় নাই, দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া আছি, আর ইহারা সটান্ তাহাকে নিমন্ত্রণে পাঠাইলেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উপর একটা

মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিল। জ্যোতির উপরও রাগ হইল। সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটুও উৎসুক নয়? এই তার ভালবাসা! নাচ-দেখাটা স্বামিসম্ভাষণের চেয়েও তার কাছে গুরুতর ব্যাপার হইল! এই স্ত্রী লইয়া আমাকে সারা জীবন কাটাইতে হইবে, আর আমি সুখী হইব? হা ভগবান্! বলিব কি ভাই, দুর্ব্বলতা বল, আর যাহাই বল, রাগে, দুঃখে, অপমানে আমার চোখে জল আসিল! ভাবিলাম, ইহার প্রতিশোধ লইব! কালই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব! শ্বশুরবাড়ীকে জানাইব যে, তোমরা বিলাত পাঠাইবে বলিয়া তোমাদের প্রসাদ-লাভের জন্য কি এতদূর হীন অপমান সহিতে হইবে? কখনও না! না হয়, বিলাত না-ই-বা গেলাম! এমন আচরণ কি আমাদের সমাজে সম্ভব?

৪

পরদিন বেলা আটটার সময় শ্যালকবৃন্দ বনভোজনের আয়োজন করিলেন। পাছে কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় আমি মনের ভাব মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিলাম।

বনভোজনে সঙ্গীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইল না। গান-বাজনায় আমোদ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সহসা প্রস্তাব উঠিল, "চল একটু নৌকায় বেড়ানো যাক্।" আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। বেশ!

বাগানের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। তাহাতে ছোট এক-খানা ডিঙ্গিরও অভাব ছিল না। আমরা পাঁচ-ছয় জনে ডিঙ্গিতে উঠিলাম। ইডেন গার্ডেনে মাঝে মাঝে নৌকা-ভ্রমণ করা হইত,

সেই সাহসে এখানে একেবারে হাল ধরিবার প্রলোভন সম্বরণ করা গেল না।

অদূরে বৃক্ষতলায় গানের আসর বেশ সরগরম! রবিবাবুর সুন্দর গানে আমার মন আর নৌকার দিকে ছিল না। গান বড় সুন্দর লাগিতেছিল। দিব্য গলা। আমার পা কাঁপিতেছিল। কেমন করিয়া হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, হালটা সজোরে আসিয়া আমার স্কন্ধে লাগিল, আমিও সে প্রচণ্ড বেগ সামলাইতে না পারিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না! তার পর কি হইল, কিছুই জানি না।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, অর্থাৎ বেশ স্পষ্ট জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন দেখি রাত্রি হইয়াছে! ঘরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আমি শয়ন করিয়া আছি! আলো জ্বলিতেছে! হঠাৎ মনে পড়িল, আমি জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। ঘাড়ে বেশ ব্যথা বোধ হইতেছিল। হাতে দুই-এক জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চোট লাগিয়াছিল! সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা। যন্ত্রণায় 'মাগো' বলিয়া আমি পাশ ফিরিলাম। চোখ আপনা হইতেই অলসভাবে বুজিয়া আসিল।

হঠাৎ চুড়ির টিংটাং শব্দ শুনিলাম ও একটি স্নিগ্ধ পুষ্প-সুরভি! চোখ চাহিবার পূর্ব্বেই একটি কোমল হাত আমার ব্যথিত ললাট স্পর্শ করিল। আঃ, এ কি শান্তি! কি আরাম! ভাবিলাম, এ কি স্বপ্ন!

মিষ্ট কণ্ঠে কে ডাকিল, "ঘুমুচ্ছ?"

"কে?"

করুণ সুরে উত্তর হইল, "আমি। চেয়ে দেখ!"

আমি কহিলাম, "কে? জোটি এসেছ?"

"হাঁ, এখন কেমন আছ?"

ইহাই আমার স্ত্রীর সহিত প্রথম অসঙ্কোচ প্রেম-সম্ভাষণ!

"আমি জলে পড়ে গেছলাম, না, জোটি?"

"হাঁ, দাদারা সব মিলে তোমাকে তোলে। বেশী জল ছিল না তাই, না হলে উঃ, কি হত!"

"আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম, না?"

"হাঁ। কেবলই আমি ভাবছি, কতক্ষণে তুমি কথা কবে! ডাক্তার সাহেব জাগাতে বারণ করে গেছেন। আবার তিনি রাত নটার সময় আসবেন!" জোটি আমার পাশে বালিশে মুখ গুঁজিল।

আমি কহিলাম, "জোটি, তোমার নাচ দেখার কোন ব্যাঘাত হয় নি ত?"

জোটি আমার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল, "সত্যি বলছি, আমি একটুও নাচ দেখি নি। আমার মোটে ভাল লাগছিল না, এক-পাশে পড়ে ঘুমিয়েছিলাম। কি করে রাত কেটেছে, তা আমিই জানি! আমি ত মার সঙ্গে চলে আসছিলাম, তা তাঁরা কি ছাড়েন? মা বললেন, 'তুমি এসেছ, কি মনে করবে!' তা তাঁরা তোমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। মা বললেন, 'তোমার একে ট্রেণে আসায় কষ্ট হয়েছে, এখানে আসতে গেলে আরও

কষ্ট হবে।' তা মা চলে এলেন, আমাদের কিছুতে তাঁরা ছাড়লেন না। সত্যি, আমার যাবারও ইচ্ছা ছিল না, কতদিন পরে তোমাকে দেখব, বল দেখি! যাহোক, আমার দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ কর!"

জোটির মিষ্ট কথায় ও ততোধিক মিষ্ট ব্যবহারে আমার রাগ পড়িয়া গেল। তবু দুর্জ্জয় অভিমানের একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়িলাম। বলিলাম, "জোটি, কাল যদি আমি জলে ডুবে মরে যেতাম, আর দেখা না হত, তা হলে বেশ হত, না?"

"তোমার পায় পড়ি, ও কথা বলো না। আমায় মাপ কর নি?"

জোটির চোখ হইতে টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল আমার কপালে পড়িল। আঃ, সেই এক ফোঁটা চোখের জল কি স্নিগ্ধ! কি নির্ম্মল! তাহাতে আমার যন্ত্রণারও যেন কতক উপশম হইল। আমি তাঁহাকে বুকের উপর টানিয়া লইলাম।"

লাহিড়ী চুপ করিল।

শচী হাসিয়া উঠিল, কহিল, "বল কি হে, এক ফোঁটা চোখের জলে যন্ত্রণার উপশম হল, আর ডাক্তার সাহেবের অত ওষুধে কিছু হয় নি? বেইমান!"

লাহিড়ী কহিল, "আহা, সে কি সামান্য জিনিষ হে! সে যেন একেবারে—"

আমি কহিলাম, "স্নিগ্ধ প্রলেপ আর কি!"

লাহিড়ী কহিল, "ঠিক বলেছ! ঐ অত অপমান ও লাঞ্ছনা-ক্ষতের উপর, সেই চোখের জলটুকু বাস্তবিকই আমার মনে হয়েছিল, যেন সুধা-স্নিগ্ধ প্রলেপ!"

ভাগ্যচক্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

যখন কোদালিয়ার জমিদারপুত্র, নন্দীগ্রামের অনুরূপ চাটুয্যের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঢাক ও রস্থনচৌকির বাদ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে সরগরম করিয়া চলিয়া গেল, তখন পল্লীর স্ত্রীসমিতিতে দুই একটা ছোট-খাটো সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, দুই বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার বিবাহ-ঘটনার উল্লেখ করিয়া, কমলার পিতৃব্য-নামা জীবের আক্কেল পদার্থটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন; পরে তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া, যখন শ্রীমতী জগৎতারিণী উক্তরূপ পূজ্যপাদ পিতৃব্যদেবের মুখে অগ্নি-সংযোগের সারবত্তা বিশদভাবে প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন, তখন ক্ষমতাপন্ন ক্ষুদ্র সমিতিটির আলোচনা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

রিপোর্টটা যত সংক্ষেপে সারিয়া লইলাম, ঘটনাটি তত সংক্ষিপ্ত নয়। কথা এই, স্বরূপচন্দ্র যখন জমিদার সরকারে নায়েবী করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন কনিষ্ঠ অনুরূপচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন-পরিপাক ভিন্ন অপর কোন কার্য্যে বিন্দুমাত্র পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। সহসা একদিন প্রাতঃকালে

বিপত্নীক স্বরূপচন্দ্রের মৃত্যু হইল। স্বরূপচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় যে আপনার অনাথা কন্যা কমলাকে নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন, এমন নহে! প্রতিবেশীগণ বলে, কমলার সহিত বিস্তর রজত-কাঞ্চনরত্নাদিও নাকি অনুরূপচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল; এবং বিষয়বুদ্ধিতে অনুরূপ অপেক্ষা তদীয় সহধর্ম্মিণীর প্রবেশ-লাভ অনায়াসে ঘটিত বলিয়া এক দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের সহিত কমলার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময়, স্ত্রীবুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত অনুরূপচন্দ্র স্বাগত পরিজনবর্গের নিকট বলিয়াছিলেন যে স্বরূপচন্দ্র ত কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তিনিও দরিদ্র, সম্বলহীন। ধনী পাত্র সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য, ইহার উপর তাঁহার আপন কন্যা মন্দাকিনীর আবার শীঘ্র বিবাহ দিতে হইবে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

এক্ষণে মন্দাকিনীর বিবাহে অনুরূপচন্দ্রকে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া পল্লীর দুই একটি নিন্দুক ও খলের ঈর্ষাবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বলবতী হইয়া গ্রামে রীতিমত বিপ্লবের সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিল। সেইজন্যই দুই একটা ছোট-খাটো সভা-সমিতিতে অনুরূপচন্দ্রের অদ্ভুত ধূর্ত্ততা ও তদীয় স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর অপূর্ব্ব মন্ত্রিত্বের আলোচনান্তে প্রতিবেশিনীবর্গ উভয়ের মুখেই অগ্নি প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

দরিদ্র স্বামীর গৃহে কমলার সুখের অভাব ছিল না। পল্লী-গ্রামের ক্ষুদ্র পরিবার। স্বামীর এক বিধবা পিতৃষসা ভিন্ন সংসারে আর কেহ অভিভাবক ছিল না। বধূকে গৃহে আনিয়া অবধি বৃদ্ধা

আপনার ক্ষুদ্র সংসারটিকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। আর গৃহে ছিল, পুরাতন ভৃত্য বেহারি!

স্বহস্তে স্বামীর জন্য রন্ধন করিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া, বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিয়া, নিশীথে শয়নমন্দিরে কমলা যখন স্বামীর সপ্রেম সম্ভাষণের মধ্য দিয়া তাহার বাহুবন্ধনে আপনাকে ধরা দিত, তখন তাহার সমস্ত শ্রান্তি নিমেষে ঘুচিয়া যাইত। তাহার পুলক-কম্পিত হৃদয় হর্ষের বিমল তরঙ্গপ্লাবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। স্বামীর সোহাগে কমলা আপনাকে কনকসিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী রাজ্যেশ্বরী হইতে এতটুকু ভিন্ন ভাবিত না।

শৈশবে কমলা পিতার নিকট অতিরিক্ত আদর পাইয়া ছিল। সেরূপ আদরে বালকবালিকা প্রায়ই একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কিল বারি কমলাকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর একটি ঘটনাতে অভিমানিনী অনাথা বালিকা আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে একেবারে সংযত করিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন তাহার বয়স আট বৎসর! পাড়ার মুখুয্যেবাড়ীতে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর নিমন্ত্রণ ছিল। বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "কম্‌লি বাড়ীতে থাক, মণিকে নিয়ে আমি মুখুয্যেদের বাড়ী যাই!"

কমলা ভ্রূটা একটু টানিয়া কহিল, "আমিও যাব, কাকিমা!"

এতটুকু মেয়ের এতখানি স্পর্দ্ধা দেখিয়া কাকিমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কাকিমা কহিলেন, "অমনি তুমি যাবে! বেশ, তুমিই যাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, আমরা না হয়, ঘরে বসে থাকি। এমন শত্তুরও দেখি নি, বাপু!"

কমলা কহিল, "মণি যাচ্ছে, আর আমি গেলেই বুঝি দোষ হল!" আবার কথার উপর কথা! কাকিমা মুখখানা যথেষ্ট বিকৃত করিয়া কহিলেন, "মণি যাচ্ছে—মণির ভাল কাপড় আছে, গহনা আছে, তাই যাচ্ছে। তোমার ত সে সব নেই, পূজাবাড়ী যেতে হলে গহনা কাপড় দরকার!"

কমলা কহিল, "কেন, কাকিমা, আমারও ত গহনা কাপড় আছে, বাবা দিয়েছিল!"

অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার অসাধারণ প্রগল্‌ভতা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য কাকিমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, চৈতন্যশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম করিল। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, কাকিমা নিকটোপবিষ্টা অনুগ্রহার্থিনী মেজঠাকরুণের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "শুনলে মেজঠাকরুণ, তুমি যেন রয়েছ, তাই, নইলে আর কেউ এ কথা শুনলে মনে করত, কাকিমাগী বুঝি গহনাগুলো হাত করেছে! এমন দস্যি মেয়েও ত কখনও দেখিনি বাপু! ও সব করতে পারে! এইটুকু মেয়ে, পেটে পেটে ওর এত ফিচ্‌লেমি!" একটা কঠিন উপমা দিয়া কাকিমা তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্য সমাপ্ত করিলেন।

কমলার সুন্দর টানা চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিল। কমলা ম্লানমুখে বসিয়া রহিল। এমন সময় কাকিমা আজ্ঞা করিলেন, "নাও, একবার ওঠ দেখি, আমার ঘরে গন্ধর তেলটা আছে, নিয়ে এসো, মণির চুল বেঁধে দি! অত বড় মেয়ে হলে, একটু গতর খাটাতে শিখলে না! শ্বশুরবাড়ীতে ত আর এমন করে রাণীর মত বসে থাকলে চলবে না।"

কমলা তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করিতে গেল। অতিরিক্ত ব্যস্ততাবশত পাড়িতে গিয়া শিশিটা মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কক্ষ সুগন্ধে পূর্ণ হইল! ভয়ে বালিকার রক্ত হিম হইয়া গেল। মণি ছুটিয়া আসিল। ভগ্ন শিশি দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, এই দেখবে এস, তেলের শিশিটা একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে!" জননী ছুটিয়া আসিলেন। ক্রমাগত অত্যাচার! মানুষের সহ্য করিবার ত একটা সীমা আছে! কাকিমারও অবশেষে অসহ্য বোধ হইল। তিনি কমলার পৃষ্ঠে সরোষে ও সবলে চপেটাঘাত পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "মাগো, দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা!, এমন শত্তুরকেও ঘরে রাখতে আছে? পূজো দেখতে যেতে পাবে না বলে, হিংসের চোটে এক টাকা দামের আস্ত তেলের শিশিটাই ভেঙ্গে ফেললে!"

প্রতিবেশিনী ইন্দুমতী সেই সময় বেড়াইতে আসিয়াছিল। কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া সে ব্যাপার বুঝিয়া লইল। অশ্রুময়ী কমলাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টানিয়া ইন্দু কহিল, "কেন মামী, ওকে বকছ? ছেলেমানুষ, অসাবধানে না হয়, ভেঙ্গেই ফেলেছে! তা বলে অত বকতে আছে! আহা, দেখ দেখি, কেঁদে মুখ চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে! না ভাই কমলা, চুপ কর ত!"

এই আদরে বালিকার রুদ্ধ বেদনা আর কোন বাধা-বন্ধ মানিল না। কমলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে বালিকা স্পষ্ট বুঝিল, তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, এ পৃথিবীতে

আপনার বলিবার কেহ নাই! কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? কে তাহার অশ্রু মুছাইবে?

জননীর কথা বড় একটা তাহার মনে পড়ে না, স্নেহপরায়ণ পিতার প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি আজ আবার সহসা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কোনমতে সে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। হায়রে অনাথা! কমলার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত বেদনা সমস্ত অভাব আজ তাহার পরিস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির ভিতর দিয়া নিমেষে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল! পিতৃমাতৃহীনা বালিকা এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে আপনার দুরদৃষ্ট, আপনার শোচনীয় অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়া লজ্জাবতী লতার মত ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলার স্বামী যোগেশচন্দ্র চাকদালির জমিদার বাবুদের এণ্ট্রান্স স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিত, এবং জমিদার-বাটী হইতে প্রকাশিত "দীপালী" নামে মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিত। স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রগুলি প্রকৃতই তাহাকে ভালবাসিত। এমন মাষ্টার মহাশয় আর হয় না! কখনও কাহাকে তিরস্কার করে না, অথচ স্কুলে ছাত্রগণের মধ্যে অত্যাচার বা দৌরাত্ম্যের কোন ভয়াবহ প্রসিদ্ধি দেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে নাই। কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী এই পল্লীগ্রামে, শান্ত অথচ বলিষ্ঠ মাষ্টারটির শিক্ষাগুণে, বালকেরা চপল না হইয়াও গ্রাম্য নিরীহতা হইতে মুক্ত ছিল, এবং ক্রিকেট ফুটবল

না খেলিলেও লাঠিখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামক্রীড়ায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিত। ডিবেটিং ক্লবে ক্রমাগত স্বদেশ ও গুরুজনের প্রতি ছাত্রের কর্ত্তব্যাদি বুঝাইয়া-বুঝাইয়া যোগেশচন্দ্র ছাত্রদিগকে অতিরিক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। এক-বার এক দরিদ্র পল্লীতে কয়েকখানা খড়ের ঘর হুতাশনের প্রবল তেজে ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম করিলে, কয়েকটি বয়স্ক ছাত্র তাহাদের অভিভাবকগণের সম্পূর্ণ নিষেধসত্ত্বেও যোগেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিবেশিগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় যোগেশচন্দ্র নদীর ধারে বেড়াইতে যাইত, মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকেও সঙ্গে লইত, তখন পল্লীর দুই একজন বৃদ্ধ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিত, "এই যে যোগেশ মাষ্টারের ফৌজ বাহির হইয়াছে!"

জমিদারবাবুর নিকটও যোগেশের আদর অল্প ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি জমিদার তারিণীশঙ্কর চৌধুরীর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তাই তিনি যোগেশচন্দ্রকে ভৃত্যহিসাবে না দেখিয়া বন্ধুর ন্যায় স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। যোগেশচন্দ্র গল্পরচনাগুলি এমন ভাষা ফেনাইয়া লিখিতে পারিত যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছিল! সাহিত্যসমাজে তাহার মত, তাহার সমালোচনার একটা রীতিমত মূল্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতাপন্ন মাষ্টারটি আপনার লেখনীর অসামান্য লিপিচাতুর্য্যে চাকদালি গ্রামের নামটি বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীর নিকট বিশেষভাবে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যোগেশচন্দ্রের লেখনীর প্রধান গুণ ছিল, গুপ্ত বিদ্রূপ! তাহার রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বিদ্রূপের ক্ষুরধারা ফল্গু নদীর ন্যায় বহিয়া যাইত। সে ক্ষুরধারার বিপুল স্রোত যে হতভাগ্য বিপক্ষের শিরে আঘাত করিত, তাহার শোচনীয় দুরবস্থা দেখিলে অতিশয় গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মার পক্ষেও হাস্যসম্বরণ করা দুরূহ হইয়া পড়িত! কলিকাতার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মাসিকের সত্ত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্রকে সম্পাদকের দেবাসনে বরণ করিয়া লইবার আশায় বিস্তর ধূপ-ধূনা ও পুষ্প-চন্দনের আভাষ দিতেন, কিন্তু কোন প্রলোভনই তাহাকে তারিণীশঙ্করের স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই!

যোগেশচন্দ্রের সংসর্গগুণে, তারিণীশঙ্কর রায়বাহাদুর খেতাব গ্রহণের জন্য লালায়িত হওয়া অপেক্ষা সাহিত্যচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করাটা অধিকতর লাভজনক মনে করিতেন, এবং তৈলদানে তৎপর হওয়া অপেক্ষা বিপন্ন ও দরিদ্র বাঙ্গালী লেখকগণকে অর্থ সাহায্য করিতে অধিকতর ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেন।

যোগেশচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে অনেকখানি অনাদর ও অবজ্ঞার হাত হইতে একেবারে আদর ও স্নেহের মধ্যে আসিয়া পড়ায় কমলার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় হর্ষে আপ্লুত হইয়াছিল। বহু বর্ষা-ম্লান রৌদ্রহীন দিবসের পর সূর্য্যকিরণ-বিচ্ছুরিত দিনের প্রথম অভ্যুদয়ে মানব-হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব সুখ, যে অতুলনীয় আনন্দ মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, বিবাহান্তে কমলাও তাহার বধূজীবনে ঠিক ততখানি সুখের আস্বাদ পাইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব্ব সুখের মোহে

সে তাহার অতীত জীবনের অনেকগুলি অত্যাচার-জর্জ্জরিত দুর্ব্বৎসর একেবারে বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিল।

বিবাহের পর কমলার অদৃষ্টে অর্থসুখ তেমন প্রকৃষ্টভাবে না ঘটিলেও স্বামিসুখ পূর্ণমাত্রায় মিলিয়াছিল। নিরলঙ্কারা স্মিতমুখী কমলা একমাত্র স্বামিপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল মহিমায় আপনাকে সমধিক সম্পদশালিনী বুঝিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। কিন্তু হায়, অভাগিনীর এ আত্মপ্রসাদ এ সম্পদটুকুও তাহার কঠিন-হৃদয় অপ্রসন্ন ভাগ্যদেবতার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল, তাই সেই বিরাট কর্ম্মপুরুষ তাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য খড়্গখানি লইয়া কমলার এই সুখতরুর মূলে আঘাত করিবার জন্য সহসা একদিন উদ্যত হইয়া উঠিলেন।

বৈশাখ মাসের এক অপরাহ্নে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া যোগেশচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে মাঠে গোরাদের টারগেট অভ্যাস করিবার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই স্থানের নিকটে আসিতেই একটা অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি যোগেশচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। একটা পলায়মান কৃষককে বিস্তর আশ্বাস দিয়া তাহার নিকট হইতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগৃহীত হইল, তাহা এইরূপ,—আজ মধ্যাহ্নের পর দুইটা গোরা এদিকে আসিয়াছিল। হারাধনের শস্যক্ষেত্রে তরমুজ দেখিয়া গোরা দুইটা সবলে সেগুলা আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, হারাধনের পুত্র গোবর্দ্ধন আসিয়া তাহাদিগের এই কার্য্যে বাধা প্রদান করে। গোরা দুইটা ইংরাজীতে গালি দিয়া

বন্দুকের ঘা'য় তাহাকে এমন জখম করিয়াছে যে, বেচারার একখানা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গোরারা ইহাতেও কিন্তু সন্তুষ্ট হয় নাই। এখন তাহারা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ফসলের সমূহ ক্ষতি করিতেছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল, গোরা বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিতে আসিয়াছিল, তাই সে পলাইতেছে!

ক্রুদ্ধ যোগেশচন্দ্রের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী একটা আগুনের গোলার মত যেন ঘুরিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "কোথায় সে গোরা দুটো?"

শঙ্কিতচিত্ত কৃষক হাত জোড় করিয়া কহিল, "ঐ হানিফ মিঞার ক্ষেতে ঢুকেছে!"

"তুই আয় আমার সঙ্গে। দেখি, পাজীগুলো কত বড় পালোয়ান!"

এই কথা বলিয়া যোগেশচন্দ্র হানিফ মিঞার ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিল। অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই একটা গোরাকে সে লুণ্ঠন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিল। তাড়াতাড়ি রোষদীপ্ত স্বরে সে কহিল, "তোমার এ ভারী অন্যায় হচ্ছে! গরীব চাষাদের এমন ক্ষতি করা, এ দিনে ডাকাতি!"

গোরা অবজ্ঞার স্বরে কহিল, "তুমি কে নোঙ্রা কুকুর, হুকুম-জারী করিতে আসিলে? চলিয়া যাও, নহিলে শিক্ষা পাইবে।"

যোগেশচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "চুপ্ রও, বেয়াদব, ভদ্র-লোকের সহিত মুখ সামলাইয়া কথা কও।"

"ভদ্রতা শিখাইতে আসিয়াছ তুমি, কুত্তির বাচ্ছা?" বলিয়া বন্দুকের পার্শ্ব দিয়া গোরা যোগেশচন্দ্রের গাত্রে আঘাত করিল! যোগেশ তখন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গোরার উপর পড়িয়া, বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করিতে লাগিল। গোরাটা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় তাহার সঙ্গী গোরা ছুটিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল এবং একটা পতিত বংশখণ্ড লইয়া যোগেশচন্দ্রের মস্তকে আঘাত করিল। যোগেশচন্দ্র তখন প্রথম গোরাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়ের মস্তকে বন্দুকের মাথাটা দিয়া এমন প্রবলভাবে আঘাত করিল যে, সে "বাই জোভ্, বীট্‌ন্ টু জেলি" বলিয়া এক পাক ঘুরিয়া সশব্দে ভূমির উপর পড়িয়া গেল!

প্রহার খাইয়া প্রথম গোরা চুপ করিয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় গোরা গাত্রের ধূলি ঝাড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল!

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তারিণীশঙ্করের অল্প বন্ধুত্ব ছিল। তিন চারিদিনের মধ্যে তারিণীশঙ্কর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন, "অপরাধীকে ধরিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ভারী অন্যায় হইবে!" তারিণীশঙ্কর উত্তর দিলেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার আরও পাঁচ ছয়খানি চিঠিতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিল। অবশেষে একদিন যোগেশচন্দ্র তারিণীশঙ্করের সহিত সাহেবের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আপোষে মিটাইয়া ফেলিল।

তখন স্কুলের কার্য্য আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। "দীপালী" পত্রিকা প্রবন্ধ-গৌরবে আবার সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল, জমিদারে-মাষ্টারে রীতিমত সাহিত্যচর্চ্চা হইতে লাগিল। কেবল যোগেশের সংসারে তুইটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, যোগেশের বৃদ্ধা পিতৃস্বসা ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ও কমলা একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিধাতা যখন প্রসন্ন হন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের দানগুলি যেমন বর্ষার ধারার ন্যায় অজস্রভাবে ভাগ্যবানের শিরে বর্ষিত হয়, তখন যেমন ভাগ্যবানের ভস্মের মুষ্টিটিও কনকের মুষ্টিতে পরিণত হয়, তেমনই বিধাতা অপ্রসন্ন হইলে বিপদগুলা বিষধর সর্পের ন্যায় মানবজীবনের শত সহস্র সূক্ষ্মতম ছিদ্রপথ দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ ফণা বিস্তারপূর্ব্বক বাহির হইয়া হতভাগ্য মানবকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে! কোন দিক সামলাইবার অবসরটুকুও তাহার তুরদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না! জানি না, ইহাতে এই দুর্জ্ঞেয় অটল বিধাতাপুরুষের কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হয়!

কয়েক মাসের মধ্যেই উত্তরোত্তর দুর্ঘটনা আসিয়া হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই ক্ষমতাপন্ন অদৃশ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে, বলহীন মানব-সন্তানের এমন কি সাধ্য আছে!

উক্ত ঘটনার তুই তিন মাস পরে কয়েকটি সাহেব চাকদালিতে

শিকার করিতে আসিল। বিরাট তাম্বুর চতুর্দ্দিকে গ্রাম্য নর-নারীর কৌতূহল-দৃষ্টি সাহেবদিগের নিকট বেশ কৌতুককর মনে হইল। নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে বন্দুক উঠাইয়া দুই একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলে, তাহারা যখন তাহাদিগের সবেগ পলায়ন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে, তখন সাহেবরা মধ্যে-মধ্যে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের ভীতিটাকে বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে!

ব্যাপারটা যদি এই অবধি আসিয়াই থামিয়া যায়, তাহা হইলে সব দিকেই মঙ্গলকর হয়, এবং কোন পক্ষেই উদ্বেগ বা অভিযোগের কারণ থাকে না! কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাচক্রগুলির সহিত যোগেশচন্দ্র ও কমলার ভাগ্যচক্রও যে একটা অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য গতির বশে ঘুরিতেছিল, তাহাতে ত কেহ বাধা দিতে পারে না, তাই একদিন সন্ধ্যার সময় ব্যাপারটা কিছু ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইটি কৃষকরমণী নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহারা যখন নদীর জলে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল, তখন পীটার আসিয়া ধীরে ধীরে নদীতীরবর্ত্তী বাবলাগাছের ঝোপের পাশে লুকাইল। সরলা গ্রাম্য নারী দুইটি তাহা দেখে নাই। তাহারা তখন নির্জ্জন ঘাটে আপনাদের সুখ-দুঃখের আলোচনাতেই একান্ত ব্যস্ত ছিল। সহসা একটি রমণীর সে দিকে দৃষ্টি পড়িলে, চুপি চুপি সে সখীর কাণে কহিল, "ওলো শশী ঠাকুরঝি, দেখেছিস্? সাহেব!"

স্বামীগৃহ-প্রত্যাগতা কিশোরী শশী বড় শঙ্কিতা হইল। সে কহিল, "কি হবে, বৌ?"

"কি আর হবে? তাড়াতাড়ি 'দুর্গা' নাম করে পালাই চ।"

জলের কুম্ভ কক্ষে করিয়া আপনাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া কম্পিত ত্রস্ত চরণে তাহারা গ্রামের পথে চলিতে লাগিল। শশী ভয়ে দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না। খানিকটা পথ অতিক্রম করিতেই, সে তাহার পৃষ্ঠদেশে কাহার করস্পর্শ অনুভব করিল। ভয়ে সে কুম্ভ ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভ্রাতৃবধূ যখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, সাহেবটা শশীর হস্ত ধারণ করিয়াছে, তখন সে ভয়ে চীৎকার করিয়া অদূরবর্ত্তী এক কৃষকের বাটীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

সাহেব শশীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া কহিল, "মাই ডারলিং, ডর্ করিয়ো না। হামি কি বাঘ আছে যে, খাইয়া ফেলিবে! হামি টুমারে ভাল বাসিবে!" শশীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সাহেব তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, শশী সবলে বস্ত্র সংযত করিয়া আক্রোশে সাহেবের হাতে দংশন করিল। "ও ইউ,—ইউ—বিচ্" বলিয়া সাহেব তাহার হাত দুইটা ধরিয়া তাহাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া সজোরে তাহার উদরে সবুট পদাঘাত করিল। শশী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো বাবাগো, মাগো, সাহেবে মেরে ফেললে গো!" পীটার তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, যেমন তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে, অমনই পশ্চাত হইতে কে তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া সবলে আকর্ষণ

করিল! এই আকস্মিক শত্রুটির মুখ-চোখ দেখিবার অবসর মাত্র না দিয়া, আগন্তুক সাহেবের নাকে মুখে প্রচণ্ডভাবে ঘুষি মারিতে লাগিল। সাহেবের নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পরে আগন্তুক তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে পদাঘাত করিতে করিতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, আজ!" পরে শশীর দিকে চাহিয়া আগন্তুক কহিল, "শশী, কোন ভয় নাই। আমি এসেছি!"

"কে? যোগেশদা!"

শশীর জ্ঞান ছিল না সে তখনও দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল!

নদীর ধারে বেড়াইতে আসিয়া যোগেশচন্দ্র সহসা অদূরে রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া নদীর ধার দিয়া দৌড়িয়াই ঘটনাস্থলে আসিয়াছে। উঃ, খুব সময়ে সে আসিয়া পড়িয়াছে! যদি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত? একটা অমূলক আশঙ্কায় যোগেশের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সাহেবকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া শশীর হাত ধরিয়া যোগেশ তাহাকে বাড়ী রাখিয়া আসিল।

এ সংবাদ প্রচ্ছন্ন রহিল না। পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, একটা সাহেব ছিদামের মেয়ের উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, এবং মাষ্টার মহাশয় তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবার তারিণীশঙ্করের তলব পড়িল। তারিণীশঙ্কর চাপকান জোব্বা আঁটিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রুষ্ট স্বরে কহিল, "এরূপ অত্যাচারের ত আর প্রশ্রয় দিতে পারি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট আরও দুই চারিটা

রূঢ় কথা বলিলে তাহার উত্তরে তারিণীশঙ্কর কম্পিত স্বরে কহিলেন, "স্যর, আমিও বিরক্ত হইয়াছি! এমন অপরাধীকে আমি আমার গ্রামে আর স্থান দিব না! তাহার জন্য আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারি না ত! আমি নিজে সম্পূর্ণ নির্দোষ!"

গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরিয়া তারিণীশঙ্কর একখানি পত্র লিখি-লেন এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরতর কণ্ঠে ভৃত্যকে কহিলেন, "যোগেশবাবুর বাড়ী দিয়ে আয়।"

খোলা জানালার ধারে বসিয়া যোগেশচন্দ্র তখন ছাত্রদের অনুবাদপত্র সংশোধন করিতেছিল। বেহারি যাইয়া পত্র দিল। পত্র পাঠ করিয়া যোগেশচন্দ্র জড় পুত্তলির ন্যায় নিস্পন্দভাবে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল!

ঘন কালো মেঘে তখন আকাশের আপ্রান্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! সম্মুখে অনিবিড় বন নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! ক্বচিৎ দূর হইতে কোন কৃষকের কর্কশ কণ্ঠের তাললয়হীন গ্রাম্য-গীতিস্বর শুনা যাইতেছে! আজ যোগেশের চিত্তাকাশও একটা সুনিবিড় কৃষ্ণ মেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে! তারিণীশঙ্কর লিখিয়াছেন, তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না! যোগেশের এই বাড়াবাড়িতে তাঁহার জমিদারী নষ্ট হইতে বসিয়াছে! সাহেবকে মারিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? যোগেশকে গ্রাম ও চাকরি পরিত্যাগ করিতে হইবে! আজ হইতে যোগেশের সহিত তারিণীশঙ্করের সমস্ত সৌহৃদ্য-বন্ধনও ছিন্ন হইল!

সমস্ত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন এক কথায় ছিন্ন করিতে হইবে!

কেন ? কি অপরাধে ? যোগেশের চোখ ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সহসা কক্ষের বাহিরে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া যোগেশ তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল ! কমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তারিণীবাবুর চাকর চিঠির জবাব চাচ্ছে !" কথাটা যোগেশ শুনিয়াও শুনিল না। কমলা নিকটে আসিয়া কহিল, "চিঠির জবাব দেবে না ?" তবু যোগেশ নিরুত্তর রহিল ! কমলা তখন যোগেশের পাশে বসিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিল ! যোগেশ অর্থহীন দৃষ্টিতে কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল ! তাহার চোখে কোন ভাব ছিল না !

কমলা কহিল, "কি, তোমার মুখ এত ভার কেন ? কি ভাবছ ?"

"কিছু না !"

"কিছু না, কি ? হাঁ, তুমি ভাবছ ! বলবে না, আমাকে ? লক্ষ্মীটি বল, আমার বড় মন কেমন কচ্ছে ! কি ভাবছ, বল !"

কমলার চোখ-দুইটি ছল-ছল করিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগেশ কহিল, "অনেকদিনের স্নেহের বন্ধন আজ ছিন্ন করতে হবে, কমল ! মনিবের হুকুম হয়েছে !"

"তার মানে ?"

"আমাকে চাকরি ও চাকদালি গ্রাম ত্যাগ করতে হবে !"

"কেন ?"

"বুঝতে পারবে না। এই চিঠি দেখ !"

কমলা কম্পিত হৃদয়ে পত্রখানা পড়িতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "এখন কি করবে ?"

"তুমি কি করতে বল ?"

"অত্যাচারীকে মেরে, বিপন্নকে রক্ষা করে ত তুমি অন্যায় কর নি, তার জন্য যদি চাকরি ছাড়তে হয় ত, এখনই ছাড় !"

"তার পর ?"

"তার পর রাণীহাটের বাড়ীতে চল। তুমি চাষ করবে, আমি পৈতে বেচব, মুড়ি বেচব, তাতে কোন অসম্মান নেই !"

"তোমার মত স্ত্রী যার, কে তাকে আশ্রয়হীন করে ? তুমি সত্যই আমার কমলা" বলিয়া সজল নয়নে যোগেশচন্দ্র কমলার অধরে চুম্বন করিল।

তারিণীশঙ্কর উত্তর পাইলেন, "কাল বৈকালে আপনার গ্রাম পরিত্যাগ করিব। এতদিনের বাস উঠাইতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই এই অবকাশটুকু শুধু ভিক্ষা চাই !"

পত্র পাঠ করিয়া তারিণীশঙ্কর রুমালে চোখ মুছিলেন। বেদনার গুরুভার তাঁহার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল। সে রাত্রে তারিণীশঙ্করের নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি নিতান্ত অধীরভাবে তিনি কক্ষসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন। চিঠিখানা বড় রূঢ় হইয়াছে ! কিন্তু হায়, উপায় নাই ! উপায় নাই !

পরদিন থানা হইতে আসিয়া যোগেশ কহিল, "কমল, এইবার তোমাকে একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে ! বেহারির সঙ্গে তোমাকে রাণীহাটে যেতে হবে !" রাণীহাটে যোগেশের জন্মভূমি।

"আর তুমি ?"

"আমার ত এখন যাওয়া হবে না! মকদ্দমার জন্য আমাকে থেকে যেতে হবে!" বিস্তর অশ্রু, আবেদন ও অনুনয়ান্তে কমলা যোগেশের প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন বেহারিকে সব কথা বুঝাইয়া যোগেশ কহিল, "বেহারি, তুমি ওকে দেখো, ওর আর কেউ নেই!"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে বেহারি কহিল, "সে জন্য কিছু ভেবো না, বাবা। যতদিন আমি আছি, ততদিন আমি প্রাণপণে আমার মাকে দেখব! কিন্তু তুমি কবে ফিরবে ?"

মলিন হাসি হাসিয়া যোগেশ কহিল, "ভগবান যেদিন দিন দেবেন, সেই দিনই আমি ফিরব! আমার আর মাথা গোঁজবার জায়গা কোথা, বেহারি ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মকদ্দমায় যোগেশের হার হইল। সাহেবের ব্যারিষ্টার বেশ করিয়া বুঝাইল যে, মিষ্টার পীটার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কোন প্রকার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না; সেখানে এই গ্রাম্য স্ত্রীলোক দুইটিকে ভয় পাইতে দেখিয়া তিনি কেবল বলিয়াছিলেন, 'আমি বাঘ নহি, ভয় কেন? আপনারা নির্ভয়ে পথ দিয়া চলিয়া যান।' এমন কি, সাহেব তাঁহাদিগকে 'সিষ্টার' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশিক্ষিতা 'নেটিভ' রমণীগুলা তবু ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

তখন আসামী আসিয়া সাহেবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। সাহেব ব্যাপার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত, শিক্ষাগর্ব্বিত বাঙ্গালীটা কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সাহেবকে মারিবার জন্য লোকটার একটা 'ম্যানিয়া' আছে! কিছুদিন পূর্ব্বে নির্দ্দোষ গোরাকে মারিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে! লোকটা বন্য ভল্লুকের ন্যায়ই ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে ইত্যাদি!

যোগেশের স্বপক্ষে যতগুলি যুক্তি-তর্ক ছিল, তাহার সমস্তই ব্যারিষ্টার সাহেবের বক্তৃতা ও সজোর আস্ফালনের স্রোতে ভাসিয়া গেল। জজসাহেব তখন যোগেশচন্দ্রের প্রতি এক বৎসরের কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন!

সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এই মকদ্দমার ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল! কমলা অচিরে এ সংবাদ পাইল। সে তখন পাগলিনীর ন্যায় তাহার পিতৃব্যের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। পিতৃব্য কহিল, "আমি এত টাকা কোথায় পাব, বল! ছি, অমন গোঁয়ার্ত্তুমি করতে আছে? সাহেবের গায় হাত! মনে করতেও গায়ে কাঁটা দেয় যে! দুর্গা, শ্রীহরি!"

বাহির হইতে বেহারি ডাকিল, "মা!"

"কেন, বেহারি?"

"টাকা পেলে না, মা? চলে এস। দেখি, আর কোথাও জোগাড় করতে পারি কি না!"

বেহারি কমলাকে রাণীহাটে আনিয়া কহিল, "কিছু ভেবো না, মা, আমার যথাসর্ব্বস্ব বেচে তিনশ' টাকা পেয়েছি, নিজেও

কিছু জমিয়েছি, সবশুদ্ধ এই ছ'শ' টাকা নিয়ে, আজই আমি উকীল বাবুর কাছে চল্লুম! তিনি কলকাতায় গিয়ে সব বন্দোবস্ত করবেন, তুমি কিছু ভেবো না, মা!"

"বেহারি, তোমার এ দয়া কখনও ভুলব না, বাবা!"

"দয়া কি, মা? এই হাতে যে আমি যোগেশকে মানুষ করেছি! সে যে আমার বুক কতখানি জুড়ে আছে, তা-ত তুমি জান না, মা!" বেহারি ধীরে ধীরে চোখ মুছিল।

বিস্তর অর্থব্যয়ে আপীল হইল। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী স্বব্যয়ে কৌঁসুলি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু জজের রায় অবিচলিত রহিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে যোগেশচন্দ্রকে কারাপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কারারক্ষক সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস, অবশেষে বারোটি মাসই কাটিয়া গেল। নানারূপ দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া শ্রাবণ মাসের একটি মেঘমুক্ত প্রভাত স্নিগ্ধ অরুণরশ্মির মুকুট মাথায় লইয়া দেখা দিল! সেদিন প্রাতঃকালে যোগেশচন্দ্র হরিণবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘ এক বৎসর পরে, আজ প্রকৃতির মুক্ত আনন্দের মধ্যে আসিয়া যোগেশচন্দ্রের অনেকখানি দুশ্চিন্তা যেন কাটিয়া গেল। কিন্তু—! হায় রে মানবজীবন; যদিও এ জগতে তাহার সকল

সাধ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপক্রম করে, তবু বুকের এক কোণে যে একটি ক্ষুদ্র 'কিন্তু'র মেঘ দেখা যায়, সে মেঘটুকু কিছুতে ঘোচে না রে, কখনও ঘোচে না!

আজ স্বাধীনতা পাইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিতেই যোগেশচন্দ্রের নয়ন-সমক্ষে অনশনক্লিষ্টা, প্রতীক্ষা-কারিণী, চিন্তা-পীড়িতা, সাধ্বী পত্নীর দীন অথচ লক্ষ্মীশ্রীবিচ্ছুরিত মুখচ্ছবিখানি ফুটিয়া উঠিল। অমনই তাহার সমস্ত প্রাণখানা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় রাণীহাটে উড়িয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু বেলা দুইটার পূর্ব্বে ট্রেণ নাই! একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস, যোগেশচন্দ্রের বুকের মধ্যে, নৈরাশ্যের তীব্র হাহাকার জাগাইয়া তুলিল!

সহসা এক পাগড়ী-পরা দরোয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু সেলাম দিয়াছেন!" যোগেশ দেখিল, কিয়দ্দূরে পথের অপর পার্শ্বে একখানি 'ল্যাণ্ডো'তে বসিয়া একটি বাবু! যোগেশ নিকটে আসিতেই বাবুটি গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার করকম্পন করিয়া কহিল, "আপনার নাম, যোগেশবাবু? আপনিই 'দীপালী'র এডিটর?"

"আমারই নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়!"

"আমাকে বোধ হয় আপনি চেনেন না। আমার নাম শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দত্ত!"

অভিবাদন করিয়া যোগেশ কহিল, "আপনিই আমার জন্য কৌম্সুলি নিযুক্ত করেছিলেন?"

মৃদু হাসিয়া হেমেন্দ্রবাবু কহিলেন, "কিন্তু কোন ফল হয়নি! সে কথা যাক্! আপনার সঙ্গে একটি কথা আছে।"

"কি, বলুন। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে কোন কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না!"

"আমি একখানা মাসিকপত্র বার করব, আপনার ন্যায় তেজস্বী ও সত্যপ্রিয় সম্পাদকের হাতে সেটি দিতে চাই, আর আমার পুত্রদুটিকে আমি আপনার শিক্ষকতা ও অভিভাবকতায় সম্পূর্ণভাবে রাখতে চাই, আপনি যদি আপত্তি না করেন—"

"আপনি আজ বুভুক্ষুকে অন্নদান করলেন। দেশে আমার স্ত্রী আছেন, তাঁকে শুধু নিয়ে আসতে হবে!"

"বেশ কথা! কটায় ট্রেণ?"

"বেলা দুটায়!"

"এখন তা হলে আমার ওখানেই চলুন, ঐখানে বিশ্রাম করে যাবেন! আর আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যত শীঘ্র পারেন, আসবেন! আমি আপনাদের বাড়ীর বন্দোবস্ত করে রাখব! আর যদি কিছু মনে না করেন, ত আপাতত খরচের জন্য—"

কৃতজ্ঞতায় যোগেশের চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "আপনি আমাদের বিপন্ন পরিবারকে কিনে রাখলেন!"

"আপনাকে বন্ধুভাবে লাভ করে আজ আমার কতখানি আনন্দ, তা প্রকাশ করে বলতে পারি না! বাঙ্গালীর ভিতর যে এখনও মানুষ আছে, আপনি তার পরিচয় দিয়েছেন! আপনার নির্ভীকতা ও সৎ সাহসের আমি প্রশংসা করি।"

যোগেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া হেমেন্দ্রবাবু নিজে তাহার পার্শ্বে বসিলেন। কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগেশচন্দ্র যখন রাণীহাটের পথ ধরিয়া আপনার জীর্ণ অট্টালিকার পানে চলিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা! সুষুপ্ত গ্রাম নিস্তব্ধ।

শ্রাবণ মাস। একটু পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে! গাছের পাতা হইতে টুপ্‌টাপ্ করিয়া জলের ফোঁটা পড়িতেছে! গ্রামের শুষ্ক ডোবাগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে অসংখ্য ভেকের কর্কশ স্বর উত্থিত হইতেছে! কালো মেঘের পর মেঘের স্তর আসিয়া জমিতেছে! চারিধার যেন মসীলিপ্ত! আকাশে চাঁদ নাই, তারা নাই! বড় বড় গাছের ঝোপগুলার চারিপার্শ্বে দ্যুতিমান জোনাকিগুলা কালো মখমলে খচিত চুম্‌কির মতই ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে! সুগভীর ঝিল্লীধ্বনিতে আড়ম্বরহীন গ্রামের সরল সঙ্গীতরাশি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!

গৃহের সম্মুখে আসিয়া যোগেশ ডাকিল, "বেহারি!"

কোন উত্তর নাই!

যোগেশের বুকের রক্ত সোঁ সোঁ শব্দে মাথায় উঠিতে লাগিল। রক্তের এই সবেগ গতির শব্দটা সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল। পায়ের কাছ দিয়া একটা সরীসৃপ সর্ সর্ শব্দে সরিয়া গেল।

আশঙ্কায় এবং উদ্বেগে যোগেশের বক্ষস্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম করিল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া যোগেশ আবার ডাকিল, "বেহারি!"

"যাই—"বলিয়া প্রদীপ হস্তে একজন বৃদ্ধ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল!

এ কে! বেহারি? এক বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! এ যে তাহাকে মোটে চেনা যায় না!

যোগেশ কহিল, "বেহারি, আমি এসেছি!"

মুখ তুলিয়া বেহারি কহিল, "এসেছ বাবা?"

বেহারির স্বর ফুটিল না। সে মস্তক নত করিয়া দীপ হস্তে চলিল। যোগেশ নির্ব্বাক্ স্তম্ভিতভাবে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল! যোগেশ কহিল, "বেহারি, বাড়ীর সব খপর ভাল ত? কমল ঘুমুচ্ছে বুঝি?" কথাটা বলিতেই যোগেশের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত তালে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

যোগেশ তাহার সেই অতি পুরাতন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কত কাল পরে! সজ্জিত কক্ষ! সজ্জিত শয্যা! যোগেশ যেন গৃহের সজ্জা-কর্ম্মনিরতা লক্ষ্মী পত্নীর কোমল করপল্লবদুটিও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এবং তাহার হাতের চুড়ির টুং-টাং শব্দটাও না ঐ শুনা যায়!

আজ যোগেশ গৃহে ফিরিয়াছে। পত্নীর সুকুমার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে। কমল কত সুখী হইবে!

যোগেশ কহিল, "কমল কোথা, বেহারি ?"

প্রদীপের শিখাটা ঈষৎ বাড়াইয়া দিয়া বাষ্পজড়িতে কণ্ঠে বেহারি কহিল, "স্বর্গে !"

"বেহারি—"

যোগেশের মনে হইল, কে যেন তাহাকে অনেকখানি উর্দ্ধে তুলিয়া সহসা সবলে একটা বিপুল অন্ধকারময় গহ্বর-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। এক হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া যোগেশ কহিল, "কবে হল ?"

"আজ সাত দিন ! কোন মতে মাকে ধরে রাখতে পারলুম না, বাবা, কোন মতে না ! উঃ, আর সাতটা দিন শুধু !"

বেহারি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ! তাহার হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল ! কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। বেহারিও মাটিতে বসিয়া পড়িল।

*

পরাজয়

ধূলি-কঙ্করযুক্ত প্রথম পথটা অতিক্রম করিয়া সংসারের বিচিত্র পুষ্প-খচিত তোরণদ্বারে হেমেন্দ্র যেমনই প্রবেশ করিবে, ঠিক এমন সময় তাহার জীবন-সঙ্গিনী প্রাণাধিকা পত্নী লীলা একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

. এই দারুণ শোকের বেগ হেমেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিল না। না পারিবারই কথা! সে এক দুর্দ্দিনে লীলা হেমেন্দ্রনাথের জীবনপথে সঙ্গিনী হইয়াছিল। যখন একমাসের মধ্যে দুর্দ্দান্ত প্লেগের আক্রমণে হেমেন্দ্রনাথের পিতা-মাতা ইহজীবন পরিত্যাগ করেন, লীলা তখন নববধূমাত্র! সে সময় স্বামীর জীর্ণ চিত্ত-সংস্কারে, লীলা পিত্রালয়ের স্নেহ-আদর ও আপনার কতখানি সুখ, কতখানি সাধ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহা শুধু হেমেন্দ্রনাথই জানে! লীলা যে তাহার সংসারে একমাত্র শান্তি, একমাত্র আনন্দ, তাহার আশা-ভরসা, এক কথায় তাহার সর্ব্বস্ব ছিল! সেই লীলা আজ নাই? সমস্ত সংসার হেমেন্দ্রনাথের চক্ষে কুয়াশাচ্ছন্ন, অসার বলিয়া বোধ হইল!

এক মাস হইল, হেমেন্দ্র বি-এল পাশ করিয়াছে। সে দিনের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ হয় না! লীলাকে সুখী দেখিয়া হেমেন্দ্র আপনার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল! তাহার পর কয়-

দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া ভবিষ্যতের কত সুখচিত্র অঙ্কিত করিত! সেই সুরঞ্জিত কল্পনা আজ নিতান্ত মিথ্যা জল্পনায় পরিণত হইয়াছে!

আত্মীয়-স্বজন সান্ত্বনা দিলেন। কেহ বা গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার দুঃখ কি বাবা, আবাব সব হবে!" হেমেন্দ্র নীরবে সে কথা শুনিল!

হেমেন্দ্রর অবস্থা ভাল, বয়স অধিক নহে, বিদ্যারও অভাব নাই, গৃহে নিকট আত্মীয়ও ছিলেন, সুতরাং ঘটকের আনাগোনা অবিলম্বেই সুরু হইল! হেমেন্দ্র ভাবিল, কি এ পৈশাচিক হৃদয়-হীনতা! সেদিন ইহারা যাহাকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়াছে, যাহার পবিত্র স্মৃতি এখনও ঘরের চারিধারে বর্ত্তমান, হাতে বোনা কার্পেটের ছবি, আলমারিতে পুতুল, সিঁদুর কৌটা, মাথার চিরুণি, চুলের ফিতাটি পর্য্যন্ত আজও তেমনই সাজানো, তেমনই অমলিন রহিয়াছে, তাহার কথাটা ইহারা ইহার মধ্যেই কি না এমন নিষ্ঠুরভাবে ভুলিতে বসিয়াছে!

হেমেন্দ্র আপনার কক্ষে বিছানায় পড়িয়া লীলার একখানি ফটো বুকে লইয়া তাহারই কথা ভাবিতেছিল। পার্শ্বে লীলার কালিমাখা চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া রহিয়াছে! ইহাই এখন হেমেন্দ্রনাথের সম্বল।

সহসা সে শুনিল, বাহিরে ঘটকী তাহার পিতৃব্য-পত্নীকে মৃদু কণ্ঠে কহিতেছে, "তুমি দেখো মা, সে বৌমার চেয়েও সুশ্রী হবে!" হেমেন্দ্রর আর সহ্য হইল না। বাহিরে আসিয়া সে

কহিল, "খুড়িমা, তোমরা কি আমাকে বাড়ীতে থাকতে দেবে না?"

"কেন, বাবা?"

"কেন, আবার কি? এ রকম ভাবে জ্বালাতন করলে কিন্তু আমি বাড়ী থেকে চলে যাব! যে সে এসে এমন করে—" হেমেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! বিছানায় পড়িয়া বালকের ন্যায় সে কাঁদিতে লাগিল, "লীলা, লীলা, কেন, কি দোষে তুমি আমায় ত্যাগ করে গেলে? আজ আমি আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন! কোথায় তুমি? এস, কাছে এস, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার!"

২

দিনকতক বিবাহের আলোচনা থামিয়াছিল। আবার অল্পে-অল্পে, গল্পে-স্বল্পে সে প্রস্তাব উঠিতে লাগিল। উপরোধ, অনুরোধ, অভিমানের মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল।

একদিন খুড়িমা হেমেন্দ্রকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া নানারূপে বুঝাইয়া, কাকুতি মিনতি করিয়াও যখন ব্যর্থমনোরথ হইলেন, তখন স্নেহমাখা মুখখানি অশ্রুধারে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "হেম, আজ যদি দিদি থাকৃতেন, তা হলে কি তুই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারতিস্? আমি ত তোর মা নই, আমার কথা রাখবি কেন, বল্।" এ অস্ত্র অমোঘ! এ অস্ত্রে আজিকার যুদ্ধে হেমেন্দ্রর পরাজয় ঘটিল। মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ী বৃদ্ধার করুণ কণ্ঠের মর্ম্মভেদী অভিমানবাক্যে হেমেন্দ্রর দৃঢ়তা ক্ষণেকের জন্য

শিথিল হইল। সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হেমেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিল।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই সে খুড়িমার নিকট আসিয়া আবার আবদার ধরিল, "আমায় মাপ কর, আমি বিয়ে করতে পারব না।" কিন্তু তখন আর সে কথা কে শুনিবে? হেমেন্দ্রর মুখ হইতে বিবাহের সম্মতি বাহির হইতে না হইতেই সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে যে! এখন আর ফিরাইবার উপায় নাই।

শ্রাবণের এক মেঘ-স্নিগ্ধ নিশীথে, কলের পুতুলের মতই মাথায় টোপর ও গলায় ফুলের মালা দিয়া হেমেন্দ্রনাথ আবার বর সাজিয়া বিবাহ করিয়া আসিল!

আবার সেই বরণ, হুলুধ্বনি, শুভদৃষ্টি! আবার সেই বাসর-রাতি! কিন্তু ফুলের গন্ধে আজ যেন কোন মধুরতা ছিল না! বৈদ্যুতিক আলোও যেন তাহার চক্ষে নিষ্প্রভ মনে হইতেছিল! সে যেন কতকটা যন্ত্রচালিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় সকলের ব্যগ্র অনুরোধে, পীড়নে, একবার সে নববধূর প্রতি একটা চকিত দৃষ্টি মাত্র নিক্ষেপ করিল!

বাসর ঘরের আনন্দ-প্রবাহের মধ্যে যখন তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন আপনার হৃদয়-যন্ত্রটাকে কোনমতে চূর্ণ করিবার বিফল বাসনা তাহার মনের মধ্যে বার বার উদয় হইতেছিল!

তাহার মনে পড়িতেছিল, আর এক রাত্রির কথা! সে-ও এমনই পরিপূর্ণ আনন্দ-মধুর একটি জ্যোৎস্না-রাত্রি! সেদিনও

এমনই হাসি-আলো-গানের ছড়াছড়ি! কিন্তু আজিকার এ উৎসব-নিশীথের মত তাহা ম্লান ছিল না ত! হেমেন্দ্র ভাবিল, এ কি তাহার অন্যায়! একজনের প্রতি সে বিশ্বাসহীনতা করিয়াছে, আবার এ নিরপরাধা বালিকার প্রতিও অন্যায় করিবে! তখনই লীলার কাতর চক্ষু দুইটি সে যেন দেখিতে পাইল। লীলা কি মনে করিবে?

বাসর ঘরে হেমেন্দ্রর জীর্ণ চিত্তের সংস্কারেব জন্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না! আমোদে প্রমোদে গীতে গন্ধে সে কক্ষ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। তরুণী-কণ্ঠে যখন গান হইতেছিল,

"কত নিশি কেঁদে পেয়েছি এ চাঁদে,
চাঁদ আজ আর তুই যাস্‌নে রে"

তখন হেমেন্দ্রর মন গানেব দিকে ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এ সংসার যেন একটা অভিনয়-পীঠমাত্র! সেই এক শান্ত প্রভাতেব বিদায়-চিত্র তাহার মনে পড়িল। তাহাব ক্রোড়ে শ্রান্ত শির রাখিয়া লীলা যখন চিরবিদায় গ্রহণ করে, তখন গৃহে সে কি এক হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছিল! সেই বিরাট দুঃখ-হাহাকারের অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, আর আজিকার এই উৎসবে বিরাট আনন্দ-হাসির অভিনয়েও প্রধান ভূমিকা তাহারই! হেমেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে রুমালে আপনার নয়নপ্রান্ত মুছিল! তখন বাসরে গান চলিয়াছিল,

"কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে,
মিলন-যামিনী গত হলে!"

পরাজয়

বিবাহের পর রাণী পিত্রালয়ে অধিক দিন থাকিতে পায় নাই! হেমেন্দ্রর ভগ্নী চারু বধূর মুখে ম্লানিমা লক্ষ্য করিয়া চুপি চুপি তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৌদি, দাদা তোমাকে ভালবাসে?"

রাণী উত্তর দিল, "বাসে।"

"আদর করে?"

"হাঁ।"

চারু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। সে আবার বলিল, "তবে তোমার মুখ এত শুকনো কেন, ভাই?"

"শুকনো আবার কৈ, ঠাকুরঝি? তোমার যেমন ভাই কথা!"

"আচ্ছা, কাল কি কথা হয়েছিল, বল দেখি, শুনি!"

"না ভাই, সে আমাকে বলতে বারণ করে দিয়েছে!"

বধূর নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে না পারিলেও, চারু এটুকু বুঝিল যে, রাণীর সহিত হেমেন্দ্রর সম্পর্কটা নিতান্ত প্রীতি-মধুর নহে! লীলার সহিত যখন দাদার বিবাহ হয়, তখনকার সমস্ত ঘটনা চারুর মনে ছিল। তখন উভয়ের মুখ সে কি হর্ষোৎফুল্ল দেখিত। লীলা সাধিয়া তাহাকে রজনীর কাহিনী বিবৃত করিত, আর দাদাও কতবার তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বধূর সহিত প্রণয়-কলহ ভঞ্জন করিয়াছে। ক্রীড়া ও কৌতুকের সে যেন এক জীবন্ত অভিনয় ছিল! আর এখন কাহারও মুখে সে হাসি নাই! জীবনের যেন এতটুকু স্পন্দনও নাই! অথচ

রাণীর মত শান্ত মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না! রাণীর কথা ভাবিয়া চারু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সে রাত্রে পানের ডিবা হাতে লইয়া রাণী যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন হেমেন্দ্রনাথ বিছানার উপর পড়িয়া পূর্ব্ব কাহিনী ভাবিতেছিল। আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ ছিল না! শান্ত চাঁদের আলোকে চারিধার যেন স্বপ্নময় মনে হইতেছিল! ফুর ফুর করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে মশারির ঝালর উড়াইতেছিল! এবং সম্মুখের বারাণ্ডার টবের গাছ হইতে মনোহর পুষ্প-সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল।

হেমেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে উন্মুক্ত উদার আকাশের পানে চাহিয়া-ছিল! কয়েকটা নক্ষত্র প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত ইতস্ততঃ যেন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! অদূরে কদম ও চাঁপা গাছের পাতাগুলি মৃদু পবনস্পর্শে কাঁপিতেছিল! হেমেন্দ্র ভাবিতেছিল, লীলার কথা! একদিনও সে স্বপ্নে দেখা দেয় নাই! কি নিষ্ঠুর সে! তাহারই হেমেন্দ্র ধ্যানে বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিতেছে, অশান্ত চিত্তে এতটুকু শান্তির প্রত্যাশা করিয়া আকুল হৃদয়ে সে লীলার দর্শন মাগিতেছে, কিন্তু লীলা একবারও ফিরিয়া চাহে না! হায়, এত প্রেম, এত ভালবাসা,—মৃত্যুর পর কি তাহার এতটুকু অবশিষ্ট থাকে না, ভগবান!

আরও তাহার মনে পড়িতেছিল, লীলার প্রণয়-রাগ-রঞ্জিত শত সহস্র চিত্র! সেই একদিন হেমেন্দ্রনাথ থিয়েটারে গিয়াছিল—

অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া সে দেখে, লীলা মেঝের উপর শুইয়া হেমেন্দ্রর লিখিত চিঠিগুলি পড়িতেছে! সে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করায় লীলা প্রথমটা কিছু জানিতেই পারে নাই। হেমেন্দ্র কহিল, "ঘুমোও নি যে লীলা?" লীলা অমনই শশব্যস্তে উঠিয়া চিঠিগুলা তাড়াতাড়ি আঁচলে জড়াইয়া কোমরে গুঁজিল, ও হেমেন্দ্রর জামা, চাদর, ছড়ি প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর বাতাস করিতে করিতে সে কহিল, "কি দেখলে, বল!" তাহাতে হেমেন্দ্র—নিষ্ঠুর হেমেন্দ্র বলিয়াছিল, "হাঁ, সারারাত থিয়েটারে জেগে এখন আবার তোমাকে তার গল্প বলতে বসি! কাল বলব এখন!" তাহাতে লীলা আবদার ধরিয়া বলিয়াছিল, "বল না, লক্ষীটি। এর মধ্যেই ঘুমোবে? একটু গল্প করবে না?" হেমেন্দ্র কাতরা বালিকার এই সামান্য কথাটি সেদিন রক্ষা করে নাই! লীলাও ত কৈ কোন অভিমান করে নাই! সে বেশ প্রসন্ন মুখে শয্যা-প্রান্তে হেমেন্দ্রর বাহু বন্ধনে আপনাকে ধরা দিয়াছিল ত!

তাহার পর আর একদিন হেমেন্দ্র এক বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়া সে রাত্রে ফিরিতে পারে নাই! অতি প্রত্যুষে গৃহে ফিরিয়া সে দেখে, শয্যায় লীলা মোটেই শয়ন করে নাই, মেঝেতে গালিচার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বুকের নীচে হেমেন্দ্রর লিখিত বাঙ্গালা ডায়েরীর খাতাখানা পড়িয়া আছে! লীলার চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ ভোরের সেই স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে ঈষৎ উড়িতেছিল! বালিকার এই অদ্ভুত আত্মবিসর্জ্জনে একান্ত মুগ্ধ হেমেন্দ্র তাহার

সুন্দর মুখখানিতে চুম্বন করিতেই, লীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! চমকিয়া সে বলিল, "কখন এসেছ?"

"অনেকক্ষণ!"

"আমাকে ডাকনি কেন?"

"তুমি ঘুমুচ্ছিলে,—ভাবলুম, আহা, বেচারী ঘুমুচ্ছ! তাই আর ডাকলুম না!"

লীলা বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া সাভিমানে বলিয়াছিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু, আমাকে একবার ডাকলেও না, দুটো কথা কইতে পেলুম না! সকাল হয়ে গেছে, এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে!"

তখন হাসিতে হাসিতে, "না লীলা, আমি এই মাত্র এসে জামাজোড়া ছাড়ছি" বলিয়া হেমেন্দ্র আদর করিয়া নিশীথের ম্লান পুষ্পমাল্যটি লীলার শিথিল কবরীতে সংলগ্ন করিয়া দিল! লীলা আবেশ-বিহ্বল নেত্রে শুধু তাহার পানে চাহিয়াছিল! সে দৃষ্টিটুকু, সে কথাগুলি যেন কালিকার ঘটনা! এখনও না ঐ লীলার চুড়ির শব্দ শুনা যায়! হেমেন্দ্রর চক্ষে জল আসিল!

এমন সময় রাণী কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া আরসির টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিয়া শয্যায় হেমেন্দ্রর চরণ-প্রান্তে বসিয়া রাণী ধীরে ধীরে তাহার পায় হাত বুলাইতে লাগিল! সহসা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সে হেমেন্দ্রর শিয়রে আসিল।

হেমেন্দ্রর চক্ষে জল দেখিয়া অঞ্চল দিয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে রাণী কহিল, "কেন, কাঁদছ কেন? বল, লক্ষ্মীটি! বলবে না?"

হেমেন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে রাণীর পানে চাহিল, দেখিল, রাণীর চোখ ছলছল করিতেছে! তখন আপনার বাহু দিয়া রাণীকে বেষ্টন করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে সে ডাকিল, "রাণী!"

"কেন?" বলিয়া রাণী আর একটু কাছে সরিয়া আসিল, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, "বল, তোমার মনে কি হচ্ছে, বল আমাকে!"

হেমেন্দ্র বলিল, "আমি বড় নিষ্ঠুর, না? এখন লক্ষ্মী স্ত্রী তুমি, আর আমি তোমাকে একটুও আদর করি না, ভালবাসি না! সত্যি, আর কারো সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি ঢের সুখী হতে!"

"না, ও কথা বলো না। সত্যি আমি খুব সুখী হয়েছি! কিন্তু তোমাকে একটুও সুখী করতে পারছি না, এই দুঃখ! তুমি দিদির কথা বল আমাকে, আমার শুনতে বড় ভাল লাগে! আমি দিদির মত হতে চেষ্টা করব!"

"তারই কথা ভাবছিলুম, আমি! উঃ, তাকে কি ভালই বাসতুম! মানুষে যতখানি ভাল বাসতে পারে!"

রাণী গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আমিও ভাল বাসব!"

হেমেন্দ্র জানালার দিকে চাহিয়া রহিল! ডিবা হইতে পান লইয়া স্বহস্তে হেমেন্দ্রর মুখে তাহা দিয়া রাণী কহিল, "তুমি দিদির কথা বল, আমাকে—"

হেমেন্দ্র কিছুক্ষণ রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, "তোমার মুখ অনেকটা তার মুখের মত, তবে তার রঙ তোমার মত এতটা ফরসা ছিল না—"

রাণী স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি দিদির মত হতে চেষ্টা করব!"

হেমেন্দ্র কহিল, "আহা, অভাগিনী সে—"

রাণী কহিল, "না, তাঁকে অভাগিনী বলো না! তাঁর মত ভাগ্যবতী ক'জন হতে পারে? তাঁর পায়ের ধূলো পেলে আমি—"

হেমেন্দ্র সাদরে রাণীর মুখ আপনার মুখের উপর টানিয়া চুম্বন করিল, ডাকিল, "রাণী—"

রাণী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, রাণী না! তুমি আমাকে দিদির নামে ডেকো। আমাকে সেই মনে কর না কেন!"

৪

কিন্তু হেমেন্দ্র কিছুতেই শান্ত হইল না। সে আপনার চিত্তকে যত সংযত করিবার চেষ্টা করে, তত তাহার চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠে!

বন্ধু অমর কহিল, "এ তোমার ভণ্ডামি! রাণীর কথা যা শুনলুম, এমন ত গল্পেও পড়া যায় না! আহা, তোমার জীবনটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছল—রাণী নিশ্চয় তোমাকে সুখী করবে—"

হেমেন্দ্র কহিল, "তা জানি ভাই, রাণীর মত স্ত্রী দেখা যায় না, সে জন্য আমার আরও দুঃখ হয়। তাকে আমি তেমন ভাল বাসতে পারি কৈ! কেবলই মনে হয়, আমি কি পাষণ্ড!"

অমর কহিল, "এ তোমার অন্যায়—বিয়ে করেছ যখন—"

হেমেন্দ্র কহিল, "সে কথা কি বুঝি না, আমি? কিন্তু কেবল তার কথা মনে হয়, তাকে ভুলতে পারি না—"

অমর কহিল, "তাকে ভুলবে কি, বল? তাকে যদি ভোল, তা হলে ত তুমি মানুষ নও! কিন্তু রাণীর কথা ভাব, এইটুকু মেয়ে, তোমার দুঃখ কতখানি সে বোঝে! তার কথাগুলি কেমন, বল দেখি! বেশ ত, একে সে-ই মনে কর না, কেন?"

হেমেন্দ্র কহিল, "তা চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক পারি কৈ!"

হেমেন্দ্র বাড়ীতে বলিয়া-কহিয়া দিনকতকের জন্য মুশৌরী বেড়াইতে বাহির হইল।

মুশৌরী হইতে রাণী প্রত্যহই পত্রের আশা করিত, কিন্তু তাহার সে আশা মিটিত না! তাই বলিয়া সে কখনও পত্র লিখিতে এতটুকু অবহেলা করে নাই। এই পনেরো দিন হেমেন্দ্র মুশৌরী গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণী তাহাকে অন্তত নয়খানি পত্র লিখিয়াছে! বালিকা আদর চাহে না, ভালবাসা চাহে না—সে চায়, হেমেন্দ্রর দুঃখ কিসে দূর হয়! হেমেন্দ্র কিসে সুখী হয়! তাহা হইলে তাহারও সব সাধ মিটে! এ জগতে তাহার আর অন্য কামনা নাই!

হেমেন্দ্র বাড়ীতে চিঠি লেখে, চারুকে লেখে, খুড়িমাকে লেখে, কিন্তু রাণীকে লেখে না। অবশেষে একদিন সহসা রাণী হেমেন্দ্রর পত্র পাইল। হেমেন্দ্র লিখিয়াছে,—

প্রিয়তমাসু—

এখানে এসে রোজই প্রায় তোমার একখানি করে চিঠি পাচ্ছি, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় নি, তার জন্য কিছু মনে করো না। আমার মনের অবস্থা তুমি ত জান। এখনও সেই রকম! জগতে কিছুতে আমার শান্তি নেই। তোমাকে বিয়ে করে খুব অন্যায় করেছি! জানি না, সে অপরাধের শাস্তি কি! তোমার কোমল হৃদয়ে কত কষ্ট দিচ্ছি! কি করব? নিরুপায়—! আমার হৃদয় বুঝে আমাকে তুমি ক্ষমা করো!

আমার জীর্ণ চিত্তকে গড়ে তোলবার জন্য, তুমি যে কত চেষ্টা করেছ, তা আমি বুঝি! মানুষ এতদূর পারে বলে জানতুম না! আমি তোমার সে ঋণ পরিশোধ করতে পারব না! সে অমূল্য প্রেম, আমি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি! তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ! সে কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! যাই হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও। শারীরিক ভাল আছি! তোমরা ভাল আছ জেনে সুখী হলুম! ইতি

তোমার হতভাগ্য স্বামী

হেমেন্দ্র।

পত্রখানি বার বার পড়িয়া, মাথায় ছোঁয়াইয়া, বুকে ছোঁয়াইয়াও রাণী যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না! জীবনের একমাত্র পাথেয় স্বামীর এই 'প্রিয়তমা'-সম্বোধনটুকু পাইয়া সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞীর ন্যায় সে আপনাকে মহীয়সী জ্ঞান করিল!

৫

সহসা একদিন হেমেন্দ্র জ্বর-গায় বাটী ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। বাটীর সকলে তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাণী একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। রাণীকে কেহ একদণ্ড সে কক্ষ ছাড়িতে দেখিল না। ক্ষুদ্র বালিকা আপনার প্রাণপণ শক্তি লইয়া যমের সহিত সংগ্রাম করিল। ডাক্তার আসিয়া যে দিন জীবনের আশা দিলেন, রাণী সেদিন আনন্দে ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া অশ্রু গোপন করিতে পারিল না। আর একজনকে বার বার সে প্রণাম করিয়া কহিল, "দিদি, তুমি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছ. এবার কোনমতে যে রক্ষা হয়েছে, সে কেবল তোমারই পুণ্যে!"

ডাক্তার আসিয়া কহিল, "কেবল সেবার জন্য, এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে! ঘড়ি ধরিয়া শুশ্রূষা, ঔষধ খাওয়ান, মাথায় বরফ দেওয়া, এ সকলের কোনটাতে যদি সামান্য ত্রুটি ঘটিত, তাহা হইলে দুরন্ত টাইফয়েড হইতে কোনমতে রক্ষা করা যাইত না!" এবং তিনি এই বালিকা বধূর ঐকান্তিক সেবা-যত্নের কথা বার বার উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না।

সে দিন শেষ রাত্রে রোগ-ক্লান্ত হেমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন সে লীলার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে! লীলা যেন বলিতেছে, "কেন, তুমি ওকে এত অযত্ন করছ? আমার অদৃষ্ট, তাই চলে এলুম, কিন্তু আমি তোমাকে রাণীর হাতে দিয়ে যে নিশ্চিন্ত আছি! যথার্থ আমার সর্ব্বস্ব, তুমি ওর

মধ্যে পাবে! ওকে দেখো, লক্ষ্মীটি, ও আমার ছোট বোন্, ওকে কোন অযত্ন করো না!”

সহসা হেমেন্দ্রর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে একেবারে ডাকিল, “লীলা—”

নিদ্রাভঙ্গে হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখে, রাণী তাহার পায়ের উপর মাথাটি রাখিয়া অত্যান্ত সঙ্কোচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! তখনই মনে পড়িল, তাহার পায় হাত বুলাইয়া রাণী নিদ্রা-আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল, তার পর আর কি নিজে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

পাশের খোলা খড়খড়ি দিয়া শেষ রাত্রের চাঁদের আলো আসিয়া রাণীর মুখখানির উপর পড়িয়াছিল। হেমেন্দ্র দেখিল, এ যেন সেই লীলারই মুখ! চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ সেই ভাবেই কপালখানির উপর উড়িয়া পড়িয়াছে! কয়দিনের জাগরণে, চিন্তায়, মুখখানি প্রভাতের বাসি ফুলের মতই শুকাইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে!' হেমেন্দ্র ভুলিয়া আবার ডাকিল, “লীলা, ও লীলা!”

“উঁ!” রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। অপ্রতিভভাবে উঠিয়া বসিয়া আবার সে হেমেন্দ্রর পায় হাত বুলাইতে লাগিল।

হেমেন্দ্র হাত বাড়াইয়া ডাকিল, “রাণী, এস, কাছে এস!” রাণী সরিয়া কাছে আসিল। হেমেন্দ্র তাহার হাতখানি আপনার রোগশীর্ণ হাতে তুলিয়া কহিল, “রাণী, এইমাত্র তাকে স্বপ্নে দেখলাম, তোমার দিদিকে! তোমাকে অনাদর করি বলে সে কত দুঃখ করছিল!

রাণী সাগ্রহে কহিল, "দিদি আর কি বললেন, বল—"

হেমেন্দ্র রাণীর চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "আর বললে, তুমি সে-ই! আমাকে মাপ কর রাণী, আমি আর তোমাকে অযত্ন করব না, অনাদর করব না, ভাল বাসব!"

আনন্দে রাণীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! স্বামী রোগমুক্ত হইয়া যে তাহাকে আদর করিয়াছে, এ অপ্রত্যাশিত সুখের মাত্রাটুকু সে আপনার ছোট বুকখানির মধ্যে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না!

রাণী কহিল, "আমাকে শুধু দাসী বলে পায়ে—"

হেমেন্দ্র তাহার মুখ আপনার বুকের উপর টানিয়া ধীরস্বরে কহিল, "না, না, পায়ে কেন? তুমি আমার বুকের ধন, তোমায় বুকে করে রাখব! আমার খালি বুকখানি পূর্ণ করে থাক।"

তখন উষালোকে দুই একটা পাখী সবেমাত্র কুহরিয়া উঠিয়াছে, এবং রাস্তা দিয়া থিয়েটার-প্রত্যাগত বালকের দল গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা—"

মণিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে বৎসর যখন ভীষণমূর্ত্তি প্লেগদৈত্য এক হস্তে মৃত্যু, অপর হস্তে কোয়ারাণ্টাইন-ভীতি লইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিল এবং সন্ত্রস্ত নগরবাসী প্রাণ ও মান লইয়া সুদূর পল্লীর উদ্দেশ্যে ব্যস্তভাবে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় সুশীলকুমার তাহার পরিবারবর্গ লইয়া দীর্ঘকালের কলিকাতা-বাস ত্যাগ করিয়া কমলদহের পল্লীবাসভূমিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্ষুদ্র গ্রাম জমিদার বাবুর আগমনে সরগরম হইয়া উঠিল।

জমিদার বাবু কখনও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হইত না বলিয়া বৃদ্ধ নায়েব ভজহরি জমিদারী-কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুযোগ করিত। এক্ষণে তরুণ প্রভুকে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহার হৃদয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

পল্লীগ্রামের নিরীহ বালকের দল যখন দেখিল যে, তাহাদের জমিদার বাবু তাহাদেরই মত হস্তপদবিশিষ্ট মানব, কেবল তাহার নয়নযুগলের সম্মুখে একজোড়া কাঁচের পরদা মাত্র অতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান, তখন তাহাদের অস্থির হৃদয় কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল।

এইরূপে জমিদার বাবুর গ্রামে শুভাগমন ব্যাপারটি যে সকল আনন্দ-কৌতূহল-আগ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুশীলকুমার এমন একটি কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিল যে, সাধারণে, বাহিরে না হউক, অন্তরের মধ্যে, কিছুতেই তাহার সুশিক্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির অনুমোদন করিতে পারিল না।

কমলদহে আসিবার কিছু দিন পরে সুশীলকুমারের পত্নী সুকুমারী একদিন স্বামীকে কহিল, "এমন জায়গা ছেড়ে কলকেতা যেতে আমার একটুও ইচ্ছা করে না, বাপু। কেমন খোলা নির্জ্জন জায়গা এ! গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি নেই, কোন অশান্তি নেই।"

সুশীল কহিল, "তোমার একখানা কাব্য লেখা দরকার হয়ে পড়েছে, সুকু!"

সুকুমারী কহিল, "না, সত্যি, ঠাট্টা নয়। আমি এখানেই থাকব। কলকেতায় যেতে হয়, তুমি যেও।"

সুশীল কহিল, "কি রকম হল, কথাটা?"

সুকুমারী কহিল, "তা না ত কি? তুমি ত আর তোমার সঙ্গীতসমাজ কি বন্ধুবান্ধব, এ সব ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না। বিশেষ এ অজগর বিজন বন, ঝিঁঝিঁ ডাকৃছে, শিয়াল ডাকৃছে!"

সুশীলকুমার সুকুমারীর কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল, "মরি, মরি, এমন না হলে আর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী তুমি!

কলকেতায় প্লেগ, পাওনাদার, ধুলো আর চিম্‌নীর ধোঁয়ার মধ্যে না পাঠিয়ে আমাকে কেন দ্বীপান্তরে পাঠাও না!"

সুকুমারী মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, কথাটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?"

"নিষ্ঠুরা নারী, আমি পাড়াগাঁ সহর অত-শত বুঝি না। তোমার মুখখানি দেখতে পেলে সব ঠাঁই আমার পক্ষে স্বরগ সমান", বলিয়া সুশীল সাদরে পত্নীর কোমল অধরে চুম্বন করিল।

কমলদহে স্থায়িভাবে বাস করিতে হইলে বাটীর যেখানে যেরূপ সংস্কার আবশ্যক, স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া, সেই দিনই তাহার পরামর্শ করিতে বসিল।

ইহার দুই তিন দিন পরে বাড়ী মিস্ত্রীর কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। জীর্ণ আস্তাবলের সংস্কার হইতে লাগিল। খড়-খড়ি ঝিলমিলিতে রঙ্ পড়িল। লোহিত মৎস্য রক্ষার জন্য সুদৃশ্য ফোয়ারা রচনা, গেটের পথে কাঁকর ফেলা এবং গাড়ী বারান্দার থামগুলির অন্তরালে নানাবিধ রঙীন বিলাতী ফুলের গাছ বসান প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে সংস্কার ও সজ্জার ধূম পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুশীলকুমারের সুবৃহৎ অট্টালিকার পিছনে তাহাদের একখানি ছোট বাগান ছিল। তাহার পশ্চাতে জনৈক দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণ বাটীর পরে, তাহাদের আর একখানি যে বড় বাগান ছিল, একদিন সেখান হইতে ফিরিয়া সুশীল সুকুমারীকে কহিল, "একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে, সুকু!"

"কি ?"

"এই খিড়কীর ছোট বাগানখানার সঙ্গে ওদিককার বড় বাগানটা মিলিয়ে দেওয়া যাক। চারি ধারে উঁচু পাঁচিল তুলে ঘিরে, মধ্যে বেশ একটি মাঝারি রকমের দীঘি কাটানো যাবে; একখানা জলি বোট আনাব, আর দীঘির মধ্যে পাথর দিয়ে একটা ছোট পাহাড় তৈরি করাব, কি বল ?"

আঁচলের খুঁট দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সুকুমারী কহিল, "কিন্তু মাঝের ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটা তা হলে কি হবে ?"

"কেন, ওটা কিনে ফেলব !"

"আর ওরা যদি না বেচে ?"

"না, বেচবে না ? টাকা দেব, বেচবে না কেন ?"

"তা হলে বেশ হয় কিন্তু !"

উদ্যানের পরিসর-বৃদ্ধির প্রস্তাবটি উভয়ের অনুমোদিত হইলে সুশীলকুমার ভজহরিকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। এ প্রস্তাব ভজহরির নিকট নিতান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হইল। তখন একদিন জমিদার বাটীতে সেই জীর্ণ বাটীর অধিকারীর তলব পড়িল।

সুশীলের প্রতিবেশী মহেন্দ্রনাথ মিত্র কমলদহের উপকণ্ঠে এক পাটের কলে কাজ করিত। বেতন মাসে ত্রিশ টাকা। সংসারে স্ত্রী ও সপ্তমবর্ষীয়া একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না; সুতরাং ঐ অল্প আয়ে বিনা আড়ম্বরে এবং বিনা ক্লেশে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

মহেন্দ্রনাথের একটি গুরুতর দোষ ছিল যে, সে কাহারও সহিত

বড় একটা মিশিতে পারিত না। লৌকিকতারও সে বড় একটা ধার ধারিত না, এবং গৃহের বাহিরে সমাজের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। কেমন একটা এলোমেলো খাপছাড়া প্রকৃতি তাহার হৃদয়টাকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, সে তাহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ পাটের কলে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্টটুকু গৃহদুর্গে পত্নী ও কন্যার সহিত লীলাচ্ছলে কাটাইয়া দিত। ইহাতে পল্লীর চক্ষে কোন কুৎসিত নিশাচর পক্ষীর সহিত উপমিত হইলেও সে দুঃখিত হইত না। কূর্ম্মনামক জীবটি যেমন বাহিরে আপনার মাথাটা ক্ষণকালের জন্য নাড়িয়া চাড়িয়া, নিতান্ত সহজ পরিতৃপ্তির সহিত, পৃষ্ঠস্থ কঠিন আবরণের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তেমনই মহেন্দ্রনাথ বাহিরে কর্ম্মস্থলে কিয়ৎক্ষণের জন্য হাত-পা নাড়িয়া, আপনার গৃহাবরণের মধ্যে ফিরিয়া, পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করিত। পাড়ার লোকে এই নিঃসম্পর্ক ও নিঃঝঞ্ঝাট মানুষটির প্রতি যেটুকু স্নেহ বা সহানুভূতি দেখাইত, সেটুকু, শুধু তাহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নচেৎ মহেন্দ্রনাথ কখনও পল্লীকে এমন অবসর দান করে নাই, যাহাতে পল্লীর সহিত তাহার হৃদয়ের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে!

মহেন্দ্রনাথ যখন সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ভজহরির সহিত জমিদারের নব-সজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে পদার্পণ করিল, তখন সুশীলকুমার হার্ম্মোনিয়মে একটা গৎ বাজাইতেছিল। ভজহরি কহিল, "মহেন্দ্র বাবু এসেছেন।"

বেহাগের অন্তরাটা অসমাপ্ত রাখিয়া সুশীল কহিল, "বসুন, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র কহিল, "আমার সঙ্গে বিশেষ কথা? কি, বলুন।"

তখন সুশীল আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, উদ্যানবর্দ্ধনকল্পে মহেন্দ্রনাথের জীর্ণ বাটীটি সে ন্যায্যাধিক মূল্যে ক্রয় করিতে চাহে, এবং বাড়ীটি কতগুলি মুদ্রার বিনিময়ে মহেন্দ্রনাথ হস্তান্তরিত করিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্যও বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে ভুলিল না। বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র কহিল, "কত টাকা চাই? কিন্তু বাড়ী ত আমি বিক্রি করছি না।"

সুশীল কহিল, "আপনার ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী পাচ্ছেন, তবু বেচবেন না?"

মহেন্দ্র করযোড়ে কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, ভিটে আমি ছাড়তে পারবো না!"

ভজহরি কহিল, "এমন পাগলও ত দেখিনি, মশায়, বাবু কিনতে চাচ্ছেন,—ঐ দুটো বাগান এক করে ফেলা হবে কি না, মধ্যে আপনার বাড়ীটা থাকলে কি করে তা হয় বলুন? এই সাদা কথাটা আর বুঝতে পাচ্ছেন না, মহেন্দ্রবাবু?"

মহেন্দ্র কহিল, "ক্ষমা করুন, মশায়, আমি বেশ বুঝেছি, আপনাদের একখানা বাগানের জন্য আপনারা আমাকে ভিটে ছাড়া করতে চান্! এই ত!"

সুশীল কহিল, "তা ছাড়া দেখুন, অন্যত্র আপনি ওর চেয়ে ঢের

ভাল জমি পাবেন। আমার লোকই সে জায়গা খুঁজে দেবে। এটার জন্যে বেশ মোটা রকম টাকা না হয় নিন।"

মহেন্দ্রনাথ সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "আমি এতদূর লক্ষ্মীছাড়া হইনি যে, সামান্য কটা টাকার লোভে পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটে ত্যাগ করব! ও বাড়ীটুকু আমার প্রাণ, টাকার লোভ দেখিয়ে ওটুকু কেড়ে নেবেন না।"

সুশীলকুমার এই 'পাড়াগেঁয়ে' লোকটার 'প্রেজুডিস্' ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া সে ভজহরিকে কহিল, "লোকটা কি একগুঁয়ে! কিন্তু ও জায়গাটা আমার চাই-ই! এত টাকা দিচ্ছি, তবু দেবে না?"

ভজহরি কহিল, "ভারী জোর করে কথাগুলা বলে গেল! তা খোকাবাবু, অত ভালমানুষী করলে ত চলবে না। ওকে ভয় দেখাতে হবে। জমিটা বাগান দুখানার মাঝে পড়ে ভারী অসুবিধা হয়েছে। স্বর্গীয় কর্ত্তা ওটা একবার কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি!"

সুশীল বিরক্তভাবে কহিল, "বললুম, ঢের ভাল জায়গা আছে, পছন্দ করে বাড়ী তৈরি কর। তা শুনবে না!"

ভজহরি কহিল,"নির্ব্বোধ আব কাকে বলে? ঐ ত ভাঙ্গা বাড়ী, ওর দাম কি? তবু যে কটা টাকা পাস্ বাপু, তাই তোর লাভ।"

সুশীল কহিল, "কিন্তু ও জমিটা না হলেই নয়। যখন এখানে বাস করছি, তখন মানুষের মত একটু ভাল করে ত থাকতে হবে। বাগানটা না হলে বাড়ীখানা একটুও মানাচ্ছে না।"

ভজহরি মৃদু কণ্ঠে কহিল, "একটা উপায় আছে—"

"কি ?"

"একান্ত না রাজী হয় ত, আমি একটা খত খাড়া কচ্ছি, সেই খতের টাকার দাবী দিয়ে নালিশ করে দেওয়া যাক্! সমনটা চেপে সহজেই ডিক্রি করে নোব!"

সুশীল প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, না, অধর্ম্ম করাটা ঠিক নয়!"

হাত নাড়িয়া ভজহরি কহিল, "এ আর অধর্ম্ম কি? আপনি ত ওদের বাড়ীর দামের জন্য টাকা ধরে দিচ্ছেন। এতে আর দোষ কি? স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে এ রকম করে কত একগুঁয়ে প্রজাকে জমি থেকে তুলে দিয়েছি। এ রকম না করলে কি জমিদারি কাজ-কর্ম্ম চলে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে ভজহরির কথা সুশীল যতই ভাবিয়া দেখিল, ততই যেন কাজটা ক্রমশঃ তাহার নিকট হাল্কা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাতে আর দোষ কি! পাপই বা কোথা! একটু সরল নীতি লঙ্ঘন করিতে হয় বটে, কিন্তু একটা লোকের অন্ধ কুসংস্কার ছিন্ন করিতে এ রীতি অবলম্বন করা ন্যায়ের চক্ষেও কালিমাবর্জ্জিত! বিশেষ সাধারণ লোকের পক্ষে যে আচরণটা পাপ, রাজা বা জমিদারের পক্ষে তাহা পাপ হইতে পারে না। সেটা 'পলিসি' মাত্র!

একদিন প্রভাতে মহেন্দ্রনাথ শুনিল, যদি সে ভাল কথায় দাম লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া না দেয় ত, তাহার নামে পাওনা টাকা আদায়ের নালিশ রুজু হইবে।

বেচারা স্তম্ভিতভাবে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পত্নী মনোরমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। মনোরমা দন্ত দ্বারা রসনা চাপিয়া কহিল, "ওমা, বল কি! তা কখনও হতে পারে? সত্যিই কি এমন কলি হয়েছে!"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "ওরা যে বড়লোক মনু! ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি আমি এখানে টেঁকতে পারব?"

মনোরমা কহিল, "সে কথা ঠিক। তবে কাজ নেই বাবু, এ সব গোলমালে! বাড়ীখানা না হয় ছেড়েই দাও! দেখ দেখি, কদিন ভেবে ভেবে তোমার রং যেন কালী হয়ে গেছে! সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবলই ত ভাবছ।"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "তাও হবে না মনু, বাড়ী আমি ছাড়তে পারব না। বড়লোকের সখের জন্য আজ বাড়ী ছাড়ব, তার পর কাল আবার সে কি ছাড়তে বলবে, তা কে জানে!"

মনোরমা কহিল, "তোমার যেমন কথা!"

মহেন্দ্র কহিল, "না মনু, তুমি আমাকে ভরসা দাও। তুমি বাড়ী ছাড়বার পরামর্শ দিও না। বল কি? ওরা মিছামিছি নালিশ করে বাড়ী কেড়ে নেবে?"

"অমনি নিলেই হল! মগের মুল্লুক ত নয়! ধর্ম্ম না থাকে, আইনও কি একেবারে নেই!"

"তাও বুঝি! কিন্তু আইন ত বড়লোকের হাতে খেলার পুতুল মাত্র! আর বড়লোক যখন গরিবের উপর অত্যাচার করে, তখন ধর্ম্মও সব সহ্য করেন!"

মহেন্দ্রর চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল।

"ও কি, কাঁদছ তুমি? ছি, কেঁদো না" বলিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া মহেন্দ্রর অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহারও চোখে জল আসিয়াছিল। সে তাহা সম্বরণ করিবার জন্য জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ সুদক্ষ কর্ম্মচারীব সাহায্যে যাহা হইয়া থাকে, এ স্থলেও ঠিক সেইরূপ হইল। নির্দ্দোষ মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুরাণো খতের দাবী দিয়া সিভিল কোর্টে নালিশ রুজু হইল, এবং উকিল মোক্তারের হস্তচালনা ও বক্তৃতার মহিমায়, জমিদার-পক্ষ অনায়াসেই মহেন্দ্রর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইল। মকর্দ্দমা-ভীরু মহেন্দ্রনাথ ছানি বা আপীল-দরখাস্তের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া সুশীলকুমারের নিকট হইতে করযোড়ে এক মাসের জন্য শুধু সময় ভিক্ষা চাহিল। ম্যাকিণ্টস বর্ণের 'প্ল্যান' আসিতেও ত সময় লাগিবে, সুতরাং সুশীলকুমার মহেন্দ্রনাথের এ অশ্রুময় আবেদনটুকু অগ্রাহ্য করিল না।

সে রাত্রে মনোরমার নিকট মহেন্দ্রনাথ কিছুতেই আপনার অন্তর্বেদনা লুকাইতে পারিল না এবং মনোরমাও এমন একটি কথা খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দ্বারা সে স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করে!

দুঃখে, শোকে, তাহার হৃদয়ও আজ একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার নারী-হৃদয়ের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আজ যে নির্ম্মম আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন-গুলি ছিন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছে! আজিকার এ ঘটনা তাহার নিকট নিতান্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে? যাহা একেবারে মিথ্যা, তাহা সত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও, কি করিয়া যে ধর্ম্মের চক্ষে এমনভাবে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে, মনোরমা তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে সময়টুকুর মধ্যে সুশীলকুমার ভজহরি প্রভৃতি মিলিয়া মহেন্দ্রনাথের দুর্দ্দশার কারণ হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়টুকুতে বিধাতাপুরুষ তাঁহার আর একটি গোপন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ক্ষিপ্র হস্ত প্রয়োগ করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে সুশীল-কুমারের ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা বেলা উদ্যানে প্রজাপতির পশ্চাতে ঘুরিবার সময় মহেন্দ্রনাথের বাটীর ভাঙ্গা জানালার সম্মুখে একটি ফুটফুটে মেয়েকে পুতুল খেলিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটী বেলাকে দেখিয়া বিচলিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, ভাই?"

"আমি বেলা।"

"তোমরা বুঝি ঐ বড় বাড়ীতে থাক?"

"হাঁ।"

"ঐটে বুঝি তোমাদের বাগান ?"

"হাঁ।"

"তুমি বাগানে ও কি করছিলে ?"

"প্রজাপতি ধরছিলুম! তার পর তোমাকে দেখতে পেলুম।"

আর একটু নিকটে আসিয়া বেলা কহিল, "তুমি ও কি খেলছ ? আমাকে নিয়ে খেলবে ?"

"খেলব! তুমি আমাদের বাড়ী আসবে ?"

চারি ধারে চাহিয়া বেলা মৃদু স্বরে কহিল, "গেলে মা যদি জানতে পারে—তা হলে ভাই, বকবে কিন্তু! তার চেয়ে তুমি কেন এই বাগানে এস না!"

"তোমার মা যদি বকেন ?"

"মা জানতে পারবে না। মা ত এ ধারে আসে না কখনও।"

"আচ্ছা, খেলব। তুমি আমাকে তোমাদের বাগান থেকে ফুল দেবে ? বেশ ফুলগুলি!"

"দোব। তোমাকে কি বলে ডাকব ?"

"আমার নাম শুভা। বাবা মা আমাকে টুনু বলে ডাকে!"

"তা হলে ভাই টুনু, রোজ বিকেলে আমরা এখানে একসঙ্গে খেলা করব, কেমন ? দুপুর বেলা আমি আসতে পারব না!"

শুভা কহিল, "কিন্তু তোমরা ভাই বড়মানুষ, আমার সঙ্গে খেলতে এলে তোমার মা যদি বকেন!"

"মাকে ত আমি বলব না!"

সেই দিন এই দুইটি বালিকা বিজনে পরস্পরে হৃদয় বিনিময়

করিল। মনোরমা ইহা জানিল। শুভাকে সে কহিল, "ওদের বাড়ীতে যেও না। ওরা বড়মানুষ, যেতে নেই!"

শুভা মাতার কথা রক্ষা করিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও সে কোনদিন বেলাদের বাড়ী যাইতে চাহে নাই। বেলাও সাহস করিত না। সে কিন্তু দুই একবার গোপনে শুভার মার হাতে খাবার খাইয়া গিয়াছে। শুভার মার আদরই বা কত! কিন্তু শুভাদের বাড়ী বেশী যাইতে তাহার বড়-একটা সাহস হইত না! মা যদি জানিতে পারে? তাহা হইলে বাগানে সে আর আসিতে পাইবে না, শুভার সঙ্গে খেলিতে ত পাইবেই না!

এইরূপে যখন দুইটি পরিবারের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় এই বালিকাদুইটি সমস্ত দ্বেষ, হিংসা হইতে পৃথক থাকিয়া পরস্পরকে অতিরিক্তভাবে ভাল-বাসিয়া ফেলিল! এ জগতে শুভ্র শিশু-হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ, সে কি অন্ধ ও গভীর!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বগৃহে বাস করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ সুশীলকুমারের নিকট হইতে এক মাসের জন্য যে সময়টুকু ভিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইতে আর দুই দিনমাত্র বিলম্ব আছে। চলিয়া যাইবে বলিয়া বেলার ছেলের সহিত আপনার কন্যাটীর বিবাহ দিবার জন্য শুভা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সে দিন দ্বিপ্রহরে সুশীল ও সুকুমারী যখন সংস্কৃত গৃহপ্রাচীরে নূতন ছবি খাটাইতে ব্যস্ত ছিল, সেই অবসরটুকুর অন্তরালে

বেলা একটি আঙুরের বাক্স লইয়া মহেন্দ্রর জীর্ণ বাটীর জানালার ধারে আসিয়া ডাকিল, "টুনু !" টুনু বাগানে আসিল।

"এই দেখ ভাই, গায় হলুদ এনেছি", বলিয়া বেলা আঙুরের বাক্স খুলিয়া জরীর কাপড়, ওড়না, পুঁথির মালা প্রভৃতি বাহির করিল।

শুভা কহিল, "আমি ভাই মাকে সব বলেছিলুম। মা বেশ পুঁথির গয়না তৈরি করতে পারে। খান পাঁচ-ছয় পুঁথির গয়না আমি দোব। আর জরীর কাপড় কোথায় পাব বল, আমার মা ত আর জরীর কাপড় পরে না।" বলিয়া একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া শুভা পুঁথির গহনা বাহির করিল।

বেলা কহিল, "বাঃ! দিব্যি ত ভাই! এত দিচ্ছ, আবার কি দেবে? তা এগুলি আমি এখন নিয়ে যাই! ভাল করে দেখিগে।—পড়তে পড়তে পালিয়ে এসেছি আমি, বাবাতে মাতে ছবি টাঙ্গাচ্ছে! এখনই যদি আবার খোঁজ পড়ে! সন্ধ্যার সময় আমি আসব! তুমি ভাই তোমার মাকে 'তত্ত্ব' দেখাওগে।" বেলা চলিয়া আসিল।

ছবি খাটানো তখন শেষ হইয়াছিল। সুশীল ঘরে ছিল না। ত্রস্তভাবে উপরে উঠিতেই বেলা বারাণ্ডায় একেবারে সুকুমারীর সম্মুখে পড়িল! অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়া তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে কাগজের মোড়কে খস্ খস্ শব্দ হইল এবং সুকুমারীরও তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে কালবিলম্ব ঘটিল না! সুকুমারী কহিল, "ও কি রে, তোর কাপড়ের মধ্যে?"

সর্ব্বনাশ! বেলার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল! সুকুমারী কহিল, "কি, ও? বুকের মধ্যে কি লুকোচ্ছিস?"

"না মা" বলিয়া সভয়ে করুণ দৃষ্টিতে বেলা মাতার প্রতি চাহিল। মাতা কহিল, "দেখি!" বেলা তখন আর তাহা গোপন রাখা সঙ্গত মনে করিল না।

সুকুমারী কহিল, "এ সব কোথা থেকে পেলি?"

ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের সুরে বেলা কহিল, "উঁ—"

সুকুমারী কহিল, "বল্, না হলে এখনই সব ফেলে দোব!"

বেলার মনে রূঢ় আঘাত লাগিল। ভয়ে আত্মদোষ-ক্ষালনের উদ্দেশ্যে সে কহিল, "ওদের বাড়ীর মেয়ে যে দিলে!"

সুকুমারী কহিল, "কাদের বাড়ীর মেয়ে?"

"ঐ যে বাগানের পাশে ঐ ভাঙ্গা বাড়ী যাদের—"

"তার সঙ্গে তোর দেখা হল, কি করে?"

"বাগানে গেছলুম যে, আমি।"

"বটে, এই সব করে বেড়াচ্ছ এখানে! ওদের মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব হল কি করে?"

বেলা কম্পিত স্বরে কহিল, "ও যে ভাব করলে!"

"বটে, ও ভাব করলে লাফিয়ে এসে, না? দাঁড়া, এঁকে আজ সব বলে দিচ্ছি, আমি।"

বেলা ব্যস্তভাবে কহিল, "না মা, বাবাকে বলো না। বাবা তা হলে মারবে! টুনু খুব ভাল মেয়ে মা, সে আমাকে খুব ভালবাসে।" বেলার বড় কষ্ট হইতেছিল। শুভার মা তাহাকে

এত ভালবাসে, আর তাহার মার কি শুভাকে এতটুকু ভালবাসিতে নাই!

সুকুমারী কহিল, "এ সব কথা বলিস নে কেন, আমাকে?"

"তুমি যদি বক! টুনুর মা বলে, আমরা বড়মানুষ, তারা গরিব! আমাদের সঙ্গে তাদের মিশতে নেই! কিন্তু টুনু মা, বড়মানুষের চেয়েও ভাল, কলকেতার স্কুলের কোন মেয়ে আমাকে এত ভালবাসত না!"

ক্রমে বেলা পুতুলের বিবাহপ্রসঙ্গ মাতার গোচর করিল। সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা দেখি, তোর বেয়ান কি গয়না দিয়েছে, তার মেয়েকে?"

আঃ! বেলা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি মাতার সম্মুখে কাগজের মোড়ক খুলিয়া পুঁথির গহনা বাহির করিতে বসিল। সুকুমারী কহিল, "তুই কি দিলি?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বীণা কহিল, "আমি আর কি দোব? সেই জরীর কাপড়টুকু দিয়েছি, আর ওড়না দিয়েছি।"

"আচ্ছা, তুইও ভাল জিনিষ দিস্। এখন এই দুপুর রোদে, ছুটোছুটি না করে, বই নিয়ে আর একটু পড়্ দেখি!"

বেলা ছুটিয়া কক্ষান্তরে পুস্তক আনিতে গেল। যে কাগজের মোড়কটায় শুভার প্রদত্ত পুঁথির গহনা জড়ানো ছিল, সুকুমারী সেটা তুলিয়া পড়িতে লাগিল। সেটা একখানি পত্রের ছিন্নাংশ। পত্রখানি স্ত্রীলোকের লেখা। যতটুকু পাঠ করা যায়, এইরূপ :—

"—হলুম। কি আর করবে, সবই অদৃষ্ট! না হলে সুকুমারী

এমন হবে, কে জানত, বল! যখন স্কুলে পড়তে, তখন তার সঙ্গে 'মণিমালা' পাতিয়েছিলে না? তোমাদের দু জনে কত ভাব ছিল। আজ না হয় কপাল-দুঃখে তোমার স্বামী গরীব, আর অদৃষ্টগুণে সুকুমারীর জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! তাই বলে ছেলেবেলা-কার ভালবাসা কি ভাই, এমনি করেই ভোলা যায়? বড়মানুষের বৌ হয়ে সুকুমারী আজ 'মণিমালা' বলে তোমায় চিন্‌তে না পারুক, কিন্তু তাই বলে এমন করে কি পিছনে লেগে ভিটেছাড়া করতে হয়! আহা, বেচারা মহেন্দ্রবাবু! তাঁর বোধ হয় খুবই প্রাণে লেগেছে—তা আর লাগবে না, ভাই? নিঃঝঞ্ঝাট মানুষ! কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এ রকম করে লাগাটা কি ভাল! যাই হোক, ইনি বল্লেন, তোমরা না হয় দুদিন এখানে বেড়িয়ে যাও, তবু মনটা যদি একটু শোধরায়! আমরা ত ভাই জমিদার মানুষ নই, আর আমার সঙ্গে কখনও 'মণিমালা' পাতাও নি—তার পর বরং—"

অবশিষ্ট অংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

পত্রাংশটুকু পাঠ করিয়া সুকুমারীর সুগৌর কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে একটা পুরাতন দৃশ্য তাহার সমস্ত নবীনতা লইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই স্কুলঘর, সেই বাল্যসখীগণের অজস্র ক্রীড়াকৌতুক, সেই তাহার পিতার বাগানে মনোরমা ফুল তুলিতে আসিত, মনোরমার সহিত 'মণিমালা' পাতান, সেই একদিন সুকুমারীর নূতন সোনার ইয়ারিং হারাইয়া গিয়াছিল, মনোরমা প্রাণপণ-অনুসন্ধানে তাহা বাহির

করিয়া মাতার তিরস্কার হইতে তাহাকে রক্ষা করে! মনোরমার ছোট-বড় সহস্র প্রীতির নিদর্শন একে একে তাহার নয়নসমক্ষে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর একদিন সুশীলকুমারের সহিত মহাসমারোহে তাহার বিবাহ হইল! বিবাহ-রাত্রে মনোরমার সে কি আনন্দ! বিবাহের পর সে আর পিত্রালয়ে যাইতে পাইত না। সুতরাং নানা কারণে সে মনোরমার কোন সন্ধান লইতে পারে নাই! আর আজ সেই বাল্য-সখী, সেই শৈশব সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী 'মণিমালা' এত নিকটে! সেই 'মণিমালা' তাহারই এক দরিদ্র প্রজার স্ত্রী! এবং নিষ্ঠুর বিলাসের জন্য তাহাকে ও তাহার স্বামী-কন্যাকে সে-ই আজ গৃহত্যাগী করাইয়া পথে বসাইতেছে! কি এ নিষ্ঠুরতা!

চারিধারের সমস্ত আলো সুকুমারীর চক্ষে কালো হইয়া গেল। মুক্ত কুন্তল-গুচ্ছ সংযত করিয়া বাঁধিয়া তখনই সুকুমারী খিড়কীর বাগানে নামিয়া গেল, এবং একেবারে মহেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা জানালার ধারে উপস্থিত হইল।

ঘরের ভিতর মনোরমা তখন কন্যাকে বলিতেছিল, "কাঁদছিস্ কেন, টুনু? তোর পুতুলের বিয়ে হবে না?"

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "মণিমালা, ও মণিমালা!"

সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত আকাশটা যদি ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও বুঝি মনোরমা অধিকতর স্তম্ভিত হইত না! সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

সুকুমারী কহিল, "তোমাদের বাড়ী যাব।" দ্বার খুলিয়া মনোরমা বাগানে আসিল। গাঢ় আলিঙ্গনে সুকুমারী তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

সুকুমারী কহিল, "এই রকম করে কি শাস্তি দিতে হয়? একদিনও কি পরিচয় দিতে নেই?

মনোরমা কহিল, "পরিচয় দোব কি? যেদিন জানলুম, তুমি এসেছ, তার তিন চার দিন পরেই বাড়ী নেবার কথা হল।"

"তার পরই না হয় পরিচয় দিতে!"

"ভয়ে দিইনি—যদি—"

"বুঝেছি, তুমি মনে করেছিলে, যদি চিনতে না পারি! তা আমি কি করে জানব বল? আজ বেলা তোমার মেয়ের কাছ থেকে পুঁথির গয়না নিয়ে গেছে, একটা কাগজে সেগুলো জড়ানো ছিল। সেটা একখানা ছেঁড়া চিঠি! সেইটে পড়েই ত সমস্ত জানতে পারলুম! ভাগ্যে চিঠিখানা পেয়েছিলুম! না হলে কি হচ্ছিল, বল দেখি!"

তাহার পর দুই সখীতে মিলিয়া নানা কথাবার্ত্তা হইল। সেই ছাড়াছাড়ির পর হইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস! হৃদয়ের মধ্যে যে প্রীতির প্রস্রবণ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আজ বহুদিন পরে আবার তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল!

শুভা যখন শুনিল, তাহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে না, বেলার সহিত এবার হইতে বেশ নিশ্চিন্ত, স্বচ্ছন্দ চিত্তে সে খেলিতে পাইবে, তখন বেলার মাতার সম্বন্ধে শুভার হৃদয়ে বেলা

যে এতটা অকারণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল,তজ্জন্য তাহার উপর একটু অভিমানও হইল।

সুকুমারী শুভাকে বুকে টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "ভাগ্যে তোমাদের পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলে টুনু, না হলে এমন একটা ভুল করছিলুম, এ জীবনে যার আর কখনও সংশোধন হত না।"

বিদায় লইবার সময় সুকুমারী সকলকে পরদিন আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল; টুনুকে কহিল, "তোমার মেয়ের বৌভাতে কাল যেয়ো, টুনু!"

পাষাণ

অনেক দিনের কথা। তখন সবেমাত্র বি, এ পাশ করিয়া চাকদালির পল্লী-বাস-ভবনে আসিয়া বসিয়াছি। পিতামাতার স্নেহ হইতে বহু পূর্ব্বেই বঞ্চিত হইয়াছিলাম, গৃহেও তেমন নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না! সাহিত্যের নেশা তীব্রভাবেই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত জীবনটা সাহিত্যের মধ্যেই নিমগ্ন রাখিব, এমন সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলাম।

বিবাহ? স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল। আমার হৃদয়ে যে সকল সুমহান সাধ-আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলি কাহার হস্তস্পর্শে বিকাশ লাভ করিবে? সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিয়া, একটা অশিক্ষিতা বালিকাকে 'হৃদয় লক্ষ্মী' করিয়া জীবনের পথে তাহারই উপর প্রেমের নির্ভর স্থাপন করিব, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার আর কি আছে!

বি, এ পাশ করিয়া পাদপ-হীন দেশে এরণ্ড-দ্রুম হইয়া বসিলে, আমার পল্লীবন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। তাহারা প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিয়া সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং যে শিশির বোস তাহাদের

সহিত গাছে উঠিয়া আম পাড়িত, ও বাচখেলায় সবিশেষ তৎপর ছিল, সেই শিশির বোসই যে চারি বৎসর কাল দেশান্তরে থাকিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিবে, ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারিত না!

তাহাদিগের একজনকে আমি একদিন ডাকিলাম, "বিপিন!" বিপিন নিকটে আসিল। তাহার প্লীহা তখনও নির্দ্দোষভাবে সারে নাই। আমি কহিলাম, "দেশটাকে আমি সভ্য করতে চাই।" বিপিন আর একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "ছেলেবেলা থেকে আমারও সেই ইচ্ছা! ঐ জন্যই ত এদিকে কিছু হল না!"

আমি কহিলাম, "একটা খবরের কাগজ বার করব, তুমি তার সমালোচক হবে?" জানিতাম, কিছুতে যাহার বুদ্ধি খেলে না, সমালোচনায় ওস্তাদ হইবার পক্ষে সে-ই ঠিক যোগ্য ব্যক্তি! বিপিন সহর্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি কহিলাম, "একটা কাগজও ভারী দরকার হয়ে পড়েছে!"

আমার ও আমার নিষ্কর্ম্মা সহচরগণের সংস্কারের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের ছাত্রগণের মধ্যেও রীতিমত বিপ্লব বাধিয়া গেল! সময়ে-অসময়ে তাহারা স্কুল-পলায়ন বিদ্যায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক গোপনে লাইব্রেরীতে আসিয়া বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনীর শ্রাদ্ধ করিত, কেহ বা হস্তপদাদি সঞ্চালনে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইত। বলা বাহুল্য এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে কয়েকটি অভিভাবকের নিকট হইতে আমরা ঈষৎ তিরস্কারও

লাভ করিলাম, কিন্তু তখন আমাদিগের উত্তেজনায় বান ডাকিয়াছিল! সে গতি রোধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে! বরং কয়েকটা বাধা পাইয়া তাহা আরও প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিল।

২

রাখাল দত্ত গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলের থার্ড মাষ্টার—অত্যন্ত সেকেলে ধরণের লোক। গায়ে পিরাণ ও বোম্বাই চাদর, পরিধানে মোটা থান, রং কালো, লোকটা আমার চক্ষুশূল ছিল। তাহার বিশেষ কারণ, লোকটা আমাকে বড়-একটা আমল দিত না।

বাল্যকাল হইতেই আমার বক্তৃতা দিবার সখ! স্কুলের ছাত্র সভায় যখন আকবর ও আরংজেবের রাজত্বের আলোচনা করিয়া দিব্য দৃপ্তভাবে প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, রাখাল মাষ্টার তখন সমালোচনা-প্রসঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে বলিয়া উঠিত, "প্রবন্ধটা আগাগোড়া ইংরাজী মাসিক হইতে উদ্ধৃত!" হইতে পারে, ইংরাজী মাসিকের প্রবন্ধ লেখকের সহিত আমার মতের মিল আছে, কিন্তু তাই বলিয়া এতগুলা মুগ্ধ ভক্তের সম্মুখে আমার প্রতি চৌর্য্যবৃত্তির আরোপ করাটা তাহার পক্ষে গর্হিত নহে কি? তাহার উপর আবার জ্বালা, অনুবাদ-পত্রে আমার ইংরাজীর ভুল কাটিয়া সে আমাকে ক্লাশে বড়ই অপদস্থ করিত। আমি যে উহারই মধ্যে একটা 'কেষ্ট-বিষ্টু' হইতে চাহি, ইহা যেন রাখাল মাষ্টারের নিকট অসহ্য! সেই অবধি রাখাল মাষ্টারের নামে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিত! সুবিধা পাইলেই তাহার প্রতিকূল আচরণ করিতাম।

কিন্তু সে তখন স্কুলের মাষ্টার আর আমি তাহার ছাত্র! মনে পড়ে, এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িবার জন্য যে দিন কলিকাতায় আসি, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে একটা প্রকাণ্ড ভোজে স্কুলের সমস্ত মাষ্টার ও দ্বারবান প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ ও শুধু রাখাল মাষ্টারকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার এই সকল অন্যায় অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লই!

বি, এ পাশ করিয়া দেশে ফিরিলে যখন রাখাল মাষ্টারের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম, "মাষ্টার মশায় যে! আপনার আশীর্ব্বাদে এ মূর্খটাও বি, এ পাশ করেছে।"

"এ সংবাদে বড় সুখী হয়েছি" বলিয়া রাখাল মাষ্টার মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। যদু কহিল, "দেখলে ব্যাপারখানা, রাখাল মাষ্টারের হিংসেটা?"

অবিনাশ কহিল, "সে ত আগাগোড়াই দেখে আসছি!"

আমি ডাকিলাম, "শিবু!"

"কেন হে?"

"লোকটার তেজ ভাঙ্গা যায় কি করে, বল দেখি?"

শিবু দলের সর্দ্দার! বাল্যকাল হইতেই দুষ্টামিতে বুদ্ধি খেলাইতে সে বেশ সক্ষম। শিবুর সহিত পরামর্শান্তে এক মুখ হাসিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম,—"ঘটকের মুখে শুনিলাম, মহাশয়ের নাকি একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। কন্যাটি গৌরবর্ণা নহে, তবে নাকি

বিশেষ সুলক্ষণা। আমাদের বংশে সুশ্রী অপেক্ষা সুলক্ষণা কন্যারই আদর অধিক! যাহা হউক, মহাশয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনে আমি বিশেষ উৎসুক। বন্দ্যহাটির জমিদারপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হইবে না। আগামী রবিবার আমরা কন্যা দেখিয়া আসিব। সাক্ষাতে সকল কথা হইবে। ইতি

বিনীত

শ্রীহরিহর ঘোষ।”

এখন রাখাল মাষ্টারের কন্যাটির কথা বলিব। কন্যাটি গৌরবর্ণা ত নহেই এবং আমরা যাহাকে ‘শ্যামবর্ণা’ নামে অভিহিত করি, তাহাও নহে। শিবু বলিত, “আবলুষ-কাষ্ঠবর্ণা!” রাখাল মাষ্টার এহেন কন্যার নাম নিরুপমা রাখিয়াছে কি হিসাবে, তাহা লইয়া আমাদের ক্লবে ঘোরতর আন্দোলন হইত। রাখাল মাষ্টারের প্রতি আমাদিগের বিদ্বেষের ইহাও একটি কারণ ছিল। অমন কবিত্ব-মণ্ডিত নামটার দুরবস্থা করে, এতদূর তাহার স্পর্দ্ধা! যাহা হউক কন্যাটির ত কিছুতে বিবাহ হইতেছিল না। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছিল, কিন্তু কন্যা দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিত। এই শোচনীয় ব্যাপারটি আমাদিগের বিদ্রূপের উৎস খুলিয়া দিত! আমরা এমন আশ্চর্য্য হৃদয়-হীন ছিলাম!

শিবু রাখাল মাষ্টারের প্রতিবেশী। অন্তরে যাহাই হউক না কেন বাহিরে কিন্তু সে যে ভাব প্রকাশ করিত, তাহাতে মনে হইত, সে যেন রাখাল মাষ্টারের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী! সে আবার ছিল,

ঘরের বিভীষণ! রাখাল মাষ্টারের ঘরের প্রত্যেক কথাটি সে আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনিত, এবং আমি যখন তাহার কৌতুককর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তখন আমার দলস্থ সহচরবর্গ হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত ফাটিয়া পড়িত। শিবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, রাখাল মাষ্টার এবং তাহার বন্ধুবর্গ নিরুপমার রূপহীনতার উল্লেখ-কালে সে যে বিশেষ সুলক্ষণা, এই সরল সত্যটি পুনঃ পুনঃ সর্ব্বসমক্ষে প্রচারিত করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৩

সোমবার প্রাতঃকালে শিবু আসিয়া এক মুখ হাসিয়া কহিল, "বাজিমাৎ হে!"

আমি কহিলাম. "বল, বল, ব্যাপারখানা।"

শিবু কহিল, "কাল ত রাখাল মাষ্টার বন্দ্যহাটির জমিদারদের জন্যে চর্ব্বচোষ্য সব তৈরী করিয়েছিল। বেচারী আমাকে বলে, 'ওহে, আমার ত এ বিশ্বাস হয় না।' আমি বললুম, 'সন্দেহের ত কারণ দেখছি না'! তারপর আমার কথায় তাদের অভ্যর্থনার জন্য রীতিমত আয়োজন করে রাত আটটা অবধি বসে থেকে হতাশ হয়ে শেষে আমাদের ডেকে সব খাওয়ায় দাওয়ায়।"

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "আর তোমার নিরুপমা?"

"ওঃ—সে সাজানোর চোটটা যদি দেখতে! আমাদের বাড়ী থেকে পার্সী শাড়ী পরিয়ে গয়না দিয়ে সাজিয়ে, তোমার গে, 'কুন্তলীন' দিয়ে চুল বেঁধে—আরে বাস্, সে যেন একেবারে লেডি

কালিন্দী—ইস্তক হাতে একখানা সিল্কের রুমাল অবধি! আহা, নিখুঁত সুন্দরী নিরুপমার শোভা যা হয়েছিল!" আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম!

ইহার পর শিবু কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রাখাল মাষ্টার একদিন ক্লবে আসিয়া আমার একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গেল। ইহাতে আমার ক্রোধ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, আর পাড়াগেঁয়ে স্কুলের একটা অর্দ্ধশিক্ষিত মাষ্টারের কিনা এতদূর ধৃষ্টতা যে, আমাকে এইরূপে সভার মধ্যে লাঞ্ছিত করে!

শিবু প্রভৃতি সহচরবৃন্দের সহিত গোপনে একটা পরামর্শ হইয়া গেল।

শিবু একদিন কহিল, "ওহে শিশির—"

আমি কহিলাম, "কেন?"

শিবু কহিল, "রাখাল মাষ্টারের আর কোন গুণ থাক বা না থাক, লোকটা বড় সরল! যা বল, তা বিশ্বাস করে, বিশেষ যেখানে বক্তা আমি!"

আমি কহিলাম, "আহা, ব্যাপারখানা খুলেই বল না!"

শিবু কহিল, "মেয়ের বিয়ের জন্য বেচারী ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই আমাকে সে কথা বলে। কালও অভ্যাসমত ঐ কথা বলছিল। অমি মাথাটা একটু চুলকে বললুম,—'মাষ্টার মশায়, একটা কথা আছে—কিন্তু শুনলে সহজে বিশ্বাস করবেন না।' মাষ্টার বললে, 'কি হে?' আমি বললুম, 'শিশিরের

বিয়ে হচ্ছে না কেন, জানেন? ও একটু বড় মেয়ে চায়। আর মেয়ের রঙ যেমনই হোক না কেন, লেখাপড়াটা তার বেশ জানা থাকলেই হল। তা ওকে একবার বলে দেখলে হয় না?' রাখাল মাষ্টার ত খানিক চুপ করে রইল, কোন কথা বললে না। আমি একটা ঢোক গিলে বললুম, 'তা হলে কি বলব, তাকে?' মাষ্টার বললে, 'তুমি পাগল হয়েছ হে!' আমি বললুম, 'একবার কথাটা পাড়তে আর দোষ কি? মেয়ে দেখে যাবে বৈ ত না।' রাখাল মাষ্টার বললে,—'দেখে যাক—ক্ষতি কি! তোমার সঙ্গে ত ভাব আছে, বলে দেখ না।' আমি বললুম, 'আচ্ছা, আমি ভার নেব, দেখিই না।' এই রকম মাষ্টারকে বলে এসেছি! এখন একদিন চল!"

আমি সহাস্যে কহিলাম, "তুমি একটি রত্ন হয়ে পড়লে যে!" পরে একদিন অপরাহ্নে রাখাল মাষ্টারের গৃহে অতিথি হইয়া বিবিধ চর্ব্বচোষ্য আপনাকে পরিতৃপ্ত করিলাম। নিরুপমার রূপের উপমা নাই, সত্য! আমি ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিয়া কহিলাম, "এ বিষয়ে আমার মতামত শিবুর কাছে শুনতে পাবেন!"

বাড়ী ফিরিয়া শিবুর সহিত পরামর্শ আঁটিলাম। হায়, তখনও যদি আমার নিষ্ঠুর কৌতুকের শোচনীয় পরিণামের বিষয় ইঙ্গিতে কিছু বুঝিতাম! কিন্তু তখন দানবী প্রবৃত্তি আমার সকল জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল!

শিবু যাইয়া রাখাল মাষ্টারকে আমার যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল, তাহার ফলে রাখাল মাষ্টারের নিরানন্দ পুরী আনন্দের কলহাস্যে

মুখরিত হইয়া উঠিল! বিবাহের দিনস্থির হইল,দোসরা মাঘ। হা ভগবান, তখনও যদি এ পাপিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত করিতে!

৪

পয়লা মাঘ শুনিলাম, রাখাল মাষ্টারের গৃহ আত্মীয়-কুটুম্বাদিতে পূর্ণ হইয়াছে। আমার সুখ্যাতি আর গ্রামে ধরে না! সকলেই বিস্মিত, এ কি অমানুষিক ব্যাপার! চুপি চুপি হরিদ্রা পাঠানোর ভার শিবুই গ্রহণ করিয়াছিল। দোসরা মাঘ, বাড়ীতে একটা ভোজের আয়োজন করিলাম। গীত-বাদ্যে হাস্য-কৌতুকে আমার গৃহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় শিবু আমার প্রতি একটা ইঙ্গিত করিল। আমি একটু হাসিলাম! অবিনাশ কহিল, "ওহে, পোলাওয়ের গন্ধে গান ত আর ভাল লাগে না।"

আমি কহিলাম, "না, না, তা হচ্ছে না। আমি হার্ম্মোনিয়মে সুর দিচ্ছি, তুমি একটা গান ধর!"

তখন কলিকাতার থিয়েটারে আবুহোসেনের অত্যন্ত পশার। অবিনাশ গান ধরিল,

"আমার সকল প্রাণে ব্যথা লেগেছে,
বুঝেছি, শিখেছি ঠেকে,
আমার সোণার স্বপন ভেঙ্গে গেছে।"

এমন সময় কে ডাকিল, "শিশির"!

আমি নিবিষ্ট চিত্তে হার্ম্মোনিয়মে সুর দিতেছিলাম। অবিনাশ গান থামাইয়া দিল। এই আকস্মিক রসভঙ্গে বিরক্ত হইয়া চাহিয়া দেখি, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রাখাল মাষ্টার ডাকিতেছে, "শিবু!"

বেচারার মুখখানি বিবর্ণ। আমি কহিলাম, "কি মশায়, আপনি যে এখানে?"

রাখাল মাষ্টার একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "আজ ত দোসরা মাঘ।"

আমি কহিলাম, "তা ঠিক বলতে পারি না। তবে পনেরোই জানুয়ারী বটে!"

রাখাল মাষ্টার শুষ্ক মুখে কহিল, "তুমি আমার মেয়েকে বিবাহ করবে। আজ তার দিনস্থির ছিল।" কক্ষমধ্যে একটা হাস্যের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "আপনার মেয়েকে বিবাহ? কৈ এমন কথা ত আপনার সঙ্গে হয় নি কোন দিন!"

রাখাল মাষ্টার কহিল, "কথা হয় নি! সে কি? শিবু যে— কৈ শিবু, বল না, বাবা!"

কোথায় শিবু? শিবু তখন পলাইয়াছে!

আমি কহিলাম, "শিবু যা বলেছে, তার জন্য ত আমি দায়ী হতে পারি না! আমার বিষয় আমি এই বলতে পারি যে, আমি মশায়কে কখনও এমন কথা বলিনি।"

রাখাল মাষ্টার নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি অন্তরের মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করিয়া হার্মোনিয়মে সুর দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল মাষ্টারের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। অতিশয় হতাশভাবে সে কহিল, "বিবাহ করবে না, তবে?"

আমি কহিলাম, "ক্ষমা করবেন! এখন অত্যন্ত সময়াভাব।"

রাখাল মাষ্টার নিকটে আসিয়া আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিল, করুণ স্বরে কহিল, "শিশির, আমি বড় বিপদে পড়েছি আমার জাত রাখ, মান রাখ, না হলে আমি মারা যাই!"

আমি কহিলাম, "কি করব, বলুন—আমার কোন হাত নেই।"

রাখাল মাষ্টার আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন কি করি? আমার উপায়?"

আমি কহিলাম, "এখন ত সবে এই সন্ধ্যা—দেখুন না খুঁজে একটু, পাত্রের অভাব কি দেশে?" এই কথা বলিয়া আমি রাখাল মাষ্টারের প্রতি একটা কটাক্ষপাত করিলাম, বুঝিলাম, তাহার চোখদুটি জলভারাক্রান্ত। আমি হার্মোনিয়মে স্থর দিতে লাগিলাম। মাষ্টার কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া "হা ভগবান" বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল ও পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল! আহা, সেই কাতর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস!

৫

পরদিন প্রাতঃকালে চা-পান করিয়া খপরের কাগজের মোড়কটা ছিঁড়িতেছি, এমন সময় শিবু আসিয়া উপস্থিত। শিবুর মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শিবু কহিল, "ওহে, ভারী একটা ট্র্যাজিডি হয়ে গেছে।"

"কি রকম?"

"রাখাল মাষ্টারের মেয়েটি মারা গেছে।"

আমার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "সে কি? কখন?"

শিবু কহিল, "কাল রাখাল মাষ্টার তোমার কাছে এসে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যায়, তখন বাড়ীতে একটা বিষম কান্নাহাটি পড়ে গেল। বিস্তর আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল, তারা অনেক প্রবোধ দেওয়ায় সব থামে। মাষ্টারের মুখ একবারে সাদা হয়ে গেছে। অত লোকজনের কাছে মাথা হেঁট!"

অজ্ঞাতে আমার হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল। আমি কহিলাম, "তার পর?"

"তার পর সকলে শুতে যায়। সকালে উঠে নিরুপমাকে আর কেউ দেখতে পায় নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চিঠি পাওয়া গেছে। আমি সেটা এনেছি—এই যে!"

"কৈ, দাও, দাও।"

পত্রখানা পড়িলাম। চিঠিতে অবিকল এইরূপ লেখা ছিল,—

"বাবা, আমার জন্যই তোমাদের এত কষ্ট, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা! •আমি মলেই সব জ্বালা জুড়োয়, না বাবা? আজ আমি চিরবিদায় নিলুম। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। ' অনেক পুণ্যে এমন বাপ মা পেয়েছিলুম, কিন্তু একদিন ও তোমাদের সুখী করতে পারলুম না, এ দুঃখ মলেও যাবে না।

তোমাদের আদরের

নিরু।"

আমার বক্ষে কে যেন একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল! আমি সহসা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

শিবু আমার হাত ধরিল, কহিল, "কোথা যাও?"

"নিরুকে খুঁজতে।"

শিবু ব্যথিত চিত্তে কহিল, "বৃথা চেষ্টা ভাই, ভোর থেকে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বামোড়ের বিলে তার দেহ পাওয়া গেছে।"

বেশ মনে পড়ে, আমি মেঝের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম! আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। কি পাষাণ আমি! আমার ন্যায় অপরাধীর জন্য কি ফাঁসিকাঠ নাই? এখন কি করিব? কি বলিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? আর রাখাল মাষ্টার! নিরীহ দুঃখী রাখাল মাষ্টার! তাহার সেই সজল কাতর দৃষ্টি—সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস! উঃ! আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। শিবুকে কহিলাম, "চলে যাও।" শিবু চলিয়া গেল।

যদু আসিয়া কহিল, "কাল খাওয়াটা বড় বেশী হয়েছিল হে—রাত্রে একদম ঘুম হয়নি। এস না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

কথাগুলা স্পষ্ট আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি উত্তর দিলাম না। যদু কহিল, "তোমার কি অসুখ করেছে না কি?"

আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি কহিলাম, "যাও, বিরক্ত করো না।" আমার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছিল। আমি নিজেই তাহা বুঝিয়া ছিলাম। যদু বোধ হয় তাহারই ভয়ে দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিরেকে চলিয়া গেল।

সেই দিনই দেশত্যাগ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে রাখাল মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা

করিয়াছি। তিনি এ হত্যাকারীকে আশীর্ব্বাদের সহিত বিদায় দিয়াছেন।

সে আজ কত দিনের কথা! আজ কোথায় রাখাল মাষ্টার, জানি না। বিশেষ চেষ্টাতেও তাঁহার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু মনের কণ্টক এখনও তেমনই তীক্ষ্ণ ফুটিয়া আছে! আমাকে আবার লোকে কন্যাদান করিতে চায়? কারাগৃহের কোন্ অপরাধী আমার চেয়ে হীন? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে ভগবান, আমার তাপিত চিত্তে শান্তি দান কর, আমাকে মার্জ্জনা কর!

ডায়েরির ক' পাতা

১৭ই ফাল্গুন।

বিয়ের জন্য সকলে ভারী অস্থির করে তুলেছে। এত দিন ত পড়া-শুনা বলে সকলকে থামিয়ে রাখা গেছল, এখন মা ধরে বসেছেন,—'এম্-এ পাশ করলি, এখনও তোর আপত্তি?' এ কথা মন্দ নয়! এম্-এ পাশ করেছি, অতএব আমাকে বিবাহ করতেই হবে! সুন্দর যুক্তি!

বিয়ে করব কি? বাঙ্গালীর মেয়েগুলোকে আমি ত বিবাহের যোগ্যই মনে করি না। নেহাৎ অপদার্থ! নোলক-পরা একটা বার বছরের মেয়ে—দুটো কথা কইতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়, তাঁকে বিয়ে করতে হবে! কেন? না, তিনি আমার ভাত খাবার সময় নুন-জল দিয়ে আসন পেতে দেবেন, দুটো পান সেজে দেবেন, আর তিন হাত ঘোমটা দিয়ে ঝম্ ঝম্ করে মল বাজিয়ে চলে বেড়াবেন! আল্সের আড়াল থেকে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখা, বাজনা-বাদ্য করে বর যাচ্ছে দেখা, আর বাপের বাড়ী যাবার জন্য গাড়ীতে চড়াই যার শ্রেষ্ঠতম আনন্দ, সেই রকম একটা হৃদয়-হীন ছোট মেয়েকে বিয়ে করব আমি,—যে 'ফিলজফিতে'

এম্-এ পাশ করেছে! আমার উন্নত হৃদয়ের সাধ-আশার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে চলবে কোথা থেকে! তার তেমন শিক্ষাই বা কোথা!

মেয়েদের বিয়ের বয়সটা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে হয়। অন্ততঃ ১৫।১৬ বছর বয়স না হলে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। না হলে কি করে তারা শিক্ষা পায়, আর কি করেই বা তাদের শিক্ষিত স্বামীদের সঙ্গে তারা মানিয়ে-বনিয়ে চলে, এ আমার ধারণাই হয় না! যাক্, এ সব বড় কথা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মাথা ঘামান্! তবে আমার নিজের সম্বন্ধে এইটুকু স্থির করে রেখেছি—নিজে না দেখে বিয়ে কচ্ছিনা।

মাকে ত সাফ বলে দিয়েছি, "তোমরা কোথা থেকে এক কালিন্দীর তিলফুল নাক ও পটলচেরা চোখ দেখবে, কি কোথায় এক গো-বেচারী 'পিরতিমে' দেখবে, আর আমাকে যে অমনি টোপর মাথায় দিয়ে সং সেজে বিয়ে করে আসতে হবে, তা হচ্ছে না, নিজে না দেখে আমি বিয়ে কচ্ছি না।' মা ত হেসে চলে গেলেন, বললেন, 'তা বেশ বাপু, আমাদেরি চোখ নেই, তোর আছে ত,—আমাদের সঙ্গে তুইও না হয় দেখিস!'

বাঁচা গেল! এখন দু দিন ত হাঁফ ছাড়ি, ওঁরা ঘটকের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন্!

২০শে ফাল্গুন।

আজ দুপুর বেলা বসে একটা কবিতা লিখে ফেললুম। আমাদের দেশে কবিতা আর হচ্ছে না! বড় দুঃখের কথা!

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—এঁরা এক-একটা কথা ব্যবহার করে গেছেন, তার প্রত্যেকটা কি সুন্দর অর্থপূর্ণ! কি গভীরতা, তার মধ্যে! এখনকার কবিরা কেবল কথার ঝঙ্কার তোলেন মাত্র—যেন জলের বুদ্‌বুদ, ভিতরে কিছু নেই! টেনিসন, বায়রণ, ব্রাউনিং, এ সব যাঁরা না পড়েছেন, কবিতা যে কি, তা তাঁদের বোধগম্য হওয়া দুষ্কর!

মা খুব শাসিয়ে গেলেন, 'চাটুয্যেরা ভারী ধরেছে—তাঁদের পুঁটি বলে মেয়েটি নাকি দেখ্‌তে বেশ!' হায়, এই চুণোপুঁটি শেষে আমার হৃদয়-সাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়াবে? কখনও না! দিন কতক গা-ঢাকা না দিলে দেখ্‌ছি পরিত্রাণ নেই! এই ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস অবধি একটানা সময়টুকু প্রজাপতি দেবতার পক্ষে ভারী অনুকূল! এ কটা মাসকে কোন মতে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারলে আবার একটু রক্ষা পাওয়া যায়!

২২শে ফাল্গুন।

পুরাণো ডেস্ক গুছাতে গিয়ে সুধীরের কতকগুলো চিঠি পাওয়া গেল। আহা, বেচারা সুধীর! বরাবর আমরা এক সঙ্গে পড়ে এসেছি। সুধীরের বাপ মারা যেতে সুধীর ফার্ষ্ট আর্টস্ দিতে পারে নি। তার বাপ বেশ একটু সৌখীন ছিলেন—বিস্তর দেনাপত্রও করেছিলেন। কাজেই তিনি মারা যেতে কলকেতার বাড়ী বেচে সুধীরকে দেশে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে দেখা-শুনা না হোক, আমাদের পত্র-ব্যবহারটা বরাবরই চলে এসেছে। কেবল এই পূজার সময় থেকে চিঠিপত্র আমি লিখতে পারি নি,

একজামিনের জন্য। আর গোপন করাই বা কেন? চিঠি লেখার সে আগ্রহ, মিলনের সে ব্যাকুলতা ক্রমেই যেন কমে আস্‌ছে! আগে সব কাজ ফেলে এই চিঠি-লেখা ব্যাপারটা বেশ সুসম্পন্ন হয়ে উঠত, অথচ কোন কাজের তাতে ক্ষতি হত না। আর এখন সহস্র বাজে কাজে কত অবসর আমরা নষ্ট করে ফেলছি, অথচ চিঠি লেখার আর সময় পাওয়া যায় না বলে যে একটা মিথ্যা ওজর করি, সেটা কি অর্থহীন আত্মছলনা! সুধীরের চিঠি-পত্রও, কৈ, পাই না ত!

আজ সুধীরের অনেক কথা মনে পড়ছে। সুধীর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দু জনে এক সঙ্গে বেড়ানো, এক সঙ্গে টেনিস খেলা, এক সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা—আঃ, কি সুখের দিনই সে ছিল! লোকে বলে, যত জ্ঞান বাড়ে, মানুষ তত সুখী হয়। কিন্তু ছেলেবেলাকার সেই সরল সুন্দর অনাড়ম্বর দিনগুলিতে ছেলেমানুষী করে, বাজে গল্পে, বাজে কাজে যে আমোদ, যে সুখ পেয়েছি, তার কাছে কাণ্ট হেগেলের জ্ঞানের আনন্দ কত তুচ্ছ মনে হচ্ছে! বেশ মনে পড়ে, তার পর সুধীররা যে দিন দেশে চলে গেল, সেই সন্ধ্যার ম্লান আলোর মধ্যে দু জনের ছাড়াছাড়ি হল—আমার হৃদয় তখন ভেঙ্গে পড়ছিল! ভেবেছিলুম, এ কষ্ট, এ বিচ্ছেদ বুঝি সহ্য করতে পারব না। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য, আজ তা বেশ সয়ে গেছে—একটুও ত অভাব বোধ হচ্ছে না! পৃথিবীটা ভারী বিচিত্র জায়গা, সন্দেহ নেই! আজ যেটাকে নিতান্ত গর্ব্বের, আদরের, সাধের সামগ্রী বলে বুকে চেপে ধরছি, কাল সেটাকে অতি তুচ্ছ বলে দূরে ধূলায় ফেলে দিচ্ছি!

ভাবছি, একদিন সুধীরের দেশে বেড়াতে গেলে হয়। একটানা জীবনে একটু তবু বৈচিত্র্য পাই! আর সে-ও ত কতদিন ধরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। আরও সব চেয়ে আরাম পাই যে, এই ঘটকগুলোর 'বচনামৃত' তিক্ত কুইনিনের মত গলাধঃকরণ করতে হয় না!

২৩শে ফাল্গুন।

মাকে কাল রাত্রে বাঘাটি (সুধীরদের দেশ) যাবার কথা বলেছি। মা বললেন, 'বিয়ে কাটাবার এ একটা ফন্দী!' মাকে অনেক করে বোঝালুম, 'ফিরে এসে নিশ্চয় বিয়ে করব।' তখন মা আশ্বস্ত হলেন! আহা, মার তুল্য বন্ধু এ পৃথিবীতে আর কে আছে? নিঃস্বার্থ স্নেহ, এক মাতৃ হৃদয় ছাড়া আর কোথায় সম্ভব? আজকালের বাবুরা এই মাকে অম্লান বদনে অবহেলা করেন, তুচ্ছ একটা স্ত্রীর জন্য! আমাদের মধ্যে বিলাস-লালসাটা বড় বেড়ে চলেছে, ভক্তি জিনিসটা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না! হা ভগবান্, বাঙ্গালীর হৃদয়টাকে কি একেবারে উপ্‌ড়ে বার করে দেছ? 'স্বদেশী', 'স্বদেশী' বলে গগনভেদী চীৎকার-ধ্বনি করে বেড়ালেই হয় না। ঘরে নিজের মার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন, আর সভার মধ্যে ভারতমাতার নাম করতে গিয়ে চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল বার করা, দেখে আমার অস্থি-মজ্জা জ্বলে যায়! এই সব পাষণ্ড নরাধমগুলোকে জুতোর ঠোক্কর মেরে দেশছাড়া করলেও গায়ের জ্বালা মেটে না! হায়, শত অত্যাচারে নিপীড়িতা বাঙ্গলার মাতৃগণ, তোমরা দারুণা

বেদনায়, ক্ষোভে, চোখের জলটুকু অবধি পড়তে দাও না, পাছে তোমাদের দুর্ম্মুখ সন্তানগুলোর অকল্যাণ হয়! হায় মা, তোমরা অভিশাপ দাও, মায়া করো না, এ সব কুলাঙ্গার সন্তান তোমাদের যন্ত্রণার তপ্ত নিশ্বাসে দগ্ধ হয়ে যাক্।

২৭শে ফাল্গুন।

সুধীরকে খুব চমকে দেওয়া গেছে। ষ্টেশনে একখানাও গাড়ী মেলেনি, তাই সারা পথটা জিজ্ঞাসা করতে করতে সুধীরদের বাড়ী পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেছল! সুধীর বাড়ীতেই ছিল। সুধীরের চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেছে! দারিদ্র্য রাহুর গ্রাসে তার চোখের প্রভাটুকু অবধি অন্তর্হিত! সুধীরের মাকে দেখলে যথার্থ ভক্তি হয়! দারিদ্র্য তাঁর লক্ষ্মীশ্রীটুকুকে যেন মোটেই স্পর্শ করতে পারেনি! কি এক পবিত্র দীপ্তি তাঁর চোখে! এই দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি যেন অবিচলিতা—সে দিকে যেন তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই! দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর মর্য্যাদা, তাঁর তেজস্বিতা যেন অক্ষুন্ন রয়েছে!

পরিবারের মধ্যে, সুধীরের মা, সুধীর আর সুধীরের ছোট একটি বোন্! সুধীরের এক বছরের ছেলেটি তার দিদিমার কাছেই থাকে! সুধীরের স্ত্রী এই ছেলেটি প্রসব করে ইহলোক ত্যাগ করেছে! বেচারা সুধীর! এত দৈব-দুর্বিপাকে যে তার চেহারা খারাপ হবে, তা আর আশ্চর্য্য কি? হায়, দুঃখ কি, তা আমরা ক'জন বুঝি? কিন্তু যাকে ভুগতে হয়, দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতটা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে!

সুধীরের মা বলছিলেন, তাঁর মেয়েটির জন্য একটি ভাল পাত্র দেখে দিতে। মেয়েটি তের বছরে পড়েছে, কেবল পয়সার অভাবে মনের মত পাত্র মিলছে না! হায়রে, বাঙ্গালীর সমাজ! রাখী-বন্ধনের দিন 'ভাই-ভাই' বলে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবার ঘটায় তোমার বুক ফুলে ওঠে, মাতৃভূমিকে আপ্যায়িত করে দিচ্ছ ভেবে গর্ব্বে নাচতে থাক, আর এ কি তোমার ব্যবহার!

মেয়েটিকে দেখলে বড় দুঃখ হয়! গায়ে গহনা নেই, হাতে দু'গাছি রুলি, কানে দুটি মাকড়ি, আর নাকে একটি ছোট নোলক। ছেলেমানুষ, রান্নী-বান্না করে, বাসন মাজে! এই বয়সে কোথা সে পুতুল খেলবে, মায়ের সহস্র আদরে ডুবে থাকবে, না, তাকে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়! একটু 'আহা' বলবার লোক নেই! আর বড়লোকের শক্তিসামর্থ্যযুক্তা স্ত্রীগুলো জলের গ্লাস তুলতে গিয়ে মূর্চ্ছিতা হলে বাড়ীতে মোসাহেব আর ডাক্তারের ভিড় জমে যায়! তাঁদের সেই অলস হস্তের মণিমাণিক্যখচিত-বলয়-ঝঙ্কার আমার কাছে আজ অত্যন্ত অসহ্য মনে হচ্ছে! দারিদ্র্যের মধ্যে যে ত্যাগের মহত্ত্ব আছে, তা এই ছোট মেয়েটিকে দেখে বুঝতে পারলুম!

মা ত বিয়ের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন এঁদেরও মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না; সুধীর আমার বাল্যবন্ধু, এখন অর্থাভাবে বিপন্ন; চিরদিন তার এমন অবস্থা ছিল না; আমি যদি হিমানীকে বিবাহ করি ত এঁরা স্বর্গ হাতে পান! কিন্তু আমি

হিমানীকে বিবাহ করতে পারি না! হায়, এমনই আমার বন্ধুত্ব!
নিজের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করছি, আমি বিবাহ করতে পারি না! কারণ লোকের সামনে এই স্ত্রীকে দাঁড় করাব, কি বলে? এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটাকে বিবাহ করলে আমার মানসী কল্পনা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হবে না? এটা আমার দুর্ব্বলতা, বুঝছি, কিন্তু এই দুর্ব্বলতা আমাদের মধ্যে রীতিমত সংক্রামক হয়ে পড়েছে! আমরা কবিতায় এর জন্য দুঃখ করতে পারি, গল্পে এ ঘটনার নিষ্ঠুরতা বেশ ফুটিয়ে সকলের সহানুভূতি উদ্রেক করতে পারি, থিয়েটারের ষ্টেজে অভিনয় দেখে কাঁদতে পারি, 'ভাই ভাই, ভেদ নাই' বলে তারস্বরে গাইতে পারি, কিন্তু পারি না শুধু মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করতে, স্বদেশবাসীর দুঃখে এতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করে যথার্থ আন্তরিক সহানুভূতি দেখাতে!

২৯শে ফাল্গুন!

আজ সকালে উঠে সুধীরের সঙ্গে খুব খানিক ঘুরে আসা গেল। পাড়াগাঁটা আমার বড় ভাল লাগে। ফ্যাশনের জন্য নয়, ডায়েরি লিখছি বলে নয়, জায়গাটা আমার কাছে যেন স্বপ্ন-ঘেরা মায়া-রাজ্য বলে মনে হয়। আর এখানে হৃদয় বলে জিনিসটা এখনও দুর্ল্লভ হয়ে ওঠে নি! এখনও এখানে দু-চারটে খাঁটী প্রাণ মেলে।

ঘুরে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সকালে তাড়াতাড়িতে আজ চা খাওয়া হয় নি, তাই কষ্টটা এত বেশী হচ্ছিল। কতকগুলো বদ অভ্যাসের বশে বাজে সখে, আমরা দিন দিন এত অপদার্থও হয়ে পড়ছি!

দু একটা ডোবায় জল ছিল, কিন্তু সে এত ঘোলা যে, অত তৃষ্ণা হলেও তা পান কর্‌তে আমার প্রবৃত্তি হল না। সুধীর আমাকে নিয়ে এক সদ্‌গোপের বাড়ী গেল। সদ্‌গোপ বাড়ী ছিল না। তার বুড়ো মা গরুদের জাব দিচ্ছিল। ব্রাহ্মণ জল চাচ্ছে জেনে তাড়াতাড়ি দুটি পরিষ্কার ঘটীতে করে সে জল এনে বল্‌লে, "বাবা শুধু জলটা খাবে, ভদ্দর নোক আপনারা, তা গরীব মানুষ, আপনাদের যুগ্যি আর কি পাই, এই চারখানি বাতাসা ঘরে ছিল, এইটুকু মুখে দিয়ে জল খাও।" আমরা খাব না, সেও ছাড়বে না! শেষে তার কোটই বজায় রাখতে হল। আঃ, কি যে আরাম হল, বলতে পারি না। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে ইলেকট্রিক ফ্যানের তলায় বসে পরিমিত আদর-আপ্যায়নের মধ্যে বরফ-দেওয়া পাঁচ গেলাস আইস্‌-ক্রীম সোডা খাওয়ার চেয়েও লক্ষগুণে তৃপ্তিকর! আমার মনে হল, স্বর্গের অমৃতের আস্বাদও বুঝি এমনি! তার পর বুড়ী বললে, 'জলের যা কষ্ট, বাবা—এ সব কাদা-ঘোলা জল ত ছেলে-পিলেদের দিতে পারি না, সেই রায়বাবুদের দীঘি থেকে জল নিয়ে আসি। পাঁচ ক্রোশ মাঠ ভেঙ্গে জল আনতে হয়।" শুনে আমার মনে ভারী কষ্ট হল। এই যে দেশের জরদগবগুলো গোরাদের ফণ্ডে, দরবারের আমোদে, বাগানবাড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কচ্ছে, গবর্ণমেণ্ট চাঁদার খাতা ধরলেই, হুড়হুড় করে যাঁদের চাঁদার টাকা, বৃষ্টির জলের মত, ঝরে পড়ছে, তাঁরা যদি সবাই মিলে কটা পয়সা খরচ করে এই সব জলহীন দেশে

এক-একটা দীঘি কাটিয়ে দেন, তা হলে সরকারে উপাধি না মিললেও এতগুলো আধমরা দেশের লোককে বাঁচিয়ে তাদের যে আশীর্ব্বাদ পান, সেটা কি এতই তুচ্ছ !

বুড়ীকে আমি একটি টাকা দিতে গেলুম, সে কিছুতেই নিলে না। আমি বললুম, "তোমার ছেলেদের খাবার কিনে দিও।" সে পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, "আশীর্ব্বাদ কর বাবা, ওরা যেন গতর খাটিয়েই চিরদিন নিজেদেব খাবারের জোগাড় করতে পারে।" হায়, কত শিক্ষিত লোক এই গতর-খাটানোর মর্য্যাদা না বুঝে, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, মোসাহেবীর জোরে উদরান্নের সংস্থান করে বেড়াচ্ছে! তারা এই সব পাড়াগেঁয়ে চাষাদের পায়ের তলায় স্থান পাবারও যোগ্য নয়! হে আমার ডায়েরি, আজ এই পবিত্র-হৃদয়া, তেজস্বিনী, বাঙ্গালী কৃষক-রমণীর কাহিনীতে তোমার দীন অঙ্গ যে শ্রীসম্পন্ন হল, এ তোমার অল্প সৌভাগ্য নয়!

রাত্রে সুধীরের সঙ্গে এই সব কথা নিয়ে নানা তর্ক হচ্ছিল, হিমানীও বসে শুনছিল। সে আমার আল্‌পাকার কোটটা দেখিয়ে বললে, "আপনার এটা কি স্বদেশী ?" আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললুম, "না।" "আপনি বুঝি স্বদেশী নন ?" আমি বললুম, "স্বদেশী বৈ কি !" "তবে ?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, "এ রকম স্বদেশী মেলে কই ? জিনিসটা ভাল নয় কি ?" সে বললে, "বিদেশীটা নাই বা ব্যবহার করলেন—দেশী গরদের কোট কি এর চেয়ে খারাপ হত ?" আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, "ঠিক বলেছ, হিমু—।" এই কথা বলে পকেট থেকে দেশলাই বার করে জেলে

সেটাতে ধরালুম। দেখতে দেখতে আমার আদরের আল্‌পাকার কোট পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

হিমুর বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে একটু আনন্দ হল। নিতান্ত সে অবজ্ঞার পাত্রী নয়। হায়! পয়সার সঙ্গে ওজন করে তবে এই সব মেয়ের বিয়ে হবে, হৃদয়টা কেউ দেখবে না! আমি কলকেতায় গিয়ে নিশ্চয় হিমুর জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান করব! আজ হিমু আমাকে ভারী শিক্ষা দিয়েছে!

* * *

৩০শে ফাল্গুন।

সুধীরের ব্যবহারে একটা বিসদৃশ ভাব লক্ষ্য কচ্ছি! সে যেন আমার সঙ্গে তেমন প্রাণ খুলে কথা কচ্ছে না, মিশছে না—একটা সঙ্কোচের ব্যবধান রাখছে। বোধ হয়, দারিদ্র্যের জন্য! এ তার অন্যায়। দারিদ্র্য ত পাপ নয়! তার জন্য লজ্জা কি? মানুষের অবস্থা কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। দারিদ্র্যকে যে ঘৃণা করে, সে মানুষ নয়। সিন্দুক-ভরা কোম্পানির কাগজ নিয়ে যে হতভাগা তার সদ্ব্যয় জানে না, সমস্ত অবসরটুকু মদ আর বদখেয়ালিতে নষ্ট করে, সে ত পশু! তার তুলনায় যে গরীব কেরাণী মাসে পঁচিশটি টাকা মাহিনা পেয়ে কষ্টে স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ কচ্ছে, সে ত দেবতা! আমি বরং সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধূলি-লাঞ্ছিত গরীব কেরাণীর পায়ের ধূলো মাথায় নিতে পারি, তবু অমন বড়লোকের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ করি!

সুধীর ভুল বুঝেছে। এ দারিদ্র্য তার ইচ্ছাকৃত নয়! সে ত

বদখেয়ালি করে এ টাকা ওড়ায় নি! এই যে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে কত লোক ফকির হচ্ছে, জুয়াচোরের চক্রান্তে কত লোক সর্ব্ব-স্বান্ত হচ্ছে, তাদের প্রতি কি ঘৃণা হয়? যার হয়, সে পশু।

৩রা চৈত্র।

মা বাড়ী ফেরবার জন্য ভারী তাগাদা দিচ্ছেন। আরও কিছু দিনের ছুটী মঞ্জুরির জন্য তাঁর কাছে দরখাস্ত পাঠালুম। জায়গাটা বেশ লাগছে। মা লিখেছেন, আমার জন্য তাঁর মন কেমন করে! তা ত জানি—আমিই তাঁর এ সংসারে একমাত্র বন্ধন! আজ ষোল বৎসর বাবা মারা গেছেন, আমার লেখাপড়া প্রভৃতি সবই ত মা দেখে আসছেন! এমন বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী নারী ক্রমশই দুর্ল্লভ হয়ে পড়ছেন, চারি ধারে দেখে আমার ধারণা ত অন্ততঃ এইরকম। স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা নারীসমাজটাকে কি শৃঙ্খলেই না জড়িয়ে রেখেছে! অথচ সে শৃঙ্খল ছাড়াবার জন্য চেষ্টা ত কারও দেখি না!

সুধীরের মা সন্ধ্যাবেলা দুঃখ কচ্ছিলেন, সুধীর কেমন হয়ে গেছে! কতকগুলো বদ সঙ্গী জুটে তাকে উৎসন্ন দিচ্ছে! তিনি সুধীরকে ফেরাতে পাচ্ছেন না। কথাটা আমাকে বলতে বিধবা নারীর অন্তর যেন ফেটে যাচ্ছিল! সে বিয়ে না করে কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে, ছেলেটিকে অবধি ভাল করে দেখে না,—আমি আসা অবধি তবু যা বাড়ীতে থাকে, নাহলে বাড়ীতেও সে রোজ থাকে না। কি দুঃখের কথা! শুনে বড় কষ্ট হল!

সেই সচ্চরিত্র বিনয়ী সুধীর! এখন তার সঙ্কোচের কারণ বুঝলুম। তাই সে আমার সঙ্গে তেমন করে কথা কইতে পারে না! সুধীরকে আজ কতবার কথাটা বলব-বলব মনে করলুম, কিন্তু দুঃখে, ক্ষোভে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল! ধর্ম্মশিক্ষাটা আমাদের নেই বলে, আজকালকার যুবকদের চরিত্রে নৈতিক ভিত্তিটা এমন শিথিল!

৪ঠা চৈত্র।

আজ সকালে অনেক দূর বেড়িয়ে এসেছি। বনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখা গেল। বেশ বড় রকমের। সুধীর বললে, এটা নাকি রাজা গণেশের আমলের! চক্‌মিলানো প্রকাণ্ড দালানের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে বড় বড় বট-অশথের গাছ উঠেছে। এমন নিঃশব্দ জায়গা—একটা লোকেরও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। পাশে একটা প্রকাণ্ড পুকুর,—বাঁধানো ঘাট এখন ইষ্টক-স্তূপের মত পড়ে রয়েছে! ঘাটের পাশে একটা টাব্লেটর মত কি পদার্থ। তাতে কি লেখা—অক্ষরগুলা পড়তে পারলুম না। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দেখতে পারেন। চারিধারে খুব ঘন ঝোপ—পুকুরের মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। রহস্য-আবিষ্কারে এগুচ্ছিলুম, সুধীর বল্‌লে, "যেয়ো না হে, ভূতের দৌরাত্ম্যে এ ধারে কেউ আসে না, দু-চার জন ওখানে যাবার চেষ্টা করেছিল, আর ফেরেনি।" আমি বললুম, "সহরে কত রকম ভূত দেখা গেছে, এ পাড়াগাঁর নিরীহ ভূতকে আর ভয় কি?" আমি ভূত মানি কি না সুধীর

জিজ্ঞাসা কচ্ছিল। আমি স্পষ্টই বললুম, "ভূতকে ভয় করি, তবে মানি না।" সুধীর হাসতে হাসতে বললে, "সবাই বলে, আমাদের বাড়ীতেও ভূত আছে ; কিন্তু আমরা ত কখনও দেখিনি।" শুনে অবধি ভূত দেখবার জন্য আমার ভারী আগ্রহ হয়েছে। কিন্তু আবার এদিকে ভয়ও করে, তাই আগ্রহটা কারও কাছে আর প্রকাশ করে বলিনি।

ফেরবার সময় বড় দুঃখ হল! প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে কত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেলতুম, কেবল সন্দেহের ভূতের ভয়েই এমন বিপুল সম্মান ফস্‌কে গেল!

* * *

৭ই চৈত্র।

কাল রাত্রে ভারী একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তা ডায়েরিতে লিখে রাখতে আমার কষ্ট হচ্ছে ; কিন্তু তবু কর্ত্তব্য-বোধে লিখে রাখতে হবে।

রাত্রে কেমন গরম হচ্ছিল। ভাল ঘুম হচ্ছিল না। তন্দ্রা আসছিল, আর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তখন রাত ঠিক কটা,—বলতে পারি না। রাত্রের অন্ধকারে সে দিনকার ভূতের কথাই মনে পড়ছিল—একটু ভয়ও হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! দরজায় খিল না লাগিয়ে শোয়াই আমার অভ্যাস। ঘরে আলো ছিল না। জানলাও তেমন খোলা ছিল না, একটু ফাঁক করা ছিল মাত্র। পাছে পাড়াগাঁয় রাতের হাওয়া গায়ে লেগে ম্যালেরিয়া ধরে, এই ভয়ে জানলা খুলে শুতে ভয় হয়। একটু সজাগ হয়ে বিছানার মধ্যেই পাশ

ফিরে দেখলুম, আপাদমস্তক চাদরে মুড়ি-দেওয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমার গায় কাঁটা দিয়ে উঠল! কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম বেরুতে লাগল! ভয় হল! ভাবলুম, চেঁচিয়ে সুধীরকে ডাকি। কিন্তু স্বর যেন বেধে গেল! ভাবলুম, মনের ভ্রমও ত হতে পারে! শুয়ে চোখ বুজেই ভাবতে লাগলুম দেশলাইটা যদি বালিশের তলায় রাখতুম! কিছুক্ষণ বাদে চোখ চেয়ে দেখি, ঘরে কেউ নেই! তখন আমার হাসি পেতে লাগল! ঘুমোবার চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ ঝুন করে একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম, চোখ মেলে দেখি, আবার সেই চাদর-মুড়ি ছায়া-মূর্ত্তি—সে ক্ষিপ্র গতিতে ঘর থেকে বাহিরে গেল! আমার গা ছম্ ছম্ কচ্ছিল! সাহস করে বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জেলে বাতিটা খাড়া করলুম। বাতি নিয়ে চারি ধার দেখতে গিয়ে দেখি, আমার জামাটা আলনার তলায় পড়ে গেছে, তার পাশেই ট্রাঙ্কের উপর আমার চেনশূন্য ঘড়ি আর মনিব্যাগ, আর দু-টুকরো কাগজ ও নীচে ভূঁয়ে চেনছড়া পড়ে রয়েছে! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। নিশ্চয় তবে চোর এসেছিল! কিন্তু অন্য সব জিনিসপত্র ঠিক আছে ত! কৌতূহলী হয়ে তখন আমি সেই কাগজ দুটো তুললুম। দুখানা চিঠি—আমার কাছে রেখে দিছি—একটাতে লেখা আছে,—

"বিনা পয়সায় রোজ রোজ ইয়ার্কি দেওয়া পোষাবে না, এই সাদা কথা বলে দিচ্ছি। বোতলের দরুণ কতটি টাকা জমে

আছে, তা বাবুর হুঁস আছে কি? কাল কিছু টাকা চাই-ই, না হলে এ ধারে পা বাড়িও না। যার পয়সা নেই, তার অত মদ খাবার সখ কেন?"

আর একটা—সে যেন, সুধীরের হাতের লেখা। সেটা এই রকম,—

"মাপ কর ভাই, নানান্ রকমে পয়সার চেষ্টা কচ্ছি, পাচ্ছি না। বোনটার গায়ে এক টুকরোও সোনা নেই! যা ছিল, সব নিয়েছি! পিতলের মাকড়ি আর রুলি রেখে ত কেউ পয়সা দেবে না, মার হাতেও কিছু আছে বলে মনে হয় না। কলকেতা থেকে আমার এক বন্ধু এসেছে, দেখি, তার কাছ থেকে যদি কিছু যোগাড় করতে পারি।"

হায়! সুধীর আজ চোর! সে আমার ঘড়ি চুরি করতে এসেছিল! টাকার কথা আমার কাছে খুলে বল্লেই ত হত! আমি কি দিতুম না? কষ্টে আমার চোখ দিয়ে জল আসবার মত হল! ঘড়ি-চেন নিয়ে গেছল, অনুতাপ হয়েছে বলে ফিরিয়ে রেখে গেছে, আর কি! দুবার সে এ ঘরে ঢুকেছিল, আমি বেশ দেখেছি। এই ছদ্মবেশ ধরবে, আগেই কি সে তা স্থির করেছিল? নইলে সে দিন ভূতের কথা অত করে তুলবে কেন? হা ভগবান্, দারিদ্র্য যে মানুষকে এত হীন করে ফেলতে পারে, তা উপন্যাসেই পড়ে এসেছি, আজ কি শোচনীয় ভাবে তা প্রত্যক্ষ করতে হ'ল!

মনটা খুব খারাপ হওয়ায় বাহিরে এলুম। দেখি, দালানের

জানলায় বসে হিমানী! কোণের দিকে মুখ করে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল! হঠাৎ আমাকে সামনে দেখে সে যেন চমকে উঠল! তাকে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল! সে তবে সব জানে!

আমি বললুম, "তুমি কাঁদছ কেন, হিমু? কি হয়েছে, আমায় বলবে কি?" সে ফোঁপাতে লাগল! আমি সান্ত্বনার স্বরে বললুম, "বল।" হিমানী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে, "আপনি কিছু জানেন না? আপনার ঘরে দু' টুকরো চিঠি পড়ে আছে, তা—"আমি বললুম, "সে দুটোই আমি পড়েছি! বুঝেছি সব! তাই তুমি কাঁদছ?" হিমানী বললে, "আপনি যদি জানেন সব ত মাকে কিছু বলবেন না। তিনি কিছু জানেন না, শুনলে নিশ্চয় বিষ খাবেন! দাদার কি হবে?"

তার পর সে বলতে লাগল,"আজ বিকেলে ধোপার বাড়ী কাপড় দেবার জন্য দাদাব জামা নিতে এসে পকেটে দুখানা চিঠি পাই। ঐ যে আপনার হাতে রয়েছে,—পড়ে বড় কষ্ট হল! কিন্তু এ কষ্ট কিছু নতুন নয়! চিঠি দুটো দাদার ঘরে বাক্সের উপর রেখে জামাটা কাচতে দেওয়া হয়। তার পর চিঠির কথা আর মনেই ছিল না। রাত্রে কিছুক্ষণ আগে মার পায় মালিশ করে, তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দালানে এসে দেখি, সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে দাদার ঘরে ঢুকল! চোর মনে করে আমি দাদাকে ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ব্যাপার

জানবার জন্য আস্তে আস্তে দাদার ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর বাক্সের উপর ঘড়ি, চেন আর মণিব্যাগ! ঘড়িটা দেখে আপনার ঘড়ি বলে চিনতে পারলুম। তখন সেই বিকেলের চিঠির কথাও মনে পড়ল। ব্যাপার বুঝতে আর দেরী হল না! ভয়ে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমার মাথা ঘুরতে লাগল। দাদা শেষে টাকার জন্যে আপনার ঘড়ি, চেন আর ব্যাগ চুরি করেছে! আপনি যদি জানতে পারেন, দাদা চোর, তা হলে কি হবে, এই ভেবে তখনই আমি বিছানার চাদরখানা মুড়ি দিয়ে আপনার ঘরে জিনিসগুলো রাখতে গেলুম, তাড়াতাড়িতে চিঠি দুটোও ফেলে এসেছি, আর চেনটা হাত থেকে পড়ে গেল। আপনি পাছে জেগে ওঠেন, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। দাদা কোথায় গেছে,—এখনও ফেরেনি! আমার বুকটার ভিতর যে কি হচ্ছে, তা কি বলব? দাদার কি হবে?"

সে কাঁদতে লাগল। আমি তার পিঠে হাত রেখে, আশ্বাস দিয়ে বললুম, "তোমার মাকে বলে সুধীরকে আমি কল্‌কেতায় নিয়ে যাব। যাতে তার ভাল চাকরী হয়, সে যাতে ভাল হয়, তা করব।" হিমানী কাতর স্বরে বল্লে, "মাকে এ কথা বলবেন না যেন। দাদা চোর, এ কথা শুনলে মা নিশ্চয় বিষ খাবেন।" "তোমার কোন ভয় নেই, তুমি শোও গে, আমি দেখি, সুধীর কোথা গেল।" "না, না, দাদা তা হলে আরও লজ্জা পাবে।" "তবে থাক্" বলে হিমানীকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজের

ঘরে এসে অনেক ক্ষণ ধরেই সুধীরের কথা ভাবতে লাগলুম। সুধীরের বিয়ে হলে সে ভাল হতে পারে! আমার বিশ্বাস, তা হলে সুধীরের দায়িত্বহীন জীবনে একটা নূতন দায়িত্বও আসে!

আজ সকালে সুধীরের সঙ্গে দেখা হলে হাসতে হাসতে আমি বললুম, "ওহে, কাল এক ভৌতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার ঘরে কাল ভূত এসেছিল। কিন্তু গলাও টেপেনি, মারধোরও করেনি। কেবল জামার পকেট থেকে ঘড়ি, চেন আর ব্যাগটি বের করে ট্রাঙ্কের উপর রেখে একটু কৌতুক করে গেছে!" শুনে সুধীর আর কথাটি কইলে না, তার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

হিমানীর সঙ্গে যখন সকালে দেখা হল, তখন সে আর কোন কথা বললে না। তার দৃষ্টিতে এমন একটা মৌন কাতরতা ফুটে উঠেছিল যে, তা দেখলে পাষাণও গলে যায়!

সুধীরের মার কাছে সুধীরকে কলকেতা নিয়ে যাবার কথা বলতে তাতে তাঁর খুব সম্মতি দেখা গেল। সুধীরকেও আজ বোঝানো গেল! সে-ও যেতে রাজী হয়েছে!

১১ই চৈত্র।

কলকেতায় এসে মাকে সব কথা কিন্তু খুলে বলেছি, না বললে আমি যেন সুস্থির হতে পাচ্ছিলুম না। শুনে মার চোখ জলে ভরে এল। সহানুভূতির এই অশ্রু কি পবিত্র!

হিমানীর বিবাহের জন্য মা ঘটক লাগিয়েছেন।

ডায়েরির ক’ পাতা

১৩ই বৈশাখ।

আজ দুদিন হল সুধীরের চাকরী হয়েছে। মামাদের ফার্মে তাকে একটা ভাল চাকরী জুটিয়ে দেওয়া গেছে। আমাদের বাড়ীতেই সে থাকে। আমার প্রাণটাও একটু আশ্বস্ত হয়েছে। সেই পুরনো সুধীরকে যে ফিরে পাওয়া গেছে, এ কি কম সুখের কথা!

আমার বিয়ের জন্য মা আবার ভারী উঠে পড়ে লেগেছেন! কিন্তু হিমানীর বিয়ে না হলে ত আমি বিয়ে করতে পারি না। হিমানীর বিয়ের জন্য ত বিস্তর পাত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক আমার পছন্দমতটি পাচ্ছি না। মা হেসে বলেন, “তোমার বাপু কি যে পছন্দ, তাও জানিনে। নিজের পাত্রীও যেমন মনে ধরে না, হিমানীর পাত্রও তেমনি পছন্দ হয় না!” তা হোক, তা বলে যারা নাকটি কানটি পর্য্যন্ত মেপে দর কসতে থাকে, হিমানীকে তেমন সব ব্যবসাদার পাত্রের হাতে কিছুতেই সমর্পণ করতে পারব না! এমন হৃদয়টা কি কেউ দেখবে না?

১৫ই বৈশাখ।

মা এইমাত্র এসে বললেন, “হিমানীর পাত্র ঠিক হয়েছে! সুধীর তাঁদের নিয়ে আসুক।” আমি বললুম, “কোথায় পাত্র?” মা বল্লেন, “যেখানেই থাকুক্, এ তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে! রূপে গুণে সব বিষয়ে আমার মনের মত,—এমনটি আর পাব না! তোমাকে এখন বলব না, যদি আবার ভাংচি দাও! ওরা এলেই সব জানতে পারবে!” আমি বললুম,

"তারা কত টাকা চায়?" মা বল্লেন, "কিছু না, কিছু দিতে হবে না, শুধু আশীর্ব্বাদের সঙ্গে মেয়েটি নেবে!" আমি ত শুনে অবধি অবাক্ হয়ে রয়েছি! এই টানাটানি আর অতি-বুদ্ধির দিনে এমন হতভাগা গাধা কে আছে যে, বিয়ে করে টাকা নিতে চায় না! এমন পড়ে-পাওয়া চোদ্দ গণ্ডা লাভ ছেড়ে বিয়ে করতে চায়, কোন্ বেকুব্! লোকটা আর তার অভিভাবকের দল পাগল নয় ত!

*   *   *   *

১৯শে বৈশাখ।

আজ সন্ধ্যাবেলায় আর বেড়াতে যাওয়া হল না,—হাবুদের ওখানে পার্টিটা ছিল!

বাড়ীতে কিন্তু ভারী মজা হয়ে গেছে! বেরুব বলে, মাথায় ব্রস চালাচ্ছি, এমন সময় মা একেবারে হিমানীকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে এসে হাজির! পিছনে সুধীরের মা! হিমানী যেন আগেকার চেয়ে অনেকটা ফরসা হয়েছে, মনে হল! প্রণামাদির পর মা হঠাৎ হিমানীর হাতটা টেনে আমার হাতে রেখে বললেন, "এই আমার হিমানীর পাত্র, বুঝলি অমর? আমি ক দিন ধরে ঠিক করে রেখেছি! তোর জন্য ত ঢের পাত্রী দেখেছি, কিন্তু এমন লক্ষ্মীকে ঘর থেকে ছাড়তে প্রাণ চায় না! আমার বড় সাধ, হিমানীকে বুকে তুলে নি! তোর কোন আপত্তি শুনব না। এখন বেয়ান তুমি তোমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর!"

মা যেন আস্ত একখানা উপন্যাস বানিয়ে ফেললেন! সুধীরের মা গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, "আমার হিমুর এমন ভাগ্যি হবে যে, আপনার পায়ে সে স্থান পাবে?" মা বললেন, "পায়ে কি ভাই,—এমন মাণিকটিকে যে আমি মাথায় তুলে রাখব!" আমার দিকে চেয়ে মা বললেন, "এই বুধবারই বিয়ে হবে। এবার আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি!"

আমি ত অবাক! সেই হিমানী আমার স্ত্রী হতে চলল! ভবিতব্য একেই বলে! যাক্, কি আর করি? মাতৃ-আজ্ঞা ত ঠেলা যায় না। তা ছাঁড়া, হিমানী মেয়েটি মন্দই বা কি? আমিও ত এমন কিছু অপ্সর নই, যে অপ্সরী চাই! আর যাই হোক্, ঘটকগুলোকে আচ্ছা জব্দ করা গেছে।

২৬শে বৈশাখ।

কাল আমাদের ফুলশয্যা হয়ে গেছে। হিমানী চির-জীবনের মত আমার সঙ্গিনী হল! কাল সমস্ত গায়ে ফুলের গহনা পরে রাত্রে হিমানী যখন প্রকাণ্ড গোড়ে মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিলে, তখন আবার আমার কবিতা লেখবার সাধ হচ্ছিল! কিন্তু না, সে নিষ্ঠুরতা আর করছি না!

তের বছরের বাঙ্গালীর মেয়েগুলোকে আমি যে রকম অপদার্থ মনে করতুম, এখন দেখছি, তারা ঠিক সে রকম নয়! কাল হিমানীর সঙ্গে নানা গল্পে সারা রাত্রিটা যে কখন বিনিদ্রভাবে কেটে গেছে, তা কিছু হুঁস ছিল না! এটা আমার

কাছে কল্পনাতীত বটে, অথচ এমন আগাগোড়া জমাট গল্পও বড়-একটা আগে কখনও কারও সঙ্গে হয় নি।

হিমানী একটা বড় ভয় দেখিয়েছে! সে নাকি আমার ডায়েরি-খানা আগাগোড়া পড়ে ফেলেছে! সুধীর আর তার মা যে সেই ভূতের ব্যাপার কিছু জানতে পাবেন নি, এতে সে ভারী আশ্বস্ত। সে বায়না নিয়েছে, আমার এ খাতাখানি সে বাক্সবন্দী করবে! অন্য খাতায় আমাব ডায়েরি চলুক, এই তার ইচ্ছা। তার বিশেষ ভয়, কখন এখানা কার হাতে পড়ে যার যদি! তা বটে! ডায়েরিখানা এখন আমাদেব কাছে নেহাৎ অসার নয় ত!

এই অনুরোধ-রক্ষাটাকে কেউ কাপুরুষতা বলবেন কি না, জানি না, তবে আমি ত এটা পরিণীত জীবনের একটি সুন্দর সূচনা ভেবে হিমানীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলে বসেছি, 'তথাস্তু!'

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নির্ঝর ... ... ||০

বারোটি ছোট গল্প। বাঙ্গালী গৃহ-জীবনের দুঃখ-সুখের নিখুঁত ছবি। অশ্রুর প্রস্রবণ! হাসির নির্ঝর!

"গল্পগুলি উৎকৃষ্ট। সেগুলিতে নাটকীয় আর্ট ও স্বচ্ছতা আছে। হাস্য করুণ বিচিত্র রসের। নির্ঝর নামটি সার্থক হইয়াছে।" প্রবাসী।

পরদেশী ... ... ||০

পৃথিবীর নানা জাতির নরনারী-চিত্তের হর্ষ-বেদনার বিচিত্র কাহিনী। বিদেশী ওস্তাদদের বাছাই করা গল্পের মর্ম্মানুবাদ। সচিত্র।

"গল্পগুলি যেন এক একটি হীরার টুকরা। মণি-মাণিক্য-রত্ন-সংগ্রহ। সকলগুলি পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।" ভারতী।

যৎকিঞ্চিৎ ... ... ||০

ব্যঙ্গ-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। অজস্র মিষ্ট গানে ভরা।

"রচনা-রসে সুমধুর, ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল, অথচ সে ব্যঙ্গে পঙ্কিল কলুষতা নাই। ভাষা চমৎকার; চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তি স্ফটিকের ন্যায় বিমল স্বচ্ছ।" বসুমতী।

দশচক্র ... ... |৵০

কৌতুক-নাট্য। ষ্টারে অভিনীত। রঙ্গের খনি।

"সর্ব্বত্র সংযত ভাব, সুরুচি ও সরসতা রক্ষিত হইয়াছে। নাটকীয় শিল্প চাতুর্য্যের প্রাণ,—সহজ ও সরল ভাব। এ বিষয়ে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। গানগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও কবিত্বরসে সুমধুর।" ভারতী।

গ্রহের ফের ... ... |০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুব থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকেব উৎস। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন। "চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত। রহস্যরসটুকু যেমন সরস, তেমনই সুরুচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকাব চবিত্র-চিত্রনে সৌরীন্দ্রবাবু নিপুণ নাট্যকাবেব সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।" ভারতী।

দরিয়া ... ... ||০

নাটিকা। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রেম, আনন্দ ও কৌতুকেব সুমধুব চিত্র। সুধা সঙ্গীতেব পূর্ণ ডালি।

"অনাবিল হাস্যবসের স্নিগ্ধ প্রবাহ, কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলা মার্জ্জিত মিষ্ট রহস্য, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, বচনার এই বিশেষত্ব দরিয়ায় রক্ষিত হইয়াছে। লেখকের কল্পনাশক্তি,—চরিত্র-সৃষ্টি এবং চিত্রাঙ্কন-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। অনেকগুলি গান আছে; গানগুলি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী।" ভারতী।

সাঁঝের বাতি ... ... ||০

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে কবিতা ও গল্পের বই। বহু হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত; স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রসম্বলিত। "ইহা কেবলমাত্র শিশুদিগকে আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহাদের হৃদয়ের চারিদিকে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া তুলিবে। গল্পগুলি আর্ট হিসাবেও সর্ব্বজনের উপভোগ্য হইয়াছে।" ভারতী।

বন্দী ... ... ||০

উপন্যাস। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগো রচিত একখানি মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাসের সুমধুর অনুবাদ। বিবিধ চরিত্রের রেখাপাতে সম্পূর্ণ সুন্দর। ফ্রান্সের একটি করুণ কাহিনী।

পুষ্পক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

এক টাকা

গ্রহের ফের ... ... ।০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকের উৎস। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন। "চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত। রহস্যরসটুকু যেমন সরস, তেমনই সুরুচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকার চরিত্র-চিত্রনে সৌরীন্দ্রবাবু নিপুণ নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।" ভারতী।

দরিয়া ... ... ॥০

নাটিকা। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রেম, আনন্দ ও কৌতুকের সুমধুর চিত্র। সুধা সঙ্গীতের পূর্ণ ডালি।

"অনাবিল হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রবাহ, কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলা মার্জ্জিত মিষ্ট রহস্য, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, রচনার এই বিশেষত্ব দরিয়ায় রক্ষিত হইয়াছে। লেখকের কল্পনাশক্তি,—চরিত্র-সৃষ্টি এবং চিত্রাঙ্কন-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। অনেকগুলি গান আছে; গানগুলি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী।" ভারতী।

সাঁঝের বাতি ... ... ॥৫

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে কবিতা ও গল্পের বই। বহু হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত; স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রসম্বলিত। "ইহা কেবলমাত্র শিশুদিগকে আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহাদের হৃদয়ের চারিদিকে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া তুলিবে। গল্পগুলি আর্ট হিসাবেও সর্ব্বজনের উপভোগ্য হইয়াছে।" ভারতী।

বন্দী ... ... ॥৫

উপন্যাস। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগো রচিত একখানি মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাসের সুমধুর অনুবাদ। বিবিধ চরিত্রের রেখাপাতে সম্পূর্ণ সুন্দর। ফ্রান্সের একটি করুণ কাহিনী।

সকল গ্রন্থগুলিই কলিকাতা, গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ও ভবানীপুর ১৫ নং হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

পুষ্পক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

এক টাকা

গ্রহের ফের ... ... ।০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকের উৎস। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন। "চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত। রহস্যরসটুকু যেমন সরস, তেমনই সুরুচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকার চরিত্র-চিত্রনে সৌরীন্দ্রবাবু নিপুণ নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।" ভারতী।

দরিয়া ... ... ॥০

নাটিকা। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রেম, আনন্দ ও কৌতুকের সুমধুর চিত্র। সুধা সঙ্গীতের পূর্ণ ডালি।

"অনাবিল হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রবাহ, কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলা মার্জ্জিত মিষ্ট রহস্য, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, রচনার এই বিশেষত্ব দরিয়ায় রক্ষিত হইয়াছে। লেখকের কল্পনাশক্তি,—চরিত্র-সৃষ্টি এবং চিত্রাঙ্কন-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। অনেকগুলি গান আছে; গানগুলি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী।" ভারতী।

সাঁঝের বাতি ... ... ॥০

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে কবিতা ও গল্পের বই। বহু হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত; স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রসম্বলিত। "ইহা কেবলমাত্র শিশুদিগকে আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহাদের হৃদয়ের চারিদিকে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া তুলিবে। গল্পগুলি আর্ট হিসাবেও সর্ব্বজনের উপভোগ্য হইয়াছে।" ভারতী।

বন্দী ... ... ॥০

উপন্যাস। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগো রচিত একখানি মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাসের সুমধুর অনুবাদ। বিবিধ চরিত্রের রেখাপাতে সম্পূর্ণ সুন্দর। ফ্রান্সের একটি করুণ কাহিনী।

সকল গ্রন্থগুলিই কলিকাতা, গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ও ভবানীপুর ১৫ নং হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

পুষ্পক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

এক টাকা

পূর্ব্বকথা

পুষ্পক প্রকাশিত হইল। ইহার গল্পগুলি পূর্ব্বে ভারতী প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ই ইহাঁর দুই-চারিটি গল্প হিন্দী 'ইন্দু', পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার পুষ্পকের প্রচ্ছদ-পটেব পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুর,

৭ই আশ্বিন, ১৩২০

বন্ধুবর

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অভিন্ন-হৃদয়েষু

স্বূচী

পুষ্পাক

বাস্তুভিটা

গঙ্গার ধারে পল্লীর ক্রোড়ে একখানি বাড়ী খুঁজিতেছিলাম। ছুটির দিনে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলের হাত এড়াইয়া যেখানে গিয়া দুই দণ্ড হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি, এমন একখানি পরিচ্ছন্ন, খোলা, ঝর্‌ঝরে বাড়ী।

দালাল আসিয়া খপব দিল, নিকটেই উত্তরপাড়ায় একখানি বাড়ী আছে,—বিক্রয়ের জন্য—ঠিক-যেমনটি আমি চাই!

পথের উপর এক-তলা বাড়ী, পাশে বাগান,—বাংচিত্রের বেড়ায় ঘেরা। সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের গায় একখানা কাগজ আঁটা, তাহাতে লেখা আছে, "বাটী বিক্রয়। ভিতরে সন্ধান করুন।" জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, অক্ষরগুলা অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে! দ্বারের সম্মুখে নোড় ও নিমের দুইটা জীর্ণ গাছ। কালকাসুন্দার ঝোপেরও অসদ্ভাব নাই! বাড়ীখানি নিতান্তই পোড়ো!

না। ভিতরে ঐ যে কে কাশে! জীবনের চিহ্ন তবে লুপ্ত নহে! দ্বারের ফাটল দিয়া আমি ভিতর-পানে চাহিলাম। সম্মুখে উঠান। উঠানে আগাছার মধ্যে দুই-চারিটা কৃষ্ণকলি ও করবীর গাছ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। রোয়াকে শ্যাওলা জমিয়াছে—ঠিক যেন কে সূক্ষ্ম সবুজ মখমল দিয়া রোয়াকের গাটুকু মুড়িয়া দিয়াছে। একটা ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া ধূম বাহির হইতেছিল—সে যেন দৈন্য-পীড়িত ক্লিষ্ট জীবনেরই ঈষৎ ধূম্র-কৃষ্ণ আভাষ!

বাগানে আম-কাঁঠালের গাছ, শীর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া—প্রকাণ্ড মাকড়সার জালে তাহাদের মাথাগুলা ঘিরিয়া গিয়াছে!

দ্বারের কড়া নাড়িলাম। এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল, "কি চাই?"

আমি কহিলাম, "কেহ আছে?"

সে বলিল, "কর্ত্তাবাবু বাগানে আছেন। আসিবেন কি?"

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। নির্জ্জন পুরী। গা যেন ছম-ছম করিয়া উঠিল। দুই-চারিটা পায়রা ঝট্‌পট্ করিয়া ছাদের দিকে উড়িয়া গেল।

বাড়ীর পিছনে বাগান। বাগানের মধ্যে একটা জায়গায় খানিকটা মাটি কোপাইয়া এক বৃদ্ধ নিবিষ্ট চিত্তে কিসের বীজ বুনিতে ছিল। হাত পাঁচ-সাত দূরে বাগানের ঠিক নীচ দিয়াই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। শুভ্র জলের স্রোত,—হাসির রেখার মতই স্নিগ্ধ, নির্ম্মল।

পদশব্দে বৃদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "আপনারা কি চান ?"

আমি কহিলাম, "এই বাড়ী কি বিক্রয় হইবে ?"

একটা ঢোক গিলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ!" বলিয়াই সে থামিয়া গেল। সেটুকু আমি লক্ষ্য করিলাম, কহিলাম, "তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল,—অত্যন্ত মৃদু স্বরে কহিল, "এ বাড়ী আপনাদেব পোষাইবে না। তা ছাড়া ইহারা দাম বড় বেশী চায়। একে ত পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী,—কি-ই বা আছে! ইট-কাঠগুলা অবধি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কেন, মিথ্যা খরচ করিয়া কিনিবেন ? অন্যত্র ভাল বাড়ীর সন্ধান করুন; বিস্তর মিলিবে।"

কথাটা শেষ করিয়াই বৃদ্ধ আপনার মনে কি বকিতে বকিতে সরিয়া গেল। আমি বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্যাপার কি ?

মোড়ে একখানা মুদির দোকান ছিল। তথা হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—বৃদ্ধের দুই পুত্র; দুই জনেই কৃতী,—কলিকাতায় বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাড়ী কিনিয়া তাহারা বাস করিতে চাহে। আপাততঃ ভাড়া-বাড়ীতে থাকে। বধূ দুইটি সহুরে মেয়ে, কাজেই পাড়াগাঁয় থাকিতে চাহে না—তাই পুত্রদ্বয়কেও দেশের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে রাজী নয়—হাজার হোক, সাত পুরুষের বাস্তুভিটার মায়া ত্যাগ করা ত সহজ নহে। এখানেই

তাহার জগদ্ধাত্রী-সমা গৃহিণীকে বৃদ্ধ গঙ্গা দিয়াছে, এই গৃহেই তাহার এক পুত্র, তিন কন্যার মৃত্যু হইয়াছে—আবার এই গৃহেই তাহার পিতৃ-পিতামহ কত সমারোহে একদিন দোল-দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন,—কত কাঙ্গাল-অতিথি পাত পাতিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে দুই হাত তুলিয়া জয় গান গাহিয়া গিয়াছে। সুখ-দুঃখের অজস্র স্মৃতিতে মণ্ডিত, ধূপ-ধূনার পুণ্য গন্ধে সুরভিত, এই গৃহ, সপ্ত পুরুষের লীলাস্বর্গ—ইহার মায়া বৃদ্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। কুলাঙ্গার পুত্র দুইটা দালাল লাগাইয়া বিক্রয়ের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাপের সহিত কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বাপ এ ভিটা ছাড়িয়া কোথাও নড়িবে না! ছেলেরা দেখা করে না, খোঁজ লয় না, তবু না! এমনই তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ! বাস্তুভিটার প্রতি এতই তাহার মায়া! যে লোক কিনিতে আসে, তাহাকেই বৃদ্ধ নানা ভাংচি দিয়া সরাইয়া দেয়! ছেলেরা বোধ হয় এতটা সংবাদ রাখে না! রাখিলে সহজে বৃদ্ধকে নিষ্কৃতি দিত না।

এই বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া, দুই ছিলিম তামাকু পুড়াইয়া, সেদিনকার মত উঠিলাম। আশা-ভঙ্গে এতটুকু ক্ষোভ হইল না। বৃদ্ধের প্রতি কেমন-একটা অনুরাগ জন্মিল। গৃহে ফিরিবার জন্য যখন কলিকাতা-মুখী ষ্টীমারে চড়িলাম, তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেই ম্লানিমার মধ্যে বৃদ্ধের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব ভাব-রহস্যটুকু দীপ্ত ছটার মতই আমার অন্তরে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল।

২

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে এক বন্ধু-কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে আর একবার উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীর ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই মুদির দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মুদি তখন দোকানে ছিল না।

দোকানের সম্মুখে পথের উপর বসিয়া মুদির স্ত্রী ফুলুরী ভাজিতেছিল। পথের ধূলি উড়িয়া আসিয়া ফুলুরীর দেহ ভূষিত করিতেছিল; কিন্তু মুদিনীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুদি কোথায়?" মুখ না তুলিয়াই মুদিনী কহিল, "গন্তে গিয়াছে।"

একটি ছোকরা আসিয়া টুল পাতিয়া দিল। আমি বসিলাম; ছোকরাকে কহিলাম, "এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি।"

নিবিষ্ট চিত্তে তামাকু টানিতেছিলাম। তামাকুর ধূমের সহিত অজস্র চিন্তার জাল মাথার মধ্যে জোট পাকাইতেছিল। মুদিনীর খোলা সমানে চলিয়াছিল। এমন সময় বাজরা মাথায় মুদি দোকানে ফিরিল; আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "খবর ভাল? তা এ দিকে আগমন—?"

আমি কহিলাম, "এখানে একটি পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলাম। তা তোমাদের সে বাড়ীটার খপর কি?"

"কোন্ বাড়ী?

"ঐ, যে বাড়ী বিক্রয় হইবার কথা ছিল। বাড়ীখানি আমার বড় পছন্দমত—যদি পাওয়া যায়—"

"সে বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, "বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ? কি রকম ? তবে সে বুড়া—"

মুদি কহিল, "বুড়ার দুঃখের কথা আর কি বলিব, বাবু ? কলিকাতার এত কাছে গঙ্গার ধারে বাড়ী—উহা কি পড়িয়া থাকে ? তাহার জন্য খরিদদার আসিয়া নিত্যই ফিরিয়া যাইত। ছেলেরা খবর পাইয়া এক দিন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত। বুড়া বলে, আম-কাঁঠালের সময়টা কাটিয়া যাক্, তখন বেচিয়ো, বাপু —হাতের গাছ—তাহার ফলটা মুখে দিব না ? এমনই করিয়া তিন-চারি মাস কাটিয়া গেল। ছেলেরা বলিল, আমরা আপনার কাছে থাকিতে পারি না, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হয় না! কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে এখানে আসিবার সুবিধাও ঘটে না, ইহাতে লোকে যে আমাদেরই নিন্দা করে। আমাদের সঙ্গে আপনিও কলিকাতায় থাকিবেন, চলুন! তাহাতেও বুড়ার মন গলিল না। তাহার শুধু সেই এক কথা, পিতৃ-পুরুষের ভিটা, কি করিয়া ছাড়ি! যেখানে জন্ম লইয়াছি, সারা জীবন যেখানে কাটিয়া গেল, মৃত্যু যদি সেইখানেই ঘটে, তাহার চেয়ে ভাগ্যের কথা আর কি আছে ? বুড়ার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। নিজের হাতে কোপাইয়া, বাগানে কত শাক-সব্জীর গাছ বুনিয়াছে, উঠানের আগাছা সাফ করিয়াছে—ব্রাহ্মণ বা দেবতা

কাহারও খাতির বুড়া ইদানীং রক্ষা করে নাই—সমস্ত প্রাণ এই বাস্তু-ভিটাটির উপর ঢালিয়া রাখিয়াছিল—ছেলের অধিক মায়া, নাতির অধিক স্নেহ, দেবতার অধিক শ্রদ্ধা! বাস্তুভিটাটি বুড়ার কাছে ইষ্টদেবতারও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।"

আমি কহিলাম, "তার পর?"

মুদি কহিল, "কিন্তু সবই বৃথা হইল। ছেলেরা একদিন জোর করিয়া বাপকে নৌকায় তুলিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। তখন সবে ভোর হইয়াছে। বুড়ার সে কান্নার সুরে এখানে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘাটে গিয়া দেখি, নৌকা তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃদ্ধকে ধরিয়া ছেলেরা নৌকায় বসিয়া, আর দুই হাত তুলিয়া বুড়ার সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি! আঃ, বাড়ির উপর এমন মায়া, বাবু, আমাব ত মাথার চুল পাকিয়া গেল, এমন কখনও দেখি নাই!"

"তার পর বাড়ীর কি হইল?"

"তার এক সপ্তাহ পরেই বাড়ীখানা বিক্রয় হইয়া গেল। কলিকাতার কে-এক উকিলবাবু কিনিয়াছেন—মেরামতির পর বাড়ীর সজ্জা যাহা বাহির হইয়াছে, যেন ছবিখানি! তিনি ওখানে বাগান-বাড়ী করিয়াছেন আর কি!"

আমি উঠিলাম। সেই পোড়ো বাড়ীর দিকে চলিলাম। এ কি! এ যে মোটেই চেনা যায় না! কাঙ্গালিনীকে কে যেন রাজার রাণী সাজাইয়া তুলিয়াছে! সে ভাঙ্গা দ্বার-জানালা, সে জীর্ণ, বালি-খসা, লোনা-ধরা দেওয়াল কোথায় অদৃশ্য হইয়া

গিয়াছে। সে রাঙচিত্রের বেড়ার স্থানে তারের রেলিঙ খাড়া হইয়াছে,—তাহার পশ্চাতে বিচিত্র ক্রোটনের সারি। আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া কে যেন এই বনের মধ্যে, কোথা হইতে, এক মায়াপুরী উপড়াইয়া আনিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, সম্মুখের সে নোড়-নিমের শুষ্ক গাছ, কোথায়ই বা সে কালকাসুন্দার ঘন ঝোপ!

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল—তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ। তাহারই অস্পষ্ট আলোক-রশ্মি নিম্নে মর্ত্ত্য-তলে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে আমি দেখিলাম, সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের জায়গায় প্রকাণ্ড গেট বসিয়াছে! গেটের পথে লাল কাঁকর পড়িয়াছে। সেই পথের দুই ধারে হাস্নুহানা ও বেল-জুঁইয়ের অসংখ্য গাছ। তাহাতে অজস্র ফুল ফুটিয়া গন্ধে চারিধার মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। বাহ্য চেতনা যেন লুপ্ত হইল।

সহসা সাড় হইলে ভাল করিয়া গৃহের পানে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। অদূরে কক্ষে তখন আলো জ্বালা হইয়াছে! খোলা জানালার মধ্য দিয়া পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তরের ঈষৎ আভাব পাওয়া যাইতেছিল! গঙ্গা-বক্ষও অস্পষ্ট চোখে পড়ে। চাঁদের আলো পড়িয়া গঙ্গার মৃদু তরঙ্গে যেন রূপালি বিদ্যুৎ খেলিতেছিল! ক্রমে ভিতরে পিয়ানো-ক্লারিয়োনেটে সুর উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশীল নূপুরের মিষ্ট মধুর ঝঙ্কার ও নারী-কণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা ঝরিয়া পড়িল!

আমার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। একটু সরিয়া আসিয়া একটা ইষ্টক-স্তূপের উপর আমি বসিয়া পড়িলাম। সেখানেও সেই নূপুর-গীত-বাদ্যের মিশ্র নিক্কণ ভাসিয়া আসিতে ছিল! সে সুরে যেন উগ্র বিষ উগারিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষস্থ বাতির ঝাড়ের আলোক-রশ্মি গাছের ফাঁক দিয়া পথে দুই-চারি টুকরা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মনে হইল, সে যেন প্রলয়-দাহেরই বহ্নি-শিখা! মাথাটা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! এই সে বুড়ার বাস্তুভিটা,—বুড়ার বুক-ফাটা অশ্রু আজও যথায় সঞ্চিত রহিয়াছে! উৎসব-ব্যসনের হর্ষ-ব্যথা যথায় শত চরণ-চিহ্ন পাত করিয়া গিয়াছে, সপ্ত পুরুষের হৃদয় হইতে যথায় স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রেম ও আতিথেয়তার সহস্র সুবর্ণ ধারা ঝরিয়া মরিয়াছে, আজও যাহার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—এই সেই বাগান, সেই উঠান, সেই ঘর! আজ তথায় বিলাস-লীলার দিব্য অভিনয় জমিয়া উঠিয়াছে। সেই সুখ-দুঃখের স্মৃতির উপর লালসা আজ তাহার চপল চরণে বিকট নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

আমার চেতনা যেন লুপ্ত হইল। আবার তখনই মানস-নয়নের সম্মুখে কলিকাতার অন্ধকার-গলির-মধ্যকার একটা স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীর শোচনীয় দৃশ্য নিমেষে জাগিয়া উঠিল। যেন স্পষ্ট দেখিলাম, সেই গৃহে ছোট একটি টুলের উপর এই পোড়ো বাড়ীর অধিকারী, সেই বেচারা বৃদ্ধ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া

বসিয়া আছে—নীরব বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চোখের জলে শীর্ণ হাত দুইটি ভিজিয়া উঠিয়াছে।

দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিলাম। মাথার উপর বিরাট নীল স্তব্ধ আকাশ। সেই আকাশে বসিয়া নক্ষত্রগুলা নীরবে শুধু অজস্র অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেছিল।

সহসা পার্শ্বে সজিনা গাছেব ডাল হইতে একটা পাখী ফুকারিয়া গাহিয়া উঠিল, "চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!"

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

বৃদ্ধ বয়সে পত্নী হারাইয়া বামনদাস একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ বয়সের এ দুঃখের মর্ম্ম, অর্ব্বাচীন পুত্রগণ বুঝিল না, তাই যখন তাহারা তিন-চারি দিন ধরিয়া ঈশান ঘটককে ক্রমাগত গৃহে আসিতে এবং পিতাব সহিত গোপনে পরামর্শ আঁটিতে দেখিল, তখন অন্তরালে তাহারা ঈশানকে এমন শাসাইয়া দিল যে, অতঃপর ঈশান আর বামনদাসের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিল না।

সেদিন বদমায়েস প্রজা নিতাই প্রামাণিকের নিকট হইতে বহুদিনকার পড়ো খাজনা আদায়ের জন্য বামনদাস যখন স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া ছেঁড়া চটি ফটর-ফটর করিতে করিতে বাহির হইল, তখন চৌধুরীদের বাগানের প্রকাণ্ড তালগাছটার পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। গাঙ্গুলিদের পুষ্করিণীর পার্শ্বে যে অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহারই সম্মুখে বামনদাস ঈশানের সাক্ষাৎ পাইল।

ঈষৎ হাসিয়া বামনদাস কহিল, "কি হে ঈশেন, ও দিকে আর যাও-টাও না যে?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, যাব কি? ও বাড়ীতে মাথা গলালে রক্ষা আছে! আপনার ছেলেরা আমার পা ভেঙ্গে দেবে, বলেছে!"

বামনদাস কহিল, "যত-সব কুলাঙ্গার জুটেছে! তা আমি যখন আছি, কেমন পা ভাঙ্গে, দেখি না!"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, পা ভাঙ্গলে পর তখন দেখা-দেখিতে বিশেষ এসে যাবে না—তবে দুঃখ হচ্ছিল, আপনার জন্য—শরীরটা ক্রমেই যেন ভেঙ্গে পড়ছে—যত্ন-আত্তি করছেন না, বুঝি মোটে!"

বামনদাস ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমিও যেমন! নিজের শরীরে আর কে কবে যত্ন করে থাকে, ঈশেন? গিন্নি কি তোয়াজেই রাখতেন! ছেলে-পিলেরা কি কিছু বোঝে, না দেখে? নিজেদেব নিয়েই সব চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত আছে!"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, ঘোর কলি তবে আর বলেছে, কেন? মোদ্দা, এমন অযত্ন করলে শরীর আর ক'দিন টিঁকবে?"

"আর টিঁকেই বা লাভ কি, বল—এ শুধু হাল-ভাঙ্গা নৌকা-খানা বান্-চাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বই ত না!" বলিয়া বামনদাস সহানুভূতি-লাভের আশায় একটা হতাশা-মিশ্রিত হাসি হাসিল।

ঈশান কহিল, "বলেন কি, মশায়? আপনারা আছেন, তবু পর্ব্বতের আড়ালে আছি! তা একটা বিয়ে-থা করে—"

"ঐ বিষয়েই ত তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে চাই, ঈশেন! একটি বিয়ে না করলে ত আর চলে না! সে যেমন আমাকে বুঝবে, চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে, এমন কি ছেলে-মেয়েরা পারে?"

"বটেই ত! বলে, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! তা, হায়, হায়, ভারী একটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল!"

"কেন, কেন?"

"আজ্ঞে, ঐ ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর এক শালী ছিল! চমৎকার মেয়ে, মশায়, যেন দুর্গাঠাকরুণটি! আর বয়স? বলব কি মশায়, আপনার সঙ্গে দিব্যি মানাত!"

"আহাহা! ঐ অমনটি হলেই ভাল হয়—হাজার হোক, আমারও যেমন কিছু বয়স হয়েছে—এখন কি আর কচি মেয়ে এনে তাকে মানুষ করা পোষায়! তা ছাড়া বুঝেছ, আমি কেমনটি চাই?—এই দুদিনে আমাকে বুঝে নিতে পারে—আফিমটুকু ঠিক করে রাখলে, দুটো পান ছেঁচে দিলে, একটু গা-হাত-পা টিপে দিলে! ধর, দু'ছিলিম তামাক—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ও আর আমাকে বলতে হবে না—অর্থাৎ আপনি চান, এসেই একেবারে নিজের দখলটুকু বাগিয়ে ঠিক করে নিতে পারে।"

"এই! এই! তুমি একটু দেখে-শুনে লাগো, দাদা—তোমায় বিশেষ-রকম পরিতোষ করব।"

ঈশান একটু মাথা হেলাইয়া আকাশের পানে চাহিল; পরে কহিল, "কিন্তু মশায়, আমার একটি মিনতি আছে—আপনার বাড়ীতে আমি যেতে পারব না! যে সব ছেলে, আপনি বিবাহ করলে ছেলে-পিলেও ত হবে, তারা বিষয়ের বখরা পাবে কি না, কাজেই এরা রেগে টং হয়ে আছে! বিয়ের কথা শুনলেই আমার

পিঠে লাঠি হাঁকড়াবে! অথচ বাপের বিয়ে দেওয়াটা কত দরকার, তা বুঝবে না! এই বুড়ো বয়সে সেবা-যত্ন করে কে? তার জন্যও ত—কি বলেন, আপনি?"

বামনদাস কহিল, "কুপুত্র! কুপুত্র!" স্বরে ঈষৎ ভীতির আভাস জাগিয়া উঠিল। একট কাশিয়া কহিল, "কিছু ভেবো না, দাদা—"

ঈশান কহিল, "না মশায়, আপনার বাড়ীতে যেতে পারব না, পথে-ঘাটেই এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।"

বামনদাস কহিল, "তুমি একটু উঠে-পড়ে লাগো, দাদা—আবার সামনে ভাদ্র মাস আসছে, তিন মাস আর ও পাট হবে না! তুমি মনে করলেই সব হবে! বুঝেছো দাদা, এ ত গিন্নি মরেন নি, আমাকেই মেরে গেছেন!"

"বটেই ত, বটেই ত! তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যখন ঈশেন কথা দিয়েছে, তখন আর তার নড়চড় হচ্ছে না, এই বলে রাখলুম!"

"বেঁচে থাকো, দাদা,—চিরজীবী হও!"

ঈশান চলিয়া গেল। বামনদাস দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ঈশানের দিকে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টির অন্তরালে গেলে বৃদ্ধ নিতাই প্রামাণিকের উদ্দেশ্যে চলিল।

ইহার পর ঘোষেদের বাগানে, মিত্রদের বাড়ীর পাশে, গ্রামের বাবা-ঠাকুরতলায় ও ঈশানের ঘরে পরামর্শাদি এমন সবেগে চলিতে লাগিল যে, ব্যাপারটা ক্রমে পুত্রগণের কাছে আর অগোচর রহিল

না। বুঝিয়া তাহারা হঠাৎ এমন ভাব ধারণ করিল যে, বাধ্য হইয়া অবশেষে কলিকাতায় কালী-দর্শনের নাম করিয়া বামনদাস একদিন গৃহ ত্যাগ করিল। ঈশান আসিয়া ষ্টেশনে তাহার সহিত যোগ দিল। এবং উভয়ে মিলিয়া কলিকাতায় আসিল।

২

কলিকাতার বৈঠকখানা-বাজারে এক মেসে আসিয়া দুইজনে তাহার একটি কক্ষ অধিকার করিল। ঈশান সারাদিন ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ঈডেন গার্ডেনে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে পাত্রীরও সন্ধান করে। বৃদ্ধ বামনদাস সারাদিন তামাকু ঢালিয়া, সাজিয়া, টানিয়া, ঈশানের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। মেসের সম্মুখ দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া যায়, মাতাল হল্লা করে, দপ্তরীরা বই বাঁধে, বর্ষার জলে কলিকাতার রাস্তা নদীর আকার ধারণ করে, পাড়ার ছেলেরা সেই জলে কলার ভেলা ভাসায়, ঘরে বসিয়া জানালার মধ্য দিয়া বৃদ্ধ তাহাই দেখে। এমন করিয়াই দিনগুলা কাটিয়া যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় শশব্যস্তে ঈশান আসিয়া কহিল, "দাদা ঠাকুর!"

"কেন, দাদা?"

ঈশান আবেগের সহিত কহিল, "চট্ করে পিরাণটা গায়ে তুলে একখানা চাদর ঘাড়ে কর। কিনারা হয়েছে! এখনই যেতে হবে, পাত্রী আশীর্ব্বাদ করতে,—সেই ভবানীপুরে!"

বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে কহিল, "পাত্রী? কার—?"

ঈশান চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কার আবার, আপনার! বলেছি, ঈশেন যখন মনে করেছে, তখন ফস্কাবার জো কি! পাত্রীটি সুন্দরী, কুলীনের মেয়ে! বাপের তেমন পয়সার জোর নেই, এই আঠারোয় পা দিয়েছে—যেন আস্ত পরী গো দাদা ঠাকুর, আস্ত পরী।"

সাজ-সজ্জা করিয়া বৃদ্ধ পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিতে চলিল। পাত্রীটি সত্যই সুন্দরী! বিবাহের দিন স্থির হইল, ২৭এ শ্রাবণ। তার পূর্ব্বে ভালো দিন নাই।

কলিকাতার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। পাত্রী দেখা-শুনায় বিলম্বও হইয়া পড়িল—ট্রাম-চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অগত্যা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিতে হইল।

গাড়ীতে বসিয়া বামনদাসের তন্দ্রা আসিতেছিল—তন্দ্রার ঘোরে সে কত বিচিত্র-মধুর স্বপ্ন দেখিল। যেন অগাধ সমুদ্রে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কূল-কিনারা কিছুই দেখা যায় না! তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—বুঝি, জীবনের আশা ফুরাইল, —এমন সময় আলোকচ্ছটায় চাবিধার ভরিয়া গেল—বৃদ্ধ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, এক পরী উড়িয়া আসিতেছে! তাহারই পানে সে আসিতেছে! সীমন্তে তাহার সিন্দুরের জায়গায় একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—মাথায় এক রাশি আলোকের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—পরী তাহাকে উঠাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে,—পরীর কোমল সুন্দর হাতখানি ধরিয়া সে যেমন জল ছাড়িয়া উঠিবে, অমনই কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল,

আকাশের বুক চিরিয়া তীব্র আগুনের রেখা ছুটিয়া গেল! একটা তরঙ্গ আসিয়া সজোরে তাহার মাথায় ঘা দিল—মাথা কাঁপিয়া উঠিল! তন্দ্রা ভাঙ্গিলে বৃদ্ধ দেখিল, গাড়ীর কাঠে মাথাটা বিষম ঠুকিয়া গিয়াছে।

চেতনা-সঞ্চারে কিন্তু একটা কথা মেঘ-গর্জ্জনের মতই বৃদ্ধের বুকের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। পাত্রী দেখিবার সময় এক রমণী পাশের ঘর হইতে বলিতেছিল, "বাহাত্তুরে বুড়ো—এখনও বিয়ের সখ যায় নি! ও বুড়ো মিন্সে বরের বাপ, না ঠাকুর্দ্দা!"

আর একজন কহিল, "না গো, ঐ বর!"

সঙ্গিনী উত্তর দিয়াছিল, "মরণ আর কি! এমন মেয়েটাকে ঐ বুড়োর হাতে দেবে—তার চেয়ে থুবড়ো করে রাখলে না, কেন!"

এই কথাটাই বার বার বৃদ্ধের মনে ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

গাত্র-হরিদ্রার দিন অপরাহ্নে ঈশান আসিয়া বলিল, "একটু মুস্কিল হয়েছে।" বামনদাসের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সে কহিল, "কেন? কি মুস্কিল?"

ঈশান কহিল, "ওরা বলছিল, বিয়ে ত আমরা দেব—কিন্তু এর পর—জামাইয়ের ত বয়স হয়েছে—যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়, তখন আমাদের রাইমণি কোথায় দাঁড়াবে? ছেলেরা মার-ধোর করে যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তখন ওর উপায় কি হবে?"

একটা ঢোক গিলিয়া বামনদাস কহিল, "তাই ত ঈশেন—

শুভকাযের সময় এ'ত মহাবিভ্রাট দেখছি! ভালোয় ভালোয় এখন—"

ঈশান কহিল, "মেয়ের মা অত-শত কিছু বলেনি—মেয়ের এক মামা আছে, হুগলির আদালতে সে মোক্তারি করে—সেই আজ এসে এই ফ্যাসাদ বাধালে। আর বিশেষ আপনার ছেলেগুলিও কিছু সত্যি শান্ত-শিষ্ট নয় ত!"

বামনদাস কহিল, "তাই ত! তা হলে এখন কি উপায় করা যায়, ঈশেন? তুমিই বল, দাদা। আমার ত শুনে আর হাত-পা আসছে না! আহা, এই দুটো দিন ভালোয় ভালোয় কোন মতে কেটে গেলে মার পুজো দিয়ে আসি যে, আমি—"

ঈশান কহিল, "তা দেখুন, এক উপায় আছে! আমি ত আপনার মতের উপর নির্ভর না করেই এক কথা বলে এসেছি— সে মামার যা রোখ, বলে, এর একটা নির্ণয় না হলে বিবাহ হতেই পারে না—বলে, তার এক কে কুটুম্ব আছে, কালনায় বাড়ী—সে-ও এক পয়সা না নিয়ে বিয়ে করতে রাজী আছে—তার বয়স আপনার চেয়েও না কি ঢের কম! তা ছাড়া তার ছেলে নেই, দুটি মেয়ে, তারও আবার একটির বিয়ে হয়ে গেছে—"

বামনদাস মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িল, কহিল, "তাই ত—তা তুমি কি বলেছ?"

ঈশান কহিল, "দেখুন কর্ত্তা, চাল চালতে যে ঈশেন হঠবে, এমন ঈশেন আমি নই। আমি অমনি বললুম, 'সে কি কথা—কর্ত্তা ত দেশে ছেলেদের ত্যজ্যপুত্র করে এসেছেন—তারা ওঁকে দেখে না,

শোনে না—তাই না বিবাহ করছেন! না হলে ত ওঁর বিবাহে ইচ্ছাই ছিল না! তা বিবাহ যখন কচ্ছেনই, তখন স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা আর করবেন না?' তাই আমি ত এক কথা বলে ফেলেছি—"

বামনদাস কহিল, "কি কথা, ঈশেন?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, আমি বলেছি, বিয়ের রাত্রে লেখাপড়ার কাগজ ঠিক করে রাখবেন · কর্ত্তা একখানা দান-পত্র করে আপনাদের মেয়ের নামে সমস্ত বিষয়-কড়ি লিখে দেবেন। পরের দিন সেটা না হয় রেজেষ্ট্রী করিয়ে নেবেন। এই ত কর্ত্তা, আমি বলে এসেছি, আর এ কথা না বললে কিন্তু বিয়ে তখনই ভেঙ্গে যাচ্ছিল!"

বামনদাস কহিল, "বাঃ, বেশ বলেছ, খাসা কথা। আর কি জান, ঈশেন, আমিও তাই ভাবছিলুম—বিয়ে করে যদি একে নিয়ে বাড়ী ফিরি, তা হলে ত ছেলেগুলো তিষ্ঠুতে দেবে না। তাই আমার ইচ্ছা, এখানেই একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকব।"

ঈশান কহিল, "আরও এক কথা। ওঁরা বলে দিয়েছেন, বিবাহ কলকাতায় হবে না। মেয়ের মামার বাড়ী রিষড়েয়—এখানে লোকজন আনতে খরচ আছে, তাই দেশেতে কাজ হয়, মেয়ের মামার সেইরকম ইচ্ছা!"

"তা, তা বেশ, এতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

ঈশান কহিল, "তা হলে গোটাকতক টাকা এখনই দিতে হচ্ছে। টোপর, চেলির কাপড়, এ-সবগুলো কিনে আনতে হবে ত। সেদিন লগ্ন হল'গে রাত একটার পর। তা তিনটে

অবধি সময় আছে। আমরা পৌনে দশটার গাড়ীতে বেরুবো, তা হলেই হবে।"

বামনদাস ঈশানের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তোমার উপরই সমস্ত ভার। তুমিই হলে এখন কর্ম্ম-কর্ত্তা। যা ভালো বুঝবে, করবে,—পয়সা-কড়ি সব তোমাব কাছেই দিচ্ছি, যাকে যা দিতে হয়, যা খরচ-পত্র দবকার মনে কর, সব তুমি কর। আমার জন্য দেশের কাজ-কর্ম্ম ফেলে যে-রকম কবে তুমি বসে আছ, তাতে তোমার ঋণ কোন কালে কি শোধ দিতে পারব? আব-জন্মে তুমি আমার যে কে ছিলে, তা বলতে পারি না! ভগবান তোমার ভালো করুন, দাদা!"

৪

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর মাথায় ট্রাঙ্ক চাপাইয়া বামনদাস ও ঈশান হাবড়া ষ্টেশনে আসিল। বামনদাসের পরিধানে থান-ধুতি। চেলি পবিয়া ষ্টেশনে আসিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তবে গায়ে গরদের কোট ছিল, গলায় কোটের নীচে ফুলের মালা!

হাবড়া ষ্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য! চারিধারে আলো, চীৎকার, গোলমাল! বৃদ্ধ বামনদাসের মনে হইতেছিল, যেন তাহার বিবাহের জন্যই চারিধারে আজ মহা ধূম বাধিয়া গিয়াছে।

ঈশান তাহাকে হুইলারের বুক-ষ্টলের নিকট আনিয়া বসাইয়া বলিল, "আপনি এখানে বসুন। আমি টিকিট কিনে আনি,—উঠবেন না, যেন!"

বামনদাস কহিল, "বেশ দাদা, কিন্তু তুমি শীঘ্র এস, ট্রেন যেন না ফেল হয়ে যাই।" কথাটা ভাবিতেও বৃদ্ধের বুক কাঁপিতেছিল।

বৃদ্ধ বসিয়া ভাবিতেছিল, ভবিষ্যতের সুখের কথা! একটি নোলোক-পরা কচি মুখের মধুব হাসি, চুড়ি-বালা-ভরা দুইখানি কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ, আর অলক্ত-রঞ্জিত দুইখানি চবণে মলের রুনু-ঝুনু সঙ্গীত! শুষ্ক বৃক্ষ পত্র-পল্লবে আবার সাজিয়া উঠিবে। নবোঢ়ার সে কত আদর-আবদার—ভাবিয়া বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। বামনদাস আরও ভাবিতেছিল, মাথার চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে! তাহাতে কি আসিয়া যায়? প্রাণটার মধ্যে রসের নির্ঝর এখনও শুকায় নাই ত! পাকা চুল, কলপ লাগাইলেই কালো হইয়া যাইবে—আর দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে কতক্ষণ! মনে একটা অনুতাপ জাগিয়া উঠিল,—এই দুই দিনে যদি সুবিধা করিয়া দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে পারিতাম, চুলগুলার রং বদলাইয়া ফেলিতাম!

টিকিট কিনিতে গিয়া ঈশান এক গোলে পড়িল। অত্যধিক বুদ্ধি খেলাইতে গিয়া এক টিকিট-কলেক্টররের হস্তে পড়িয়া সে বিষম নিগ্রহ ভোগ করিল। কোন মতে হাতে-পায়ে ধরিয়া পুলিশের হাত এড়াইয়া সে টিকিট কিনিতে ছুটিল।

ঈশানের বিলম্ব দেখিয়া বৃদ্ধ এদিকে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল—তখন বাঁশী বাজাইয়া আরও দুই-চারিখানা ট্রেন ছাড়িতেছিল—আসিতেছিল। অসীম-উত্তাল জন-প্রবাহ দেখিয়া বৃদ্ধ আকুল

হইয়া উঠিল—যদি ঈশান তাহাকে ডাকিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে! চারি ধার হইতে ছুটিয়া লোক ট্রেন ধরিতে চলিয়াছে। বৃদ্ধের মন ধৈর্য্য মানিল না, অশান্ত হইয়া উঠিল।

একটা কুলি আসিয়া কহিল, "মোট লেগা নেহি বুড়া বাবু? টৈম্ তো হো গিয়া, ট্রেন আভি ছুট্ যায়গা!" কথাটা বৃদ্ধ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, এটুকু বুঝিল যে, ট্রেণে উঠিবার সময় হইয়াছে, আব বিলম্ব করা চলে না! তাই দ্বিধামাত্র না করিয়া কুলির মস্তকে মোট চাপাইয়া ক্ষিপ্র গতিতে ছুটিয়া সে একেবারে ট্রেনে আসিয়া চাপিল; কোন মতে স্থান সংগ্রহ করিয়া ঈশানের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। ট্রেনও যথাসময়ে বংশীধ্বনি করিয়া প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া অন্ধকারে ছুট দিল।

বামনদাসের প্রথমটা তত ভাবনা হয় নাই—সে ভাবিল, রিষড়ায় নামিয়া ঈশানকে খুঁজিয়া লইলেই চলিবে! তাই পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে কহিল, "মশায়, রিষড়ে ষ্টেশনে অনুগ্রহ করে আমায় নামিয়ে দেবেন ত।"

ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে কহিলেন, "রিষড়ে? আপনি রিষেড়য় যাবেন না কি?"

"আজ্ঞে, হাঁ!"

"করেছেন কি, আপনি! এ যে পঞ্জাব মেল—এ গাড়ী ত রিষড়েয় দাঁড়াবে না!"

"তবে—" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি হবে? কোথায় নামব তবে?"

"আর কোথায় নামবেন! একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে গাড়ী থামবে! তার আগে আর নামবার কোন উপায়ই নেই!"

বর্দ্ধমান! বৃদ্ধের ধারণা ছিল, বর্দ্ধমান-সহর প্রয়াগের নিকটে! সে ত বহু দূর! সর্ব্বনাশ! তবে এখন উপায়? একবার মনে হইল, চলন্ত ট্রেন হইতে সে লাফাইয়া পড়ে। ঈশানের উপর রাগ হইল—সে তাহাকে অমন করিয়া বসাইয়া রাখিয়া শেষে একেবারে মজাইল! হতভাগা, বদমায়েস! বামনদাসের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

বাবুটি কহিলেন, "আপনি বুঝি হাবড়া ষ্টেশনে এর আগে কখনও আসেন নি? কলকাতাতেও থাকেন না?"

বামনদাস কহিল "আজ্ঞে, না।"

বাবুটি কহিলেন, "কাউকে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীতে উঠতে হয়। ছ্যা, ছ্যা, করেছেন কি? কুলি বেটাও কি জানত না, আপনি কোথায় যাবেন!"

আর একটি ভদ্রলোক চশমা চোখে দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। চশমার উপর দিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি কহিলেন, "আর এই হাবড়া ষ্টেশনটা এমনও হয়েছে মশায় যে, লোকাল ট্রেনগুলো কোন প্লাটফর্ম্ম থেকে ছাড়বে,—যাদের রীতিমত ট্রাভেল্ করা অভ্যাস নেই, তারা স্থির করতেই পারে না। ঠিক করতে গিয়েই সব অনেক সময় ট্রেন ফেল করে বসে।"

বামনদাসের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন ছোট একটা কৃষ্ণ বিম্বে

পরিণত হইল। নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সে দিশা-হারা হইয়া পড়িল। ট্রেন তখন দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে—মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ষ্টেশনগুলা ক্ষীণ আলোক লইয়া বাহিরের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মত ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বামনদাস ভাবিতেছিল, উপায় নাই, উপায় নাই—বিবাহের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল! হারে বামনদাস, হায় রাইমণি!

ট্রেন আসিয়া বর্দ্ধমানে থামিল। বাবুর দল বৃদ্ধকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া কহিলেন "ষ্টেশনে যান। গিয়ে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলুন। তারপর ও-দিক্‌কার ট্রেন এলে ওরা তাইতে করে আপনাকে রিষড়েয় পাঠিয়ে দেবে'খন।"

একজন বলিল, "ছ-সাত ঘণ্টা পরেই ট্রেন পাবেন! ভাবনা কি?"

বামনদাস হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিল, ছয়-সাত ঘণ্টা পরে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে—ঠিক ভোরে সেখানা রিষড়া পৌঁছিবে। শুনিয়া হতাশভাবে বামনদাস বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে বিবাহ-বাটীর ছবিখানা জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। শাঁক বাজিতেছে—হুলুধ্বনি হইতেছে—চারিধারে লোকজন ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! চেলির কাপড়-পরা, সিঁথি-ময়ুর-মাথায় অবগুণ্ঠিতা বধূ পিঁড়ির উপর মাটির পুতুলটার মত বসিয়া আছে। বিষম গোল বাধিয়াছে,—বর কোথায়? নাই, নাই—! বেচারা বর বর্দ্ধমান ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে পড়িয়া আছে!

৫

ভোরে আসিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন রিষড়া ষ্টেশনে থামিতেই শশব্যস্তে বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিল। সারা রাত্রি জাগিয়া কোটর-গত চক্ষু যেন আরও কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নামিয়াই সে দেখে, ঈশান দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিয়াছে। বৃদ্ধের মৃত দেহে যেন নব প্রাণ সঞ্চারিত হইল। বৃদ্ধ ডাকিল, "ঈশেন!"

ঈশান চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "কে? কর্ত্তা না কি! এ কি! কোথায় ছিলেন, সারা রাত?"

"বর্দ্ধমানে!" বামনদাসের চোখে জল আসিল।

তখন বাহিরে গিয়া বৃদ্ধ সকল কথা—দুর্দ্দশার আমূল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল! ঈশান বলিল, "বেশ—আমি টিকিট নিয়ে এসে দেখি, আপনি নেই! চারিধারে চেঁচিয়ে খুঁজে বেড়ালুম—তা কোথায় কে! ট্রেনে উঠলুম—খুঁজে আপনার সাড়া পেলুম না! ভাবলুম, বুঝি কোথায় বসেছেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন! রিষড়ে ষ্টেশনেও খুঁজে পেলুম না—আরও দু-একখানা ট্রেন অপেক্ষা করলুম—আপনাকে পেলুম না! তখন এঁদের বাড়ীর দিকে চললুম! পথই কি ছাই, চিনি! একে জিজ্ঞাসা করে, তাকে ধরে কোন মতে ত পৌছুনো গেল! আপনার কথা তুলতেই সব অবাক! আমাকে 'জোচ্চোর' বলে ত তেড়ে উঠল। বলে, "মেয়ের গায়ে হলুদ দিইয়ে জাত নষ্ট করা? বেটা—! কোথাকার এক ঘাটের মড়া ধরে এনে বর খাড়া করা—' আমি ত কর্ত্তা, গতিক বুঝে চম্পট দিলুম। তারপর টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি সুরু হল। না

রাম না গঙ্গা বলে সটান্ ভিজে আমি ষ্টেশনে এলুম! সারা রাত ষ্টেশনে পড়ে বৃষ্টির ঝাট আর মশার কামড় সহ্য করে, মশায়, সকালের ট্রেনে বাসায় ফিরছিলুম, এমন সময় আপনি ডাকলেন—"

বামনদাস কহিল, "অদৃষ্টের ভোগ সব, দাদা! এখন একবার চল,—খপরটা নেওয়া যাক্! সে মেয়ের বিয়ে হল কি না!"

"হ্যাঁঃ, সেই বাদ্‌লার রাতে বর জোগাড় করা সহজ ব্যাপার কি না! তা হলে আর বিয়ে এদ্দিন আপনার জন্য পড়ে থাকে? বর ত আব দোকানের মুড়ি নয় যে, খোলায় চাট্টি চাল ফেলে ভেজে নিলেই হল!"

ষ্টেশনে গাড়ী ছিল না। বামনদাস একখানা পাল্কীতে চড়িয়া বসিল, ঈশান পদব্রজে চলিল।

পাত্রী-পক্ষের বাড়ীর-কাছাকাছি রাস্তা দিয়া দুইজন লোক যাইতেছিল। ঈশান শুনিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে, "সেই রাত্রে মেয়েটার কি সর্ব্বনাশই না হচ্ছিল! ভাগ্যে গাঙ্গুলির ভাগনেটিকে পাওয়া গেল—নৈলে বুড়ো বর বেটা ত আচ্ছা নাকাল করেছিল। যা হোক, জাতটা রইল।"

আর-একজন বলিল, "শুধু তাই? মেয়েটারও গতি হল! নইলে সে বুড়ো বেটার হাতে দেওয়াও যা, চুলির মধ্যে ফেলে দেওয়াও তাই!"

ঈশান ভাবিল, কথাটা ত ভালো নয়। কিন্তু কথাটা সে শুনিয়া চাপিয়া গেল।

এমন সময় অদূরে শঙ্খ-নাদ শুনা গেল।

বামনদাস কহিল, "ও কি ঈশেন, শাঁক বাজে যে! ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, বড় সুবিধের বলে ত মনে হচ্ছে না!"

"কাউকে জিজ্ঞাসা কর, দেখি!"

একটি বালক খাবার-হস্তে দোকান হইতে ফিরিতেছিল। ঈশান তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও শাঁখ বাজে কোথায়, জানো?"

বালক কহিল, "কাল রাত্রে গাঙ্গুলিদের ভাগনের সঙ্গে ওদের রাইমণির বিয়ে হয়ে গেছে! এখন বর-কনে বিদেয় হবে, বরণ হচ্ছে কি না—" বালক চলিয়া গেল।

বামনদাস ডাকিল, "ও ঈশেন, এখন উপায়? এ বলে কি?"

ঈশান কহিল, "পাল্কী ফেরানো যাক, ষ্টেশনের দিকে! ভাবনা কি, কর্ত্তা,—ঈশেন ঘটক বেঁচে থাকুক্—শ্রাবণে হল না, অগ্রাণের প্রথম তারিখেই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটিয়ে দেব।"

বেহারার দল ষ্টেশনের দিকে পাল্কী ফিরাইল। বামনদাস পাল্কীর মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! বিবাহ-বাটী হইতে শঙ্খের সঘন নিনাদ মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া নিস্তব্ধ পল্লী-বক্ষ চকিত, মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। এবং গত রাত্রের দুই-একটা অতৃপ্ত পথের কুক্কুর নিষ্ফল আক্রোশে থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

কাহাকে

রাজার ফুল-বাগানের পাশ দিয়া ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে। বাগানে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর রাজ-কবি মিহির বসিয়াছিল।

নিশান্তে সবে-মাত্র তখন উষার ললাটিকায় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল! সারা আকাশে কে যেন একটা সূক্ষ্ম নীল রঙ্গের তুলি বুলাইয়া দিয়াছে! ফুটন্ত সহস্র ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কবি তন্ময়ভাবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিল, কোলের কাছে মলিন বীণখানি শ্রান্ত শিশুর মতই যেন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িয়া ছিল।

সহসা নদীর তটে বাজিয়া উঠিল,—রুণু-ঝুনু-ঝুন! কবির চমক ভাঙ্গিল। উঠিয়া কবি নদীর পানে চাহিল। জলের ঢেউ অত্যন্ত মৃদু ভঙ্গীতে তটের মূলে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। যেন কি করুণ সুরে তটের কানে সে নিশীথের প্রতীক্ষার কাহিনী শুনাইতেছিল।

নূপুর বাজিতেছিল, রুণু-ঝুনু-ঝুন! কবি দেখে, রাজসভার নবীনা কিশোরী নর্ত্তকী একাকিনী স্নানের জন্য জলে নামিতেছে।

পরণে একখানি চাঁপার-বরণ সূক্ষ্ম বস্ত্র, তাহার জরি-রেখাঙ্কিত অঞ্চলটি উষার স্নিগ্ধ সমীরে উড়িতেছে। স্কন্ধে নটকান-রাঙা গাত্র-মার্জ্জনী! রূপে দিক আলো করিয়া নর্ত্তকী ধীরে ধীরে

জলে নামিতেছিল। যেন উষা-রাণী প্রভাতের আগমন বুঝিয়া অত্যন্ত সন্তর্পিত ধীর ললিত গতিতে জল-শয়নে বিরাম লইতে চলিয়াছে।

কবি বিস্মিত হইল, নর্ত্তকীর দেহে এত রূপ, এমন লাবণ্য! একটা টগর ঝাড়ের অন্তরালে আসিয়া কবি দাঁড়াইল, নির্ণিমেষ নয়নে জলেব পানে চাহিয়া রহিল। ওপারের কুয়াশা তখন ধীরে ধীরে ঝরিয়া উবিয়া যাইতেছিল।

নর্ত্তকী জলে নামিয়া গাত্র-বস্ত্র নামাইয়া ফেলিল। জলেব গা বেড়িয়া একটা তরল সোণালী আভা খেলিয়া গেল। পলক-হীন মুগ্ধ নেত্রে কবি রূপসীব পানে চাহিয়া রহিল। যৌবন তাহার নিপুণ হস্তে ভাণ্ডারের সকল বর্ণ-সুষমায় নর্ত্তকীর দেহ অপরূপ সাজাইয়া দিয়াছে। নিটোল মাধুর্য্যে সারা অবয়ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুকুমাব সূক্ষ্ম তনুখানি ঘিরিয়া জলের মৃদু তরঙ্গ অপূর্ব্ব হিল্লোল তুলিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল! রূপসী আপন-মনে গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিল,—হাতের কিঙ্কিনী তালে তালে বাজিতেছিল, টুঙ্-টাঙ্-টিঙ্! মুগ্ধ চিত্তে কবি ভাবিল, এই তাহারি মানসী-বধূ! ইহারই জন্য এতদিন ধরিয়া যেন তাহার প্রাণের যত ভাব বিচিত্রছন্দে ফাটিয়া পড়িয়াছে—ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার প্রাণের লক্ষ বাসনা-কামনা নিত্য নব সঙ্গীতে মুখর হইয়াছে! এই তাহার সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের বঁধূ!

কবির চেতনা লুপ্ত হইল। ধীরে ধীরে কখন যে সে টগরের ঝাড় ঠেলিয়া একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে,

তাহা কবির খেয়ালেও আসে নাই! যখন চেতনা হইল, তখন শুধু কবির চোখে পড়িল, সেই বিম্ব-ওষ্ঠে সলজ্জ ঈষৎ হাসির কণা! চোখের দৃষ্টিতে মৃদু ভৎর্সনার রেখা! ঠিক যেন বর্ষা-প্রভাতে মেঘ ও রৌদ্রের চকিত ক্রীড়া!

কবি অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া আসিল; নিস্পন্দ চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। স্নান শেষ করিয়া নর্ত্তকী ছায়ায়-ঘেরা নির্জ্জন পথে গৃহে ফিরিয়া গেল। কবির কানে একটি রাগিণীর রেশ বহু ক্ষণ ধরিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল, রুণু্-ঝুনু-ঝুন্!

রাজার সভায় কবির গান সেদিনকার প্রভাতে তেমন জমিল না। বীণটা কেমন বেসুরা হইয়া গিয়াছে!

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আজ কবির হইল কি? সকালেই এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি—"

বয়স্য কহিল, "রাত্রে কবি মনটি কোথায় হারাইয়া আসিয়াছেন আর কি! গৃহিণীর কড়া তদারকে আমাদের মন হারাইবার পথ পায় না—কবির ত সে-সব বালাই নাই!"

রাজা কহিলেন, "তাই না কি, কবি?"

কবির মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। কবি কহিল, "বীণটায় সুর কেমন আঁটিতেছে না। তারগুলাতেও টান নাই!"

বয়স্য কহিল, "বেশ, তবে আজ কবির ছুটি হোক! আজ মহারাজ, সেই কাশ্মীরের রূপসী নর্ত্তকীর নাচ চলুক! দেখিয়া

চক্ষু সার্থক করি! ক্রমাগত কানটাকেই খোরাক যোগাইয়া-যোগাইয়া চোখ-দুটাকে খোয়াইতে বসিয়াছি। আজ চোখের খোরাকের চেষ্টা চলুক!"

রাজা বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, বন্ধু!"

তখন রাজসভায় নবীনা নর্ত্তকীর ডাক পড়িল। কবির বুক দুর্-দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে কি এক আকুলতা গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত রক্ত মাথার পানে ছুটিল! দুই হাতে কবি বুকটাকে চাপিয়া ধরিল। মনে হইল, প্রাণের গোপনতম কথাটি না কোন মতে সাড়া দিয়া উঠে! খুব সাবধান!

সিংহাসনের পিছনে পর্দ্দা নড়িল, নূপুর বাজিয়া উঠিল, রুণ্-ঝুনু-ঝুন্! সেই সুর! কবির হৃদয়-দোলায় কে যেন সঘন দোল দিল; সারা দেহ বেড়িয়া লজ্জা-সরমের একটা তড়িৎ-রেখা ছুটিল।

রাজা কহিলেন, "ওগো কাশ্মীরের রূপসী নর্ত্তকী, আজ কবির কণ্ঠ একেবারে নীরব,—বুঝি, তোমার নূপূরের ঝঙ্কারে—"

রাজার' মুখের কথা লুফিয়া বয়স্য কহিল, "যেমন এই বসন্তের জ্যোৎস্না-রাত্রে সে-দিন আমার গৃহিণীর কণ্ঠে মঞ্জুল ভাষ সরিতে শুনিয়া পিঞ্জরের কোকিলটা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল—"

কবির বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কবি একবার চকিতের মত মুখ তুলিল, সম্মুখে সেই নর্ত্তকী! ভুবন-ভুলানো মূর্ত্তিখানি! কেশের রাশি ঝালরের মত ঝরিয়া পড়িয়াছে! পেশোয়াজের

সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া গায়ের বর্ণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। কবির চোখে পড়িল, শুধু নর্ত্তকীর কাণের ছুটি নীলার ছুল, আর সেই ললিত-কোমল ওষ্ঠে সলজ্জ হাসির মৃদু রেখা—যে হাসিতে উষার বর্ণ-ছটাও সেদিন ম্লান হইয়া গিয়াছিল, সেই হাসি,— আর তাহার চারিধার বেড়িয়া স্নিগ্ধ নির্ম্মল লাবণ্যের আভা!

নর্ত্তকীর নূপুর লীলা-ছন্দে বাজিয়া উঠিল। তাহারই তালে হিল্লোল তুলিয়া নর্ত্তকী নৃত্য সুরু করিল। সভা-গৃহে রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! নৃত্য দেখিয়া রাজা-বয়স্য-সভাসদ সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলিয়া রাজা নর্ত্তকীকে উপহার দিলেন। নর্ত্তকী আভূমি প্রণত হইয়া রাজ-উপহার সসম্ভ্রমে শিরে ধরিল।

৩

কাশ্মীরী নর্ত্তকী লুনার নৃত্যে রাজ-সভা মাতিয়া উঠিল। রাজা নিত্য তারিফ করিয়া রত্ন-ভূষণ পুরস্কার দিতে লাগিলেন! সভা নিত্য সভাসদের জয়-গানে মুখর হইয়া উঠিত। রাজসভায় কবির আর ডাক পড়ে না। কবি আপনার জীর্ণ বীণ লইয়া বাগানে নিরালায় সেই টগর-ঝাড়ের কাছে গিয়া বসিত। নদীর জলে তরঙ্গ উঠে,—তাহাতে সূর্য্যের কিরণ, চাঁদের জ্যোৎস্না ঝরে, জল অমনি ঝক্‌মকিয়া উঠে। কবি শুধু তাহাই দেখে, আর থাকিয়া থাকিয়া সেই তট,—যথায় নর্ত্তকীর প্রথম চরণ-পাত একদিন তাহার চক্ষে পড়িয়াছিল, তাহার নূপুর যথায় ললিত

ঝঙ্কারে একটি ঊষার উদয় কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল,—সেই তটের পানে চাহিয়া থাকে! দীর্ঘ-নিশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া সমীর-প্রবাহে মিশিয়া যায়। বীণটি কোলের কাছেই পড়িয়া থাকে। কবির হৃদয় হইতে সে বীণ আজ আর এতটুকু ভাব-সুধা মন্থন করিয়া তুলিতে পারে না।

সহসা আবার একদিন রাজার সভায় কবির ডাক পড়িল। কবিব দীন মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা অপ্রতিভ হইলেন। সভার লোক বিস্ময় প্রকাশ কবিল।

রাজা কহিলেন, "কবি, তোমায় নূতন গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। এবারকার বসন্ত-উৎসবে ভারী ধূম করিব। রাজপুত্রের অন্ন-প্রাশনেরও ব্যবস্থা হইতেছে, ঐ দিন! বিস্তর আত্মীয়-কুটুম্ব, রাজা-বাদশাহ নিমন্ত্রণে আসিবেন। তুমি গান বাঁধ, তাহাতে সুব দাও; আর লুনা সেই গান গাহিবে। আসর মাতিয়া যাইবে।"

কবির বুক আবার দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল। এ কি পরিহাস! কিন্তু রাজাব মুখের উপর প্রতিবাদ করা চলে না। এতদিন যিনি প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—আবার শুধু কি তাহাই! যে রাজা পরম সুহৃদ্, হৃদয়ের বন্ধু—

কবি কহিল, "যথা আজ্ঞা, মহারাজ!"

..

বিরাট সভা। রত্ন-খচিত অসংখ্য আসন জুড়িয়া দেশের যত রাজা-মহারাজা বসিয়া গিয়াছেন। পাত্র-মিত্র-সভাসদ সদলে সভায় সমবেত। বহুমূল্য জমকালো বেশে সাজিয়া লুনা আসিয়া

অঙ্গন-তলে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়াছে। শুধু কবি আসিলেই হয়! সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! রূপসী নর্ত্তকীর নৃত্যের লীলায় রূপের জ্যোৎস্না ঝরিবে, দেখিবার জন্য সকলেই আকুল! কিন্তু কবি কোথায়?

কবি আসিল। পবণে একখানি কোমল পট্টবাস, গলে উত্তরীয়, ললাটে চন্দন-রেখা! শান্ত প্রসন্ন দৃষ্টি, গৌর তনু। দেব-সমাজে যেন মীন-কেতনের আবির্ভাব হইল।

রাজা ও সমবেত-মণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া কবি বীণে ঝঙ্কাব দিল। সে স্বর সজ্জিত সভার চারিধারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, যেন প্রকাণ্ড হীবা৹ হাজার ভাগে ভাঙ্গিয়া টুকরা হইয়া গেল, চারিধার আলোর লহরে ঝলমলিয়া উঠিল। বীণ বাজিল।

লুনা সেই বীণের সুরে কণ্ঠ খুলিয়া দিল, গান ধরিল। সে এক করুণ রাগিণী,—বসন্তের কথা! বসন্ত আসিল, ফুল ফুটিল, পিক গাহিল, শোভায় দিক ভরিয়া গেল! ওগো কবির মানসী বধূ, অভিমান করিয়া কোন্ ফুলের আড়ালে তুমি বসিয়া রহিলে? কুঞ্জখানিকে মনের মত সাজাইয়া তোমারই মৃদু চরণ-পাতের আশায় কবি অধীর চিত্তে বসিয়াছিল,—বীণ তাহার নীরব হইয়া গিয়াছে, গান সে ভুলিয়া গিয়াছে! দীর্ঘ দিন-রাত্রি ধরিয়া তোমারই ধ্যানে কবি তন্ময় হইয়া রহিয়াছে! তুমি আসিয়া বীণখানি শুধু স্পর্শ কর! আবার বীণ গাহিয়া উঠুক!···তবু আসিলে না? বসন্তেব ফুল, হায়, ঝরিয়া গেল, পিক তাহার

শেষ তান গাহিয়া বিদায় লইল, তবু তুমি আসিলে না? বসন্ত হায়, একান্তই বিফলে গেল!

গান শুনিয়া সভায় লোকের নয়ন-প্রান্ত সজল হইয়া উঠিল! কবি ও গায়িকার জয়-ধ্বনিতে সভা-গৃহ টলমল করিল। স্বহস্তে রাজা কবির কণ্ঠ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন, মুকুট হইতে মধ্যমণি খুলিয়া লুনাকে উপহার দিলেন।

তার পর সহসা একদিন একটা ভীষণ কালো মেঘ চারিধার ছাইয়া ফেলিল। লুনার নেশা রাজাকে বিভোর করিয়া তুলিয়া ছিল। নিত্য লুনাকে চোখে-চোখে রাখিয়া, নিত্য সে রূপ-সুধা পান করিয়াও রাজার যেন পিপাসা মিটিতেছিল না!

সুযোগ পাইয়া প্রবল শত্রু-সেনা আসিয়া সহসা রাজ-পুরী অবরোধ করিল। রাজা বন্দী হইলেন।

কবি তখন টগর-ঝাড়ের পার্শ্বে বসিয়া তেমনই বিহ্বল নেত্রে নদী-তটের পানে চাহিয়া ছিল। এ দুঃসংবাদ শুনিয়া, চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পশ্চিমে—সন্ধ্যার আঁধারে ঈষৎ-অস্পষ্ট রাজ-প্রাসাদের চূড়ার পানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং বীণখানি কোলে ধরিয়া সেই সন্ধ্যার আঁধারের মধ্যেই কবি কোথা অদৃশ্য হইয়া গেল।

নানা দেশ, তীর্থ, মন্দির ঘুরিয়া পনেরো বৎসর পরে আবার একদিন ঊষার আলোকে সেই নদীর তটে আসিয়া কবি

বসিল। মুখে তাহার শীর্ণ লোল রেখা পড়িয়াছে, কেশে পাক ধরিয়াছে!

এই সেই তট,—মাথার উপর একটা অশোকের শাখা হেলিয়া পড়িয়াছে,—পনেরো বৎসর পূর্ব্বে সে গাছ এতটা নিবিড় ছিল না। অজস্র ছিন্ন ফুলের দল ঝরিয়া তটের কূলে পড়িয়া ছিল,—যেন কোন্ রূপসীর চরণ-পাতে তটের ভূমি আপনাকে আর রুদ্ধ রাখিতে পারে নাই,—তাহার কঠিন ক্লিন্ন হৃদয় সে কোমল চরণ-স্পর্শে হাজার ফুলের রূপে ফাটিয়া পড়িয়াছে। তট লালে লাল হইয়া গিয়াছে!

কবির মনে পড়িতেছিল, সেই আর এক ঊষার কথা! যে দিন এই নদীর নির্ম্মল তীর আলো করিয়া রূপের কৌমুদী ঝরিয়া পড়িয়াছিল, একটি তরল হাসির দীপ্তি সহস্র রশ্মিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "মিহির—"

মিহির ফিরিয়া চাহিল,—এক প্রৌঢ়া নারী। কবি কহিল, "কে তুমি?"

"চিনিতে পারিলে না? আমি লুনা!"

লুনা! এই সে! পল্লবিনী লতার মত সেই দেহ, আজ এমন স্থূল বর্ত্তুল আকার ধারণ করিয়াছে! সেই চাঁদের বর্ণ, এমন হিমানীর জালে ঢাকা পড়িয়াছে!

সবিস্ময়ে কবি কহিল, "তুমি লুনা?"

"আমিই লুনা!"

"এখানে কেন ?"

"তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার ইতিহাস বলি। শোন, কবি! নর্ত্তকীর কন্যা আমি, মাকে কখনও দেখি নাই। বাজারে ফল মূলের মত যেদিন বিক্রয় হইলাম, তখন খুব ছোট ছিলাম। নাচ-গান শিখিবার পর একদিন এক সদাগর আমায় আনিয়া তোমার রাজার সভায় রাজার হাতে ভেট দিল। রাজা আমার রূপে ভুলিলেন। সে কথা তুমি জানিতে না—আর সকলে জানিতে পারিয়াছিল। তখন আমার প্রথম যৌবন। যৌবনের সে রূপের মোহেই রাজার সর্ব্বনাশ ঘটিল। তারপর দেশে নূতন রাজা আসিল। তাঁহার কাছে রাজ-সৈন্য আমায় বন্দিনী করিয়া আনিল। সকলের সম্বন্ধেই রাজা নানা কঠোর ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে রূপে বন্দী করিলাম। রাজা তখন রাজ্য ভুলিয়া, রাণী ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আমার এই পায়ে আপনাকে বিকাইয়া দিল! আদর-সোহাগের সে কি অজস্র মধুর বচন! প্রণয়ের সে কি কাতর মিনতি! রাজার মাথার মুকুট এই পায়ে লুটাইল। শেষে আমার গর্ভে রাজার সন্তান জন্মিল। দুই পুত্র, এক কন্যা। ক্রমে যৌবনের সে লাবণ্যও যেন মিলাইয়া গেল! কোথা হইতে এক দৈত্য আসিয়া কালো চুলে কি মন্ত্র পড়িয়া দিল—চুল শোণের নুড়ি হইল। মাধুর্য্যটুকু যৌবন তাহার ধনুর ছিলায় আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল, ক্রমে সে আঁটও শিথিল হইল! মাধুর্য্য ঝরিয়া গেল। রাজার অরুচি ধরিল। রাক্ষসী বলিয়া রাজা একদিন আমায়

তাড়াইয়া দিল। পুত্র-কন্যারা পথে দাঁড়াইয়া প্রাণ হারাইল। যাক্‌, আপদ গিয়াছে। আমার যৌবনের তাহারা সর্ব্বনাশ করিয়াছিল,—গিয়াছে, ভালই হইয়াছে!"

কবি বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু এ সব কথা আমায় শুনাইয়া ফল কি?"

লুনা কহিল, "ফল আছে। তাই বলিতেছি। মনে আছে, সেই যে দিন লুকাইয়া আমায় স্নান করিতে দেখ? তার পর, সেই রাজার সভায় বসন্তের গান? যখন আমায় সুর শিখাইতে, তখন আমার পানে তুমি চাহিতে পারিতে না—আর তোমার কথা বাধিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত! আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলাম। কৌতুকে আমার ঠোঁটের কোণে হাসিও সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তুমি দরিদ্র কবি, তোমার ভালবাসার মূল্য কি? তার পর সেই গান,—সে তোমারই প্রাণের কথা—তুমি আমায় চাহিতেছিলে। মানসী কবির কল্পনা নয়, সে আমি।"

কবি মিহির চমকিয়া উঠিল, কহিল, "কিন্তু এ সব কথা কেন?"

"কেন? তুমি আমায় ভালবাস। চমকিয়ো না। আমি জানি। এই রূপ দিয়া আমি শুধু দুই রাজাকে কেন, অনেককে মজাইয়াছি। আরও কত হৃদয় শীকার করিয়াছি, নিষ্ঠুর ব্যাধের মত বিঁধিয়াই শুধু ছাড়িয়া দিয়াছি! অবোধ শিশুর মতই তাহাদের লইয়া খেলিয়াছি, আবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছি রূপের দর্পে তখন প্রেম বুঝি নাই, হৃদয় খুঁজি নাই—"

"এ সব আমি শুনিতে চাহি না, লুনা।"

"শুনিতে হইবে! একদিন আমায় ভালবাসিয়াছিলে, তাই—"

"তুমি ভুল বুঝিয়াছ, লুনা,—আমি তোমায় কোন দিনই ভালবাসি নাই। আমি জানিতাম, রাজার সভায় পয়সার জন্য এই রূপ যে যা চাইয়া দেখাইয়া বেড়ায়, নাচের তালে রূপের বাহার ছুটাইতে চায়, তাহার প্রাণে ভালবাসার ঠাঁই নাই। যে রূপের দর্প করে, ভালবাসার মর্ম্মও সে জানে না, তাই আমি কোন দিন তোমায় ভালবাসিবার কল্পনাকেও মনে স্থান দিই নাই।"

"ভালবাস নাই? তবে সেই বিফল বসন্তের গান, সে শুধু মিথ্যা কথার গাঁথুনি?"

"না লুনা, তাহাও নয়।"

"তবে? তবে কি, কবি?"

"আমি তোমার সে দেহটাকে ভালবাসি নাই, লুনা! সে দেহের মূল্য কি? মৃত্যুর পরশে নিমেষে যাহা কুৎসিত কদর্য্য হইবে, যৌবন-শেষে বীভৎস মূর্ত্তি ধরিবে, তেমন নশ্বর পিণ্ডকে ভালবাসিয়া লাভ কি? আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেদিনকার নির্ম্মল উষায় তোমার দেহ ঘিরিয়া যে রূপের হিল্লোলটুকু জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই হিল্লোলটুকুকে! তোমার অধরে যে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই হাসিটুকুকে! সে রূপ নিমেষের জন্য ফুটিয়াছিল,—আজ শত চেষ্টাতেও সে হিল্লোল, সে হাসি, তুমি ফুটাইতে পার না! সে সাধ্যই বা তোমার কোথায়? তুমি একটা জড়পিণ্ড মাত্র! তোমার দেহটাকে

ভালবাসা আর একটা প্রাণহীন মাটির পুতুলকে ভালবাসা,—একই কথা!”

লুনা কহিল, “তবু আমার কথা বলি, শোন। আমায় ক্ষমা কর, কবি—এত রাজ-আদর-সোহাগের মধ্যেও আমি এতটুকু তৃপ্তি পাই নাই, শুধু আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই বাড়িয়া চলিয়াছিল। আরাম পাইয়া যখনই জুড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি, তখনই তোমার স্মৃতি আগুনের মত আমার অন্তরটাকে জ্বালাইয়া দিয়াছে! তোমার মুখ এক দিনের জন্য ভুলি নাই, কবি! এই ঘাটে তোমায় প্রথম দেখি! তাই এখানে আমি নিত্য এ সময় আসি। ঐ উপরে টগর ঝাড় শুকাইয়া গিয়াছে, তবু উহারই পানে চাহিয়া থাকি! আজও তাই আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ জীবনে আর দেখা হইবে না! ভাগ্য-ফলে তাহাও ঘটিয়া গেল। আমায় ক্ষমা কর, কবি—”

মিহির কহিল, “তোমায় ক্ষমা? কিছুতে নয়। রাজার প্রতি তোমার ব্যবহার,—কি সে? যে রূপ দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, যে রূপের নির্ম্মল দীপ্তিতে সারা বিশ্বে আলো দিতে পারিতে, সেই রূপে আগুন জ্বালিয়া তুমি বিশ্ব দগ্ধ করিয়া দিয়াছ! এত রূপ, এই জন্যই কি বিধাতা তোমায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন, নারী? যাও,—এ অপরাধ কিছুতেই আমি ক্ষমা করিতে পারি না!”

মিহির চলিয়া গেল। লুনা এক দৃষ্টে নদীর পানে চাহিয়া রহিল। নদীর জলে লাল আলো ফুটাইয়া সূর্য্য তখন গগন-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পত্নীপ্রেম

অফিসের ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া দোতলার ছাদে পাটি পাতিয়া তদুপরি দেহভাব লুটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। সদ্য-আরব্ধ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য প্রাণটা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ভৃত্যকে আলো দিয়া যাইতে বলিলাম। ফিরিওয়ালা তখন রুটী-বিস্কুট হাঁকিয়া গলির মোড় বাঁকিতেছিল।

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। অসহ্য গুমট। গাছের পাতা অবধি নড়ে না। ঝিল্লি সুর বাঁধিয়া লইতেছে, সারা রাত্রি আসর রাখিতে হইবে।

তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া আকাশের পানে চাহিয়া শুইয়া ছিলাম। দুই-একটা করিয়া বাদুড় বাসায় ফিরিতেছে। একটি দুইটি, তিনটি নক্ষত্র ফুটিয়াছে। ম্যাচ দেখিয়া ছেলে-বুড়ার দল কোলাহল-তর্ক তুলিয়া পথে চলিয়াছে, ছাদের উপর হইতে তাহাদের উচ্চ কণ্ঠের স্বর অস্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

সহসা স্ত্রী আসিয়া কহিলেন, "ওগো, শুনেছ?"

আমি ফিরিয়া চাহিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

"কানাইদের বাড়ী কি হয়েছে?"

"কি? চুরি বুঝি! তা পূজার দু'এক মাস আগে থেকেই

চোরের দল সজাগ হয়ে ওঠে! চাকর বেটাকে হুঁসিয়ার থাকতে বলো।”

বাধা দিয়া স্ত্রী কহিলেন, “আহা, না, না, তা কেন হবে গো!”

“তবে কি?”

স্ত্রী কহিলেন, “বামুনদি এসে বল্‌লে, ওদের কানাইয়ের এক খুড়ো আছে না—ঐ বাড়ীতেই থাকে! আজ ছ'মাস হল, তার স্ত্রী মারা গেছে। মন খারাপ করে বেচারা এখানে পড়ে থাকত, আজ মাস-খানেক হল, পশ্চিম গেছে, মন ঠিক করতে—তা সেখান থেকে মরা স্ত্রীর নামে সে এক চিঠি লিখে বসেছে। সে লিখেছে, খপর-টপর দাও না কেন—? এই সব—। আশ্চর্য্য কথা নয়?”

এমন অভাবনীয় পত্নীপ্রেমের কাহিনী শুনিয়া গর্ব্বের ভাণ করিয়া আমি কহিলাম, “আশ্চর্য্য আর কি! তোমার ভাব, পুরুষ মানুষ ভালবাসতে জানে না! তোমরা ত সেকালে আমাদের শোকে ধাঁ করে চিতের মধ্যে সেঁধিয়ে জ্বলো জুড়োতে, আর আমরা, নীলকণ্ঠ যেমন-ভাবে সমস্ত বিষ কণ্ঠে রেখেছেন, তেমনি স্ত্রী-বিয়োগের সমস্ত দুঃখ-শোক বুকে পুষে দিন কাটাই! সেই শোকের উপর আবার ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখি! ভাব একবার, যাকে বলে, বিপদের উপর বিপদ—! কবিতার ছন্দ মিলুনো সে কি সহজ ব্যাপার! তার কাছে কোথায় লাগে চিতার আগুন?”

কথাটার রস স্ত্রী তেমন বুঝিলেন না। কারণ নানা চেষ্টাতেও তাঁহার কনসার্বেটিবত্ব ঘুচাইতে পারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস, গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য কিনিয়া পড়াইয়াও,—সংবাদ-পত্রের উপহারে, ঘুড়ির কাগজে-ছাপা এক টাকায় ত্রিশ খানির সংস্করণ নহে, গোটা বই,—তাঁহার সুপ্ত চেতনাকে স্পন্দিত করিতে পারি নাই! তথাপি তিনি না বুঝিলেও আমার রসিকতাটুকুকে ঘষিয়া মাজিয়া প্রথম শ্রেণীর করিয়া তুলিতে আমি এতটুকু ত্রুটি করিতাম না।

তিনি বলিলেন, "ও সব নিয়ে ঠাট্টা করে না! যাঁরা চিতেয় যেতেন, তাঁরা কি মানুষ ছিলেন? তাঁরা দেবতা, সতী দেবতা, তাঁদের কথা নিয়ে মস্করা করে না।"

যথার্থই তাঁহারা সতী দেবতা—সে সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত আমার এতটুকু মতভেদ ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমি বলিলাম, "না, না, মিনু, তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কচ্ছি না, আমি শুধু পুরুষদের কথা বলছি! বেচারা পুরুষরা স্ত্রীদের অল্প ভালবাসে না, তাই বল্‌ছি! স্ত্রী মারা গেলে পদ্য ত অনেকেই লেখে, তা ছাড়া গদ্য লিখেও শোক জানায়! সে কি ফেনানো ভাষা! কি আহা-উহুর ছড়াছড়ি!"

এবার স্ত্রী বোধ হয় কথাটা কিছু বুঝিলেন, কহিলেন, "আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুমি কি কর? পদ্য লেখ, না গদ্য লেখ?"

আমি কহিলাম, "ও দুটো কাজই আমার পক্ষে শক্ত! বেজায়

শক্ত! অফিসের লেখার চোটেই পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি, তার উপর আবার পদ্য! তা লেখার চেয়েও বরং লোক-জনের টিট্‌কিরী সহ্য করে বিয়ে করাটাকে আমি ঢের হাল্কা কাজ বলে মনে করি! পদ্য লিখে শোক নিবুনোর চেয়ে বিয়ে করে শোক নিবুনোটা আমার কাছে বেশী মনঃপূত! কারণ, যারা পদ্য লিখে শোক নিবোয়, তারা পদ্যও লেখে, বিয়েও করে, দুটোর কোনটাই বাদ দেয় না! এতে তবু একটা কাজ বাদ যায়, ঐ পদ্য লেখাটা!"

স্ত্রী বোধ হয় কি ভাবিতেছিলেন! কানাইয়ের খুড়ার পত্নী-প্রেমের কথা, না, কানাইয়ের খুড়ীর ভাগ্যের কথা! হিন্দুর গৃহ-লক্ষ্মীর অন্তরে দ্বিতীয় ভাবনা আর কি থাকিতে পারে?

আমি ডাকিলাম, "মিনু—"

স্ত্রী কহিলেন, "কেন?"

আমি কহিলাম, "তবে শোন, একটা ঘটনা বলি তোমাকে। ভুলেই গেছলাম। আজ এই কানাইয়ের খুড়ার কথায় মনে পড়ে গেল! আমার নিজের প্রত্যক্ষ-করা ব্যাপার,—আমারই এক বন্ধুর জীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী!"

স্ত্রী কহিলেন, "কি? বল না!"

ভৃত্য আসিয়া আলো দিয়া গেল। আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম—

"সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়ি। কমল আমাদের সঙ্গেই পড়িত। সে ছিল, বড়

মানুষের ছেলে, দেখিতে বেশ সুন্দর, সুশ্রী; বেশভূষা যেমন পরিপাটী, প্রকৃতিটুকুও তেমনই অমায়িক! সহজেই তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিল। কমল আমাদের এখানে প্রায়ই আসিত। আমিও তাহার বাসায় নিত্য জুটিতাম। তাহার বাড়ী ছিল, ভাগলপুরে।

বি, এ পাশ করিয়া সে দেশে চলিয়া গেল। ফেল করিয়া আমি রিপনে ভর্ত্তি হইলাম। কমলের সহিত পত্র-ব্যবহার নিয়মিত চলিত! বি, এ পাশ হইয়া সে বিবাহ করিল। বিবাহে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই। কতকটা ইচ্ছা করিয়াই হই নাই। ফেল হইয়া আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিত না। কমল অত্যন্ত দুঃখ জানাইয়া বিস্তর অনুযোগ করিল, আমি তাহাতে বড়-একটা কান দিলাম না!

তাহার পর কমলের পত্র সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। পূজার ছুটিতে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু একটা অছিলা করিয়া কথাটা আমি উড়াইয়া দিলাম। কমল স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রায় এক বৎসর ঘুরিয়া সে আবার ভাগলপুরে ফিরিল। আমি তখনও বি, এ পড়িতেছি। পাশ হইবার জন্য দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইলাম! অদৃষ্টে যাহার কেরাণীগিরি আছে, তাহার দুঃখ ঘুচায় কে? সে বৎসর ফাল্গুন মাসে আবার বি, এ পরীক্ষা দিলাম। কমল পত্র লিখিল, এবার আমায় ভাগলপুর যাইতেই হইবে, নহিলে শুধু সে-ই যে অভিমান করিবে, তাহা নহে, তাহার স্ত্রী সুরমাও

মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিবে। ভাবিলাম, একবার ঘুরিয়া আসি।

একদিন লুপ মেলে চড়িয়া ভাগলপুর যাত্রা করিলাম। ট্রেণ তখন প্রায় রাত্রি একটায় ভাগলপুরে পৌছিত। ষ্টেশনে কমলের পুরাতন বেহারী খানসামা আসিয়াছিল, আমাকে অভ্যর্থনা করিতে।

বাড়ী পৌছিয়া দেখি, কমল বাহিরে একটা ইজি চেয়ারে পড়িয়া আছে। আমার করকম্পন করিয়া সে কহিল, আমার আগমনে সে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছে, তবে তাহার স্ত্রী এক মাস পূর্ব্বে পিত্রালয়ে গিয়াছে; 'সাত-আট দিনের মধ্যেই তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা! সে ফিরিলে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া উভয়কে চরিতার্থ হইবার অবকাশ না দিলে আমার প্রত্যাগমন ঘটিবে না!

রাত্রে কমলের আকৃতির পরিবর্ত্তনটা তেমন চোখে পড়ে নাই। প্রাতে দেখিলাম, তাহার মাথার কেশ দীর্ঘ হইয়াছে। শ্মশ্রু-বহুল মুখে কালির রেখা পড়িয়াছে! পূর্ব্বে সে শ্মশ্রু রাখিত না, এখন রাখিতেছে! বিষয়টার প্রতি ইঙ্গিত করিলাম। সে কহিল, "দাড়ি কামানো, সে এক উৎপাতের ব্যাপার। এ দায় যত এড়ানো যায়, ততই মঙ্গল!" তখন এই উত্তরেই সন্তুষ্ট রহিলাম! কিন্তু কারণটা আরও কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম,—এ নির্লিপ্ততার অর্থ কি! কিন্তু থাক্, সে কথা পরেই শুনিবে।

চা-পান শেষ হইলে কমল কহিল, "খবরের কাগজটা ততক্ষণ দেখ, সুরমাকে আমি একটা চিঠি লিখে ফেলি।" সুরমাকে কমল প্রত্যহ পত্র লিখিত। লিখিতেই হইবে। নহিলে সুরমা ভাবিবে! আর লিখিলে তাহারও চিত্তটা লঘু হয়! লেখা চাইই!

বাহিরে বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলাম, মন লাগিতেছিল না। সম্মুখে পথ, পথের পার্শ্বে একটা জলের কল। নানা-বেশ-ধারিণী বেহারী রমণীর দল কুম্ভ লইয়া জল ভরিতে আসিয়াছে। ধূলি উড়াইয়া, গাভী তাড়াইয়া, গোয়ালার দল পথে চলিয়াছে। গাভীর গলার ঘণ্টা হইতে একটা টুঙ্-টাঙ্ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কলিকাতা-বাসী আমার কর্ণে শব্দটা বেশ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

বেড়াইতে বাহির হইলাম। পশ্চিমের বিচিত্র দৃশ্যে মন যেন বন্ধন-মুক্ত পক্ষীর মতই আনন্দাতুর হইয়া উঠিতেছিল! পথে অত্যন্ত ধূলি! না দেখিলে সে ধূলির সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণাই করা যায় না। মনে পড়ে, যখন স্কুলে পড়িতাম, একজন শিক্ষক গল্প করিয়াছিলেন, ভাগলপুরে তিনি একবার ট্রাঙ্কের মধ্যে একটা ছোট বাক্স রাখিয়া ছিলেন। পরে ছোট বাক্সটা খুলিয়া একদিন তিনি দেখেন, তাহার ভিতরে অবধি ধূলা জমিয়া রহিয়াছে। কথাটা যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন শিক্ষক মহাশয়কে অতিরিক্ত কল্পনা-কুশল স্থির করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, কথাটা তাঁহার নিতান্ত অতিরঞ্জিত নহে!

দিনগুলা বেশ কাটিতেছিল! ব্যবস্থা সুন্দর! ঘরগুলি দিব্য

সজ্জিত। আসবাব-পত্রে একটী মঙ্গল হস্তের নির্ম্মল স্পর্শ জড়িত বলিয়া মনে হইত! কমল কহিল, ঘর-দ্বার-সাজানো-সম্বন্ধে সুরমার বেশ টেষ্ট্ আছে! সব তাহার নিজের হাতে সাজানো, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নাই! সুরমার প্রেম, সুরমার হৃদয়-সৌন্দর্য্যের কথা লইয়া রীতিমত আলোচনা হইত। আমি মনে মনে হাসিতাম, ভাবিতাম, এই বিবাহিত লোকগুলা কি সহজে ক্ষেপিয়া যায়! জগতে যাহা-কিছু ভালো, যাহা-কিছু সুন্দর, সমস্তই তাহাদিগের পত্নীর অন্তরে পুঞ্জীভূত! নোলোক-পরা ছোট একটা বালিকার মধ্যে ইহারা বেদ-বেদান্তের সুগভীর তত্ত্ব ও লিরিকের চূড়ান্ত মাধুর্য্য পরিপূর্ণ প্রতিফলিত দেখে! উন্মাদ প্রেমিক! অবশ্য এ উন্মাদের দলে নাম লিখাইতে যে আমিও পরে ভুল করি নাই, তাহার পরিচয় আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না, তুমি তাহা ভালই জান!

একদিন সন্ধ্যার সময় কমল কহিল, "আজ রাত্রে সুরমা আসবে। ষ্টেশনে তাকে আমি আনতে যাব। তুমি একটু জেগে থেকো।"

আমি সানন্দে সম্মতি জানাইলাম।

রাত্রি একটায় লুপ মেল। কমল গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গেল। অধীর প্রতীক্ষায় শয্যায় পড়িয়া আমি একখানা নভেল খুলিলাম। সিগারের মুগ্ধ নেশায় নিদ্রা দেবীকে ভুলিবার পক্ষে সুবিধাও বেশ ঘটিল। কখন্ যে সিগারের ধূমের সহিত আমার কল্পনা ঊর্দ্ধলোকে উড়িয়া গিয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই।

সহসা বাহিরে পায়ের দুপ্-দাপ্ শব্দ শুনিয়া ও ব্যস্ততার একটা কোলাহল অনুভব করিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভৃত্য-পরিজন ধরাধরি করিয়া অচেতন কমলকে উপরে লইয়া চলিয়াছে। একটা ভৃত্যকে আমি ডাকিলাম, "বুধন!" বুধন কমলের পুরাতন ভৃত্য। কাছে আসিয়া সে বলিল, "ভাববেন না। এখনই আরাম হবেন।"

কমলকে তাহার ঘরে শয়ন করাইয়া দুইজন ভৃত্যের উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া বুধন আমাকে লইয়া বাহিরে আসিল। সে বলিল, "মাঝে মাঝে এমন হয়! ডাক্তাররা বলে, এ আর সারবে না!"

আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম, কহিলাম, "কিন্তু ব্যাপার কি? তোমাদের মা-ঠাকরুণ আসেন নি?"

বুধন কহিল, "না।"

"কেন?"

"তিনি কোথায় যে, আসবেন! আজ বছর-খানেক হল, মারা গেছেন। ছেলে হবার সম্ভাবনা হওয়ায় তিনি বাপের বাড়ী যান। সেখানেই প্রসব হয়ে ফেরবার কথা। বাবু বড় অধীর হয়ে পড়ছিলেন, রোজই চিঠি লিখছিলেন, সেখানে থেকেও চিঠি আসত! শেষে বাবু একদিন বল্লেন, সাত-আট দিন পরেই তাঁকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছি। এখানেই আসুক। তাঁর শরীর সেখানে বর্দ্ধমানের জল-হাওয়ায় ভাল থাকছে না। তার পর তিনি গাড়ী নিয়ে এক দিন ষ্টেশনে চললেন। সে আর

কবে! গেল বছর ফাগুন মাসে। রেলে সরকার-মশায় ফিরে এলেন। মা নেই! বললেন, হঠাৎ অসময়ে ছেলেটি নষ্ট হয়ে তিনি মারা গেছেন। শুনে বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কোন মতে গাড়ীতে তুলে ধরাধরি করে আমরা তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসি। তার পর দিন কিন্তু সকালে উঠে চিঠি লেখাও ওঁর বন্ধ নেই! রোজ উনি মাকে চিঠি লেখেন, আমাদের হাতে দেন, ডাকে দিতে। আমি সব চিঠি নিয়ে গিয়ে একটা বাক্সে জমা করি! কাকে সে চিঠি পাঠাব? কোথায় তিনি? তা ছাড়া মাঝে মাঝে, অমন দু'মাস তিন মাস অন্তর কি যে খেয়াল জাগে, হঠাৎ বলেন, সাত-আট দিন পরে, তিনি আসবেন! তার পর হঠাৎ গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যান, যেন মাকে আনতে চলেছেন! লুপ মেল এসে দাঁড়ায়। উনি আকুল চোখে এ গাড়ীতে ও গাড়ীতে উঁকি দেন, মাকে খোঁজেন! তার পর ট্রেণ চলে যায়, উনিও নিশ্বাস ফেলে গাড়ীতে এসে বসে পড়েন! অমনই অজ্ঞান! ডাক্তাররা বলে, এর আর ঔষধ নেই, তবে ঠাঁই-নাড়া করলে ভালো হতে পারে। তা এত চেষ্টা করেও কোনখানে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি! আপনি যদি একবার বলে-কয়ে এটার ব্যবস্থা করতে পারেন! না হলে এখানে মার চিহ্ন চারি ধারে। দিন-রাত তার মধ্যে থাকলে উনি সারতে পারবেন না!"

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম! এ কি উন্মাদ, না, আর কিছু?

প্রভাতে কমল আবার কাগজ লইয়া বসিল, সুরমাকে পত্র

লিখিবে। দুপুর-বেলা আমি স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা পাড়িলাম, কহিলাম, "দুই জনে একটু বেড়াইয়া আসি, চল।"

কমল বলিল, অসম্ভব! সুরমার পত্র আসিবে, সুরমা আসিবে, সে কোথায় যাইবে? তাহা হইলে চিঠি-পত্র সব গোল হইয়া যাইবে! কোনমতে তাহাকে সম্মত করাইতে পারিলাম না।"

মিনু রুদ্ধ শ্বাসে আমার কথা শুনিয়া যাইতেছিল। সে কহিল, "কমল বাবু এখন কোথায়? কেমন আছেন?"

আমি কহিলাম, "সেই বছরই পূজার সময় সে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হইয়া পড়ে! আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই! পরে সংবাদ পাই, এক রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! চারিধারে বিস্তর সন্ধান চলে। শেষে দুই-চারি দিন পরে ভাগলপুরেই সাজাঙ্গীর উচ্চ টিলার উপর তাহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। এ জায়গাটিতে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই বেড়াইতে আসিত। কত সন্ধ্যার মৃদু আলো ও রাত্রির অজস্র জ্যোৎস্না-কিরণেব মধ্যে দুইজনের সময়টুকু স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইত! জা[illegible]গাটা প[illegible]াতনের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল!"

পার্শ্বস্থ হরিকেন লণ্ঠন হইতে মৃদু আলো আশে-পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চারিধারে আঁধারের বুক চিরিয়া ঝিল্লীর সুর জাগিয়া উঠিয়াছিল। দূরে গাছ-পালার মধ্যে দুই-চারিটা জোনাকি জ্বলিতেছিল! সহসা মিনু আমার হাতে মাথা রাখিল। একটা পরিপূর্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া সেই নিবিড় স্তব্ধতার গায় মিশিয়া গেল।

মা ও ছেলে

করালীপাড়ার চক্রবর্ত্তীদিগের প্রকাণ্ড পরিবার যখন জ্ঞাতি-সুলভ মামলা-মকদ্দমায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় দুই শরিক তারাশঙ্কর ও মুরারিমোহন আপনাদিগের অংশগুলি জ্ঞাতিবর্গের হাতে তুলিয়া দিয়া আপোষে মকদ্দমা মিটাইয়া কাশীবাসের জন্য দেশত্যাগ করিল।

এই মহানুভাবতা ও ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া গ্রামের প্রবীণগণ যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, উকিলগণ ঠিক সেই পরিমাণেই এই উভয় পরিবারের নির্ব্বুদ্ধিতা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন!

তারাশঙ্কর নির্ব্বিরোধ প্রকৃতির লোক। আদালতে আমলা-বর্গের অত্যধিক অর্থ-লালসা দেখিয়া ও উকিলগণের নানাবিধ জেরা ও জুলুমের মধ্যে পড়িয়া সে বেচারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মুরারিমোহন আমোদ-প্রিয়—আইনের কূট রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িত। তাই প্রকাণ্ড পরিবারের এই দুই শরিক বিরক্ত চিত্তে মামলা মিটাইয়া এজামালিত্বের বন্ধন কাটিয়া, কাশীতে আসিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটের নিকট বাসা লইল!

পাশাপাশি দুইটি ছোট বাড়ীতে নূতন করিয়া সংসার পাতা হইল। শরিকগণের কলহের তুমুল কোলাহল, আদালতের রুদ্র

শাসন, উকিলের উৎপীড়ন, সব ছাড়িয়া অপহৃত শান্তি-সুখ ফিরিয়া পাইয়া উভয় পরিবারই যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

তবে গঙ্গার ঘাটে বায়ু-সেবন ও মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া বেড়াইলে মনে শান্তি মিলিতে পারে, কিন্তু সংসারের অভাব তাহাতে ঘুচে না! দেশে থাকিতে ক্ষেতের চাল, পুকুরের মাছ ও বাগানের তরী-তরকারী যেমন অনায়াস-লভ্য ছিল, এখানে তাহা তেমনটি নাই! এখানে চাকুরির অবলম্বন নহিলে অন্ন মেলা দায়।

অথচ চক্রবর্ত্তী বংশে কাহারও নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ত কোন কালে ছিলই না, উপরন্তু বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিবারও বড়-একটা প্রয়োজন কাহারও মনে কখনও উদয় হয় নাই! কাজেই নানা চেষ্টায় সামান্য চাকুরিমাত্র জুটিল!

তারাশঙ্কর আসিয়া ডাকিল, "মুরারি!"

মুরারি বলিল, "দাদা—"

তারাশঙ্কর কহিল, "এ দেশে এসে অন্যায় করেছি, দেখছি। অল্প খরচে এখানে চলে ভাবতুম, তা এ যে দেখছি, সহরের মতই সব আক্রা হয়ে উঠেছে—"

মুরারি বলিল, "কোথায় যাই, বল? দেশের জমি-জমা এমন করে ছেড়ে আসা ভাল হয়নি, মনে হচ্ছে—"

তারাশঙ্কর বলিল, "কিন্তু ছেড়ে এসেছি বলেই তবু যাহোক্ দু'পয়সা হাতে ঠেকেছে। না হলে তুমি কি মনে কর, এ মকদ্দমায় কিছু বাকি থাকত! উকিল-পেয়াদায় মিলে সমস্ত বিষয়টুকু,

—আর পাড়াগাঁয়ে তার দামই বা কি—খেয়ে বসত! দেখো এর পর আর-সকলের হালটা কেমন দাঁড়ায়!"

মুরারি বলিল, "ছেলেপিলেগুলো যে এ দিকে পেট পুরে খেতে পায় না—"

তারাশঙ্কর বলিল, "আধ-পেটা যে জুটছে, এইটেই ভাগ্য বলে মেনো!"

রোদ পড়িয়া আসিলে, ছেলে-মেয়েরা যখন প্রাণ ভরিয়া খেলা করিত, তাহাদের সে উল্লাস-চীৎকারে তারাশঙ্করের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিত। সে ভাবিত, "হা রে অভাগারা—"

মনসাখালির জমিদার হরকান্ত চৌধুরী পুত্রশোকে কাতর হইয়া পত্নীকে লইয়া নানা তীর্থ ঘুরিয়া শেষে কাশীবাস করিতেছিলেন। গৃহে ফিরিবার দিকে তাঁহার বড়-একটা ইচ্ছা ছিল না। বিষয়-কর্ম্মে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া কর্ম্মচারীবর্গ ও গুরুদেব আসিয়া নানাভাবে তাঁহাকে বুঝাইলেন, শেষে শাস্ত্র-কথা পাড়িয়া বসিলেন, এ ভব-সংসারে শোক পায় নাই, এমন লোক বিরল! সংসারীর নানা কর্ত্তব্য আছে, কাতর হইলে চলিবে না! এবং গৃহিণী-ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়াবশতঃ পুত্রমুখ-দর্শনের আশা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও পোষ্যপুত্র লইলে বংশ-লোপের আশঙ্কা নাই, ইত্যাদি।

কথাটা হরকান্তের মন্দ লাগিল না—মন্ত্র-তন্ত্র ও ঔষধ-মাদুলির

ব্যবস্থা করিয়া যে পুত্র তিনি পাইয়া ছিলেন, সে ত রহিলই না! এক্ষণে বিপুল বিষয় ও প্রাচীন বংশ রক্ষা করিতে হইলে পোষ্যপুত্র লওয়া ভিন্ন আর উপায়ই বা কি? কিন্তু তেমন একটি পুত্র মিলে কোথায়?

সারাদিন ঘুরিয়া এক কর্ম্মচারী আসিয়া সন্ধ্যায় সংবাদ দিল, "দশাশ্বমেধের কাছে এক ভদ্র লোক আছেন, নাম তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, তাঁর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—অবস্থা খারাপ—ছোট ছেলেটি দেখতেও যেন কার্ত্তিক, বয়স পাঁচ বছর—"

বাড়ীর সম্মুখে রোয়াকে বসিয়া তারাশঙ্কর তামাকু টানিতে ছিল, এমন সময় হরকান্তের দেওয়ান আসিয়া প্রণাম করিল। দেওয়ান আগমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, তারাশঙ্কর বহুক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া রহিল।

দেওয়ান কহিল, "তা হলে মশায়ের ইচ্ছা নাই, বোধ হয়—তবে আসি—মাপ করবেন!"

তারাশঙ্করের যেন চমক ভাঙ্গিল। লক্ষ্মী আসিয়া দ্বারে সাড়া দিতেছেন, এখন তাঁহাকে এমনভাবে উপেক্ষা করা ঠিক হইবে, কি? সে কহিল, "বসুন, আমি আসছি।"

তারাশঙ্কর আসিয়া স্ত্রীর নিকট ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া স্ত্রী বলিল, "পোড়া কপাল! পেটের ছেলে বিক্রী করব? কেন, গলায় দেবার দড়ি জোটে না, কি?"

তারাশঙ্কর হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল, "কিন্তু তুমি বুঝছ না, ছেলেটা খেয়ে বাঁচবে—ভবিষ্যতে কত বড় সম্পত্তির মালিক হবে—সকলেরই ভালো হবে—"

স্ত্রী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "অমন ভালোর মুখে আগুন!"

তারাশঙ্কর বলিল, "বলছে, এখন পাঁচশ টাকা নগদ দেবে—তারপর যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন পনেরো টাকা করে মাসহারা—"

স্ত্রী বলিল, "অমন টাকায় আমার কাজ নেই! পেটে যখন ঠাঁই দিতে পেরেছি, তখন এক মুঠো খেতেও দিতে পারব—"

স্ত্রী গৃহ-কার্য্যে চলিয়া গেল। তারাশঙ্কর নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে দারুণ সমস্যায় পড়িয়াছিল। পুত্র-বিক্রয়! কথাটা তীরের মত তাহারও প্রাণে বিঁধিতেছিল, কিন্তু আর একটা দিক সে বড় উজ্জ্বল দেখিতেছিল—সংসারের এই বিরাট দৈন্য, দারুণ হাহাকার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর ইহাতে পাপই বা কোথায়? পুত্রের ভালোর জন্যই ত সে এ ব্যবস্থা করিতেছে! ইহার চেয়ে ছেলেটা না খাইয়া মরিলেই কি কীর্ত্তির ধ্বজা উড়িতে থাকিবে!

স্ত্রী ফিরিলে কম্পিত কণ্ঠে সে আবার কহিল, "ওগো, শুনছ?"

স্ত্রী তীব্র স্বরে উত্তর দিল, "কি শুনব?"

"তা হলে ওকে কি বলব? লোক যে বসে রয়েছে! ছেলেটার ভালো হত, তাই বলছিলুম। একটু বিবেচনা করে দেখ—পাগলামি করো না—"

স্ত্রীও যে একবার সবটা ভাবিয়া দেখে নাই, এমন নহে! এই যে তাহার স্বামী এতখানি মহত্ত্ব দেখাইয়া দেশের বিষয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, কৈ, ভগবান ত মুখ তুলিয়া চাহিলেন না! এ ত্যাগের মূল্য ত তিনি বুঝিলেন না! একটা ভালো চাকুরিও স্বামীর অদৃষ্টে জুটিল না! তবে—! আর পুত্রকে বিক্রয়ই বা কোথায়? এ'ত পুত্রের সুখের জন্য তাহারাই ত্যাগ স্বীকার করিতেছে! এমন সময় পুত্র আসিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা, ওদের বিশু আমায় মেরেছে, মা—"

মাতৃ-হৃদয় নিমেষে অমনি স্নেহের রসে ভরিয়া উঠিল! পুত্রকে বুকে তুলিয়া তাহার সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুম্বন করিয়া মা বলিলেন, "কেঁদো না মাণিক! আমি তাকে মারবো'খন—"

তারাশঙ্কর কহিল, "তা হলে কি বলব?"

স্ত্রী কহিল,"তা আবার জিজ্ঞাসা করছ! বলগে ছেলে বিক্রী করা আমাদের ব্যবসা নয়—"

তারাশঙ্কর সে মাতৃমূর্ত্তির নিকট একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। যন্ত্র-চালিতের মত সে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেদিন অপরাহ্নে সংবাদ পাওয়া গেল, মুরারির কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মনসাখালির জমিদার হরকান্ত চৌধুরী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। কথা-বার্ত্তা সব পাকা হইয়া গিয়াছে—কাশীতেই মহা-ধুমধামে অনুষ্ঠান-ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে! শুনিয়া তারাশঙ্করের মনটা হায়-হায় করিয়া উঠিল।

পাড়ার লোকে—কেহ বলিল, "একেই বলে বরাত!"

কেহ-বা আবার পুত্রের জনক-জননীর উদ্দেশ্যে বলিল, "অমন বাপ-মার মুখে আগুন!"

তাহার পর প্রায় বারো-তেরো বৎসর অতীত হইয়াছে। নানা দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া তারাশঙ্করের বহু দুর্ব্বৎসর কাটিয়া গিয়াছে! ছোটটি ছাড়া অপর পুত্রগুলি একে একে সব ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে—এবং ছোটটিও অত্যধিক আদরে বিগড়াইয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ পিতা চাকুরি করিয়া যে কয়টি মুদ্রা আনিয়া দেয়, তাহাতেই সংসার চলে। অপদার্থ পুত্র প্রিয়শঙ্কর অসির বাবুদের সখের থিয়েটারে নায়িকা সাজিয়া আসর মাতাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বাবুদের বৈঠকখানাতেই তাহার সময় কাটিয়া যায়; সংসারের ভাবনা লইয়া মাথা ঘামাইবার তাহার তিলার্দ্ধ অবসর নাই!

এমন সময় বৃদ্ধ তারাশঙ্কর একদিন নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত ইহ জগতের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বসিল। প্রিয়শঙ্করকে অগত্যা চক্ষুলজ্জার খাতিরে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইল।

মুরারির দুই পুত্রের মধ্যে বড়টি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিতেছিল—ছোটটি ক্বচিৎ কাশীতে আসিত, আসিলে মুরারির বাড়ীতেই সে অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিত!

সেদিন বাবুদের বাড়ী থিয়েটারের জন্য প্রিয়শঙ্কর অফিস হইতে সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছিল। বাবুদের বাড়ী সন্ধ্যার সময়

মহা-সমারোহে নূতন নাটক "আশা-প্রদীপের" অভিনয় হইবে, তাহাতে সে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিবে!

বাবুদের-দেওয়া মলিন ধূলি-ধূসরিত পম্প্‌সু ঝাড়িয়া-মুছিয়া, গিলা-করা পঞ্জাবির উপর কুঞ্চিত চাদর উড়াইয়া প্রিয়শঙ্কর বাহির হইবে, এমন সময় পুষ্পসারের গন্ধে চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়া এক তরুণ সুশ্রী যুবক মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রিয়কে দেখিয়া যুবক ডাকিল, "প্রিয়দা, তুমি থিয়েটারে যাচ্ছ, বুঝি?"

শুনিয়া প্রিয় প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদ বলিল, "একে চিনতে পারলে না, প্রিয়? আমাদের মোহিনী যে—"

মোহিনী! প্রিয়র চোখের সম্মুখ হইতে যেন একটা পর্দ্দা খসিয়া গেল। বারো বৎসর পূর্ব্বেকার এক অতীত দৃশ্য তাহার সম্মুখে ছবির মত ফুটিয়া উঠিল! সেই শীর্ণকায়, কুশ্রী, কদাকার, এক দরিদ্র বালক—আর্জ সে—! নিরাশায়, ক্ষোভে প্রিয়শঙ্করের অন্তরখানা জ্বলিয়া উঠিল! তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না।

বিনোদ কহিল, "খুড়িমা কোথায়?"

মোহিনী কহিল, "এখন থাক্—এসেই দেখা করব'খন, দাদা। আগে বরং সিঙ্গিদের ওখানে চল। তাদের থিয়েটারে আজ আমায় যেতেই হবে, না হলে তারা ভারী দুঃখ করবে! অনেক করে বলে এসেছে। তুমি ত ওখানেই যাচ্ছ, প্রিয়দা?"

প্রিয় বলিল, "না!"

বিনোদ কহিল, "সে কি? তুমি না কমলা সাজবে?"

এমন সময় প্রিয়শঙ্করের জননী আসিয়া কহিল, "বিনোদ, ও-টি কে রে? আমাদের মোহিনী, না? আহা, দিব্যি হয়েছে ত—যেন রাজপুত্তুর! তা বসো, মোহিনী—"

মোহিনী প্রণাম করিয়া কহিল. "না, খুড়িমা, এখন ভারী ব্যস্ত আছি। প্রিয়দাকে শুধু এক সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলুম, আমার গাড়ী তৈরি আছে—"

প্রিয় কহিল, "না, না, তোমরা যাও, আমার একটু দেরী হবে—কাজ আছে।"

বিনোদ কহিল, "হেঁটে যাবে, কেন? মোহিনীর গাড়ী ত রয়েছে—"

প্রিয় কহিল, "চিরকাল যখন হেঁটেই কেটে যাচ্চে—"

মোহিনী কহিল, "তা হলে শীঘ্র এসো, প্রিয়দা—"

বিনোদ ও মোহিনী চলিয়া গেল।

প্রিয় মাতার পানে চাহিয়া ডাকিল, "মা—"

"কেন, বাবা?"

"আমার এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল যে তুমি, এ কথা আমি কখনও ভুলব না, কখনও না!"

"কি বলছিস্, প্রিয়?"

"কি বলছি? এই মোহিনী—ও কি ছিল? কিন্তু আজ—? অথচ এ সব আমারই প্রাপ্য! জমিদার হরকান্ত আমাকেই প্রথমে পোষ্যপুত্র নিতে চেয়েছিল, মোহিনীকে নয়! কিন্তু তুমি আমাকে

ছেড়ে দাওনি! চিরকাল এই দুঃখের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে আমার দিন কেটে গেল! নিজের স্বার্থের জন্য ছেলের ভালো তুমি হতে দাওনি। এই কাঙ্গাল মোহিনী আমার ধনে ধনী হয়ে, রাজপুত্রের মত আজ তোফা দিন কাটাচ্ছে, আর আমি—?"

প্রিয়শঙ্করের চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছিল!

মা বলিলেন, "ও কি বলছিস, বাবা? পয়সা নিয়ে ছেলে বিক্রী করব, আমি তোর এমন মা?" মার চোখে জল আসিল।

প্রিয় কহিল, "থাম, আর মায়া দেখাতে হবে না! অমন মায়া-কান্না আমি ঢের দেখেছি। আমার জীবনটাকে তুমি একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দেছ। মনে করো না, ভগবান কখনও তোমার এ অপরাধ ক্ষমা করবেন! আমি চললুম। তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাক—আমি একবার এ জগতে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই—"

কথাটা মা ভালো বুঝিলেন না, চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্? থিয়েটারে—?"

"না, চুলোয়,—" বলিয়া প্রিয়শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

মাতার হৃদয়ে কথাটা শেলের মত বিঁধিল! হা রে অকৃতজ্ঞ পুত্র, মাতার দুঃখ তুই কি বুঝিবি! স্বার্থের জন্য তোর ভালো হইতে দিলাম না? বেশ, যদি তাহাই বুঝিয়া থাকিস্ ত বলিবার আর কিছু নাই,—শুধু ভগবান তোকে ক্ষমা করুন!

প্রিয়শঙ্কর যখন গলি পার হইয়া পথে পড়িল, তখন সদর্পে ধূলি উড়াইয়া মোড় বাঁকিয়া মোহিনীর জুড়ি দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

বিপ্রলব্ধ

প্রমথনাথের চিত্তে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তনের জন্য যদি দায়ী কেহ থাকে ত, সে বাঙ্গালা মাসিক-পত্রের গল্প-লেখকের দল।

যিনি প্রেমের গল্প লেখেন, তাঁহারই নায়ক এফ-এ কিম্বা বি-এ ক্লাশের ছাত্র, এবং কলিকাতার মেসে তাহার বাস! নায়িকা, হয় কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের শকটারোহিণী, অথবা পল্লীর গৃহ-ছাদ-বিহারিণী বালিকা, না হয় ত রুটি বা চা-ওয়ালার পথ-চারিণী কিশোরী কন্যা! ঘটনা-চক্রে নায়িকার সহিত শুভ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া কোন নায়ক সুখে সংসার পাতে, অর্থাৎ স্নান করে, ভাত খায়, অফিস যায়! কেহ-বা ফেল হইয়া মেস, লেখাপড়া ও প্রেম, ত্র্যহস্পর্শেরই দায় কাটাইয়া সুছেলের মত ঘরে ফিরে। আবার কেহ-বা—যাহারা নিতান্ত বেকুব—বিষ খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, কিম্বা সে সৌভাগ্য না ঘটিলে হাবড়ার পুল হইতে "জয় মা" বলিয়া গঙ্গা-গর্ভে ঝাঁপ দেয়!

প্রমথ ভাবিল, এই মেস! ধন্য সে যে, প্রেমের সূতিকা-গৃহ সেই মেসের কক্ষে স্থান পাইয়াছে! মেসে বাস, এফ-এ পাঠ, প্রাণটাও বিরহের ভারে একান্ত ব্যাকুল! কিন্তু অয়ি মনোমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি কোথায়?

জানালার ধারে, বারাণ্ডায় ও ছাদে আসিয়া প্রমথ দাঁড়ায়। একস্‌-রে যেমন করিয়া নর-দেহের কঠিন চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার অস্থি-পুঞ্জ আবিষ্কার করে, তেমনই তাহার তৃষিত নেত্র পল্লীস্থ অট্টালিকা-সমূহের ইষ্টকাবরণ ভেদ করিয়া গৃহমধ্য-বাসিনী কোন সুন্দরী নায়িকার অস্তিত্ব অনুভব করে! ঐ একখানা শাড়ী শুকাইতেছে! না জানি, উহার অধিকারিণীর চিত্তটি কেমন কোমল, সুন্দর! তাহার প্রাণ এমনই প্রেমের তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছে কি? কে জানে! রবিবাবুর গোড়ায় গলদের একটা কথা প্রমথর মনে বার বার উদয় হইত! কবি ঠিক বলিয়াছেন, মানুষের কাছ হইতে দূরে থাকিবার জন্য মানুষ এত ইট-কাঠের অন্তরাল রচনা করে, কেন?

সেদিন ভোর বেলায় বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রমথনাথের নেত্র যাহা দর্শন করিল, তাহাতে সে কৃতার্থ হইয়া গেল। মেসের অপর পারের বাটীতে জানালার ধারে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া এক কিশোরী, তাহার পরিধানে একখানি টিয়াপাখী রঙের পাছা-পাড় শাড়ী! শাড়ীর কালো পাড়টুকু মালার মত কিশোরীর অঙ্গখানি বেড়িয়া আছে! হাতে দুই গাছি সোণার প্লেন বালা! সুগৌর বর্ণে সোণার দীপ্তিটুকু সুন্দর খাপ খাইয়াছে! মাথায় সযত্ন-বিন্যস্ত ঘন কালো কেশের রাশি! সীমন্তের সীমানায় কৈ সিন্দূর-বিন্দু নাই ত! প্রমথর প্রাণ এক অজ্ঞাত আশার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! আহা, এই কিশোরী যদি তাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ঘুচাইয়া দেয়, তাহার আর্ত্ত চিত্তের জ্বালা জুড়ায় ত, কে কোথায় এমন সম্রাট

আছে, যাহার সুখ প্রমথর সুখের মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে!

সহসা কিশোরী কাহার আহ্বানে সরিয়া গেল। যেন বিদ্যুৎ চমকিল! ভোরের আলো নিমেষে অমনি কালো হইয়া গেল! তথাপি প্রমথ হঠিবার পাত্র নহে! সেইখানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেসের বর্ব্বর সঙ্গীর দল তখন একে-একে জাগিয়া উঠিতেছিল। হতভাগা, স্বার্থপরের দল! প্রাণে কাহারও না আছে এতটুকু কাব্য, এতটুকু সহানুভূতি! শুধুই কলেজের নীরস লেকচার আর টাউন-হলের বক্তৃতা লইয়া সব তর্কাতর্কি করিয়া মরে! ইহারা কি মানুষ? হতভাগ্য প্রমথ! তাই সে ইহাদের দলে আসিয়া জুটিয়াছে!

রমেশ ডাকিল, "ওহে প্রমথ, চা তৈরী, এস। ওখানে রোদ ফুটে উঠছে! এ সময় আর কাব্যি কি পাবে? ময়লা-গাড়ী হটর্ হটর্ করে চলেছে, তার উপরই কবিতা লিখে ফেলবে, ভেবেছ না কি?"

মনের ব্যথা মনে চাপিয়া প্রমথকে আসিতে হইল। মেসের নানাবিধ কোলাহলের মধ্যে সেদিন আর বারাণ্ডায় আসিবার সম্ভাবনা না ঘটিলেও কিশোরীর স্মৃতির মদিরা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া এক অজানা নেশায় তাহার চিত্তটিকে মুগ্ধ বিভোর করিয়া তুলিল!

২

কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া সারা অপরাহ্ণ-কালটা প্রমথ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কাটাইল! যদি আর একবার তাহাকে দেখিতে পায়! সঙ্গীর দল কি বুঝিতে পারিবে?

না। তাহারা ভাবিবে, প্রমথ পথে লোক-চলাচলই দেখিতেছে! ভাবুক লোকের প্রাণে কত রসের তরঙ্গ উঠে—কত খেয়ালের উদ্ভব হয়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রমথ সন্ধ্যার পর বারাণ্ডা ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কিশোরীর দর্শন মিলিল না। রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বারাণ্ডায় হরিকেন লণ্ঠন আনিয়া তাহারই আলোয় বসিয়া সে একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিল। একবার দেখা দিয়া, ওগো আকাশের বিদ্যুৎ, তুমি কোথায় লুকাইলে? জানালার ধারে কমল যদি ফুটিলই, তবে প্রমথর হৃদয়-সূর্য্য তাহার মাধুরীটুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই, হে কমল, তোমার কোমল দলগুলি ঝরাইয়া কোথায় লুকাইলে? কবিতাটা কাটকুট করিয়া প্রকাশের জন্য সে কোন মাসিক-পত্রে পাঠাইয়া দিবে, স্থির করিল। আজ এ কি সুন্দর ভাব তাহার মাথার মধ্যে উদয় হইয়াছে! জানালা-সরোবরে মুখ-পদ্ম দেখিয়া প্রমথ-হৃদয়-সূর্য্য মুগ্ধ! কিন্তু একটা ভুল হইয়াছে—প্রমথ-হৃদয়-সূর্য্যের প্রেম-রশ্মি-পাতে জানালা-সরোবরে সে মুখপদ্মটি ফুটিয়া উঠিল, এমনই ধারা লিখিতে পারিলে, ভাব-সঙ্গতি বজায় থাকে, অর্থও দুর্ব্বোধ হয় না! প্রমথ

একবার অক্ষরগুলার উপর আঁচড় টানিল। পর মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িল, যে কবিতার অর্থ যত দুর্ব্বোধ্য, ভাব-সম্পদে সেই কবিতা তত উজ্জ্বল, ততই উৎকৃষ্ট! সরল কথা ত সরল মানুষে বলে—কবিও যদি সাদা-সিধা কথা বলিবে, তবে আর তাহার বিশেষত্ব কোথায়? রচনার প্রসাদ-গুণই বা কি রহিল! মাসিকপত্র-সমূহের সমালোচনাগুলা অবধি প্রমথ দিব্য মনোযোগ দিয়া পাঠ করিত, কাজেই সমালোচনার ভাবভঙ্গীগুলা তাহার বেশ আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে সে দেখিল, টিয়াপাখী রঙের সে কাপড়-খানা বাড়ীর বাতায়নে ঐ যে ঝুলিতেছে—! তবে বুঝি কিশোরী কিছু পূর্ব্বে এ ধারে আসিয়াছিল! আহা, কোমল বাহু-যুগ নাড়িয়া নাড়িয়া কাপড়খানি শুকাইবার জন্য পথের ধারের বাতায়নে সে ঝুলাইয়া দিয়া গিয়াছে! প্রমথ ভাবিল, ঐ বস্ত্রখানা যদি সে একবার স্পর্শও করিতে পায়!

সে-দিন সে আর-একটা কবিতা লিখিল। হে বস্ত্রখণ্ড, তুমি তুচ্ছ নও। তাহার সারা গা-খানি বেড়িয়া তুমি অঙ্গ-সুরভি লুণ্ঠন করিয়াছ! আমি যদি প্রমথ না হইয়া ঐ টিয়াপাখী রঙের বস্ত্রখণ্ড হইতাম! আহা!

তিন-চারি দিন কাটিয়া গেল। প্রমথ শুধু দেখে, বস্ত্রখানা কে আসিয়া কখন শুকাইতে দিয়া যায়, আবার শুকাইলে তুলিয়া লয়!

অথচ কে এ কাজ করে, তাহা কোন দিন দর্শন করা তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। নৈরাশ্যের তীব্র হাহাকার মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া প্রমথর চিত্তটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে থাকে! প্রমথ ভাবিল, বুঝি সে এবার পাগল হইবে!

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ ঝড় উঠিল। বস্ত্রখানা পথ-পারে গৃহ-বাতায়নে তেমনই ঝুলিতেছিল, আর প্রমথ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল। সহসা একটা দম্‌কা বাতাসের ঝটকায় কাপড়খানা উড়িয়া পথে আসিয়া পড়িল! ওরে ঈপ্সিত, ওরে বাঞ্ছিত, এ কি! প্রমথ, নন্দনের পারিজাত বুঝি রে তোর ভাগ্যে খসিয়া পড়িল! প্রমথ ঊর্দ্ধশ্বাসে পথে কাপড়ের পিছনে ছুটিল।

কাপড়খানা কুড়াইল। পুলক-কম্পিত আবেগে সেখানা সে বুকে চাপিয়া ধরিল। আঃ, তার অঙ্গ-সৌরভ, তার ললিত স্পর্শ বস্ত্রখানায় জড়িত রহিয়াছে! ধন্য প্রমথ! ধন্য তাহার জীবন! সেলি-কীট্‌সের কাব্য রসাতলে যাক্! বাঙ্গালী কবির বীণা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হউক! এমন জীবন্ত কাব্য, কে কবে উপভোগ করিয়াছে?

বস্ত্রখানি লইয়া প্রমথ মেসে ফিরিল। এখন এখানি লইয়া সে কি করিবে! হাঁ, কাল প্রাতে উঠিয়া নিজে ইহা বহন করিয়া কিশোরীর গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে! আজ রাত্রিটা এ বস্ত্রের মহিমায় পরম তৃপ্তিতে কাটুক! প্রমথ একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনখানি সুদীর্ঘ ফুলস্কাপ কাগজ সেদিন

প্রমথর হস্ত-গ্রথিত মসীর মালায় ভূষিত হইল! লিরিকের স্রোত বহিয়া গেল।

প্রভাতে কম্পিত বক্ষে বস্ত্রখানা সযত্নে ভাঁজ করিয়া লইয়া প্রমথ আসিয়া নায়িকার কুঞ্জ-দ্বারে দাঁড়াইল। পা কাঁপিয়া যায়! বুক ধড়াস করিয়া উঠে! মুখের কথা উদর-গহ্বরে কোথায় লুকাইয়া পড়ে!

কোনমতে সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রমথ বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন চৌবাচ্চার জল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, মৃদু গর্জ্জন করিয়া সবেগে সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইতেছিল। জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। এখনও কি সকলে ঘুমাইতেছে? না, এটা হানা বাড়ী? প্রমথর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। অতি কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া ভাঙ্গা গলায় সে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছেন?" কেহ উত্তর দিল না। কাসিয়া গলাটা সাফ করিয়া প্রমথ এবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "ঝী—"

কে সাড়া দিল, "যাই গো, যাই"। কণ্ঠ কোমল নহে—রীতিমত মোটা গলা! প্রমথর বুকটা আবার ধড়াস করিয়া উঠিল।

এক বৃদ্ধা ঝী আসিয়া দেখা দিল। স্থান বা কাল-মাহাত্ম্যে এই ঝীটিকে প্রেতিনী বলিয়া ভ্রম হইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। প্রমথ চমকিয়া উঠিল। ঝী কহিল, "কি গা বাবু, কি চাও?"

আমতা-আমতা করিয়া প্রমথ জানাইল, ঝড়ে তাহাদের দিদিমণি না আর-কাহার বস্ত্রখানা উড়িয়া গিয়াছিল। সে কুড়াইয়া পাইয়া দিতে আসিয়াছে। ঝীর মুখে হাস্যরাশি বিকশিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীর সৃষ্টি করিল।

ঝী কহিল, "অ মা! তাই বলি, কুথাক্কে গেল? কাপড়খানা খুঁজে খুঁজে সারা হইয়ে গেছনু। ভাবছিনু, বুঝি কোন্ অনামুখো হতচ্ছাড়া আমার অত সাধের কাপড়টুক্ চুরি করলে। তা বেঁচে থাকো, বাবা, অক্ষয় পেরমায়ু হোক। ও কাপড়খানা দিদিমণি পচ্চিম যাবার দিন আমায় দে গেছে। কত বলেছিনু, হেই দিদিমণি, অঙ-করা কাপড়টুক্ দাও, কখনও পরিনি, একবার সাধটা মিটিয়ে নিই—"

প্রমথ স্তম্ভিত হইল। এই কাপড়খানা—! সে কহিল, "তোমার দিদিমণিরা বুঝি এখানে নেই?"

"নাগো বাবু, কত্তা-বাবুর বড় ব্যামো কি না! সে একেবারে বিদিকিচ্ছি ব্যামো! কত চিকিচ্ছেতেও সারছে না! তাই আজ চার-পাঁচ দিন হল, বাবুকে নিয়ে সব পচ্চিম গেছে। আমি একেল্লাটি বাড়ী আগুলে আছি। কাপড়খানা ক'দিন পরছি, ভাবছিনু, আমার বরাতে বুঝি খোয়া গেল! তা তুমি বাবু যে কষ্ট করে অ্যানেছ—"

কাপড়খানা! যেটা সে বিপুল আবেগে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল, যে কাপড়খানায় সেই সুকুমারী কিশোরীর অঙ্গ-সৌরভ অনুভব করিয়া আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, কবিতার পর কবিতা

রচনা করিয়া ফেলিয়াছে, সেখানা এই লক্ষ্মীছাড়া দাসীর ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড! ধিক তাহাকে!

প্রমথ আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুত বাসায় ছুট দিল।

ভোরের আলো

অফিসের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। প্রতি সোমবার দুই-একজন করিয়া হতভাগ্য কেরাণীকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রীতিমত দুর্ভাবনা পড়িয়া গিয়াছিল, কবে হায়, সাধের চাকুরিটি করচ্যুত হয়!

চন্দ্রনাথ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটুকু সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল এই মার্কার জোন্সের অফিসে অতিবাহিত করিয়াছে। হিসাব-বিভাগে সে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী। বেতন কিন্তু পঞ্চাশের উপর উঠে নাই। বেতন-বৃদ্ধির জন্য মনিবকে সে কখনও এতটুকু ধরিয়া পড়ে নাই। এক্ষণে ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় পরিবারে লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, আয়ে আর কুলাইয়া উঠে না! গৃহিণী নিত্য অনুযোগ করে! চন্দ্রনাথ শুধু হাসিয়া বলে, "আজ সাহেবকে বলব।" কিন্তু এই বলা কখনও ঘটিয়া উঠে না।

গৃহিণীর রুক্ষ মেজাজ ও শিশুগুলার দুরবস্থায় চন্দ্রনাথের মন টলিলেও সাহেবের নিকট বেতন-বৃদ্ধির জন্য উমেদারী করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি সাহেব বলে, "না!"

প্রত্যহই সে নিয়মিত সময়ে অফিসে আসিত ও চেয়ারে

চাদরখানি বাঁধিয়া মোটা লেজর-বহি খুলিয়া নিঃশব্দে আপনার কর্ত্তব্য সারিয়া যাইত। হিসাব-নিকাশে এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে সাহেবরা কোনদিন চন্দ্রনাথের এতটুকু খুঁৎ দেখিতে পান নাই—কার্য্যেও তাহার শিথিলতা ছিল না।

চন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে একটু সেন্টিমেণ্ট ছিল। শৈশবে সে একবার কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আজ যদিও তাহার কোন প্রমাণ পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি স্ত্রীর নিকট হইতে দুইটা সোহাগের বাণী ও আদরের সম্ভাষণ পাইলে সে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর অকৃপা ও ষষ্ঠীর কৃপায় ইদানীং সে দুইটি সামগ্রীও বেচারা চন্দ্রনাথের অদৃষ্টে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া রাখা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর ছিল না।

বেচারী গৃহিণীকেও এ বিষয়ে দোষ দেওয়া যায় না। পাঁচ-ছয়টি শিশু যখন অনশনের জ্বালায় চীৎকার-শব্দে ক্রন্দন জুড়িয়া দেয়, একাদশ-বর্ষীয় বালক আসিয়া বলে, বই ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাই পড়া বলিতে না পারায় মাষ্টার মহাশয় পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম দারুণ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছেন, তখন অসহায়া রমণীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা একান্ত দায় হইয়া পড়ে। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার উৎকট বাসনা তাহার তপ্ত হৃদয়-তল হইতে গর্জ্জিয়া উঠে এবং সংসারের প্রতি স্বামী-দেবতাটির আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য দেখিয়া হতাশ্বাসে অভাগিনী নারীর ক্ষুব্ধ অন্তর ভরিয়া যায়। সে সময় স্বামী-দেবতাটি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখে

থাকেন, তবে তাঁহার শিরে বন্যার প্লাবনের মত রোষ ও অভিমানের উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত তরঙ্গ-রাশি সবলে আসিয়া আঘাত করে।

সে দিন ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল! এবং চন্দ্রনাথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া যখন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন গৃহিণী হরসুন্দরী সাভিমানে বলিল, "ও পোড়া আপিস না হয় ছেড়ে দাও, বাবু! বিশ বচ্ছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাকরি করছ—ঝড়-বৃষ্টি, রোগ-শোক মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তাতে দৃক্‌পাতও নেই—তবু সেই পঞ্চাশ টাকা! সংসারে খরচ বাড়ছে বই কমছে না ত! সাহেবদের বুঝিয়ে বল না একবার—এতগুলো মুখে অন্ন দিতে এ টাকায় কুলোয় কখনও?"

চন্দ্রনাথ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সাহেবকে বলি ত—"

"তার কি জবাব দেয়?

"বলে, কাজ কর—বাড়বে বৈ কি!"

"বাড়বে ত, সে কবে বাড়বে? ছেলে-মেয়েগুলোর হাত ধরে আমি চিতেয় সেঁধুলে—"

"না!—তা কেন? তবে কি জান, বিস্তর লোকের চাকরি যাচ্ছে, অফিসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। এ চাকরিটুকুই যদি কোনমতে থাকে ত সে মস্ত বরাত-জোর! তার উপর এখন মাইনে বাড়ানোর কথা—"

"এই বিশ বচ্ছর ত আর আপিস খারাপ চলে আসেনি। কবে

থেকে আমি বলাছ, তা গ্রাহ্যই নেই। গরীবের কথা শুনবে, কেন ?”

“হর—” চন্দ্রনাথ স্ত্রীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, “হর—” তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল।

হরসুন্দরী স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, “ও কি ? চোখে জল এল না কি ! না বাবু, আমার ঘাট হয়েছে ! এমন পান্‌সে লোককে আর কখনও কিছু বলব না। ওদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে—”

হরসুন্দরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে চন্দ্রনাথ বাহিরে রোয়াকে আসিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঝিল্লীর মিশ্র রাগিণীতে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে ! এতটুকু বায়ু নাই ! গাছপালাগুলা অন্ধকারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে ! কি যেন এক বেদনার ভীষণ আঘাতে প্রকৃতির নিশ্বাস-রোধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল, তাহারও অন্তর ঠিক এমনই ! কোথাও এতটুকু আশার আলো নাই, শুধুই অন্ধকার ! দারুণ যন্ত্রণায় তাহারও নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম করিল।

সেদিন সোমবার। অফিসে আসিয়া নিত্যকার মতই চন্দ্রনাথ লেজর-বহিখানি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় চাপরাশি আসিয়া সংবাদ দিল, সাহেব সেলাম দিয়াছেন।

চন্দ্রনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, তাইত, হঠাৎ—!

সাহসে ভর করিয়া সে সাহেবের কক্ষে আসিল।

সাহেব কহিলেন, "চন্দ্রনাথ, অফিসের অবস্থা ত দেখিতেছ! আজ আবার হেড অফিস হইতে পত্র আসিয়াছে, কয়জনকে ছাড়াইবার জন্য—"

চন্দ্রনাথের মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। মাথার ভিতরটা দপ্-দপ্ করিতে লাগিল। এ কথা তাহাকে বলিবার প্রয়োজন কি?

সাহেব কহিলেন, "তুমি আমাদিগের বহুদিনকার পুরাতন কর্ম্মচারী। তোমাকে ছাড়াইতে যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি করিব? আমার প্রতি যে হুকুম হইয়াছে—"

চন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু আজ বিশ বৎসর আমি এই অফিসে কর্ম্ম করছি, সাহেব! কোনদিন বোধ হয় কাজে ত্রুটি পান নি—"

সাহেব কহিলেন, "জানি, সব জানি, চন্দ্রনাথ। তুই মাস পূর্ব্বে তোমায় ছাড়াইবার জন্য পত্র আসিয়াছিল, আমিই বিশেষ চেষ্টায় তাহা রদ্ করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। এবার তুঃখিত চিত্তে তোমাকে বিদায় দিতে হইতেছে। উপায় নাই! তবে হেড অফিস একটু দয়া করিয়াছে, পনেরো দিনের মাহিনা তোমায় অতিরিক্ত দিবার আদেশ পাইয়াছি।"

সে কথা চন্দ্রনাথের কানেও গেল না। সে কহিল, "হিসাব-নিকাশের কাজ তবে চলবে, কি করে?"

সাহেব কহিলেন, "হিসাব কোথায় যে, তার নিকাশ হইবে? কি করিব, বাবু, আমি একান্ত নিরুপায়! গুড্ মর্ণিং—"

চন্দ্রনাথ ধীর পদে বাহিরে আসিল। মনে উদয় হইলেও একবার সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, যে, আজ এই জীবনের অপরাহ্নে ছেলেমেয়েগুলির হাত ধরিয়া আমি কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব, সাহেব?

বাহিরে চারি-পাঁচজন কেরাণী উদ্‌গ্রীবভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাগজের মত তাহার সাদা মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। কৌতূহল-প্রশ্নে মুহূর্ত্তে সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

অবিনাশ কহিল, "এতদিনের লোকটাকে ছাড়িয়ে দিলে হে—"

মধু কহিল, "এই বেলা সরে পড়ে অন্যত্র চেষ্টা দেখা যাক্। ব্যাপার ক্রমে সঙ্গিন হয়ে উঠছে—"

জলধর কহিল, "টাইপিষ্টের চাকরির অভাব নেই। তুমি ত সহজেই একটা জুটিয়ে নেবে। আমরা মাছি-মারার দল এখন যাই কোথা?"

সত্য কহিল, "ব্যবসা করা যাক। কিছু না হয় ত, একটা পান-চুরুটের দোকান, বুঝলে কি না?"

অবিনাশ কহিল, "ঠাট্টা নয়—এ রকম তালপাতার ছাউনি বেঁধে থাকবার চেয়ে, পান-চুরুটের দোকান কি, রাস্তায় কাপড় হেঁকে বেচে বেড়ানোতেও ঢের সোয়াস্তি, ঢের আরাম!"

কথাগুলা চন্দ্রনাথের কানে গেল না। কোনমতে সেই সব কোলাহলের মধ্য হইতে বিদায় লইয়া চন্দ্রনাথ সোজা পথ ধরিয়া, লালদীঘির ধার ছাড়াইয়া, হাইকোর্টের পাশ ঘুরিয়া একেবারে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

মধ্য গগনে সূর্য্য তখন দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পরিশ্রান্ত দুই-চারিজন পথিক বৃক্ষতলে ছায়ার আশ্রয় পাইয়া তৃণ-শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রনাথ ভাবিল, জগতে শুধু ইহারাই সুখী! কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভর চিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়াছে! অদূরে ঐ উচ্চ-শির হাইকোর্ট দেখা যায়! আরও কত অফিস! চারিধারেই লোক অশান্ত চিত্তে শুধু টাকার চেষ্টাতে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। ও খানে মুহূর্ত্তে কেহ রাজা, কেহ বা ফকির হইতেছে! ঠকাইয়া, ভুলাইয়া, তাক্ লাগাইয়া চারিধারে কেবলই পয়সা-উপার্জ্জনের অধীর আগ্রহ! বিপুল ষড়যন্ত্র! পৃথিবীর বিরাট কর্ম্ম-যন্ত্রটা এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে যে ঘর্ঘর রবে ঘুরিতেছে, সে শুধু মানুষ পিষিয়া পয়সা বাহির করিবার জন্য! কিন্তু তবু এই লোকগুলা কেমন নিশ্চিন্ত! কোন অশান্তি নাই! চাকুরি বা আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না—গৃহে রুক্ষ মুখের অকরুণ বাণী শুনিতে হয় না! সেখানে ফিরিলে হয়ত দুইটি প্রসন্ন নেত্রের প্রফুল্ল দৃষ্টি-পাত সমস্ত ক্লান্তি মুছিয়া দিবে! কিন্তু সে? কি বলিয়া সে আজ স্ত্রীর নিকট মুখ দেখাইবে? আর বেচারী স্ত্রীরই বা দোষ কি? অহর্নিশি যাহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, সংসারের সহস্র কষ্ট ভোগ করিতে হয়,

নানা অভাব সামলাইয়া ফিরিতে হয়, বুভুক্ষু অনশন-পীড়িত অসহায় শিশুর ক্রন্দনের উৎপাতে যে বেচারী মুহূর্ত্ত বিরামের অবসর পায় না, তাহার মুখে হাসি আসিবে কোথা হইতে? সে যে এই সংসারে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, সে কাহার জন্য? কিসের আসায়? কি তাহার দায়? কোনদিন কি চন্দ্রনাথ তাহাকে সুখী করিতে পারিয়াছে? সুখী করিবার চেষ্টাও করিয়াছে? শুধু দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ! নাই, নাই, নাই! দিবারাত্রি যেখানে এই ধ্বনি উঠিতেছে, সেখানে গৃহলক্ষ্মীর প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি যে বিরাট ম্লানিমায় আচ্ছন্ন রহিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

চন্দ্রনাথ আরও ভাবিতেছিল, তাহার অসহায় দুর্ভাগা শিশু-গুলির কথা! বেচারা শিশুর দল! কেন তোরা এ গৃহে আসিয়াছিলি? ধনীর প্রাসাদে অজস্র স্নেহ, অসীম সমাদর, অশেষ সম্ভোগ—সব ছাড়িয়া কেন এই নিরন্নের ভগ্ন দীর্ণ কুটীর-কোণে আকাশের নক্ষত্র তোরা খসিয়া পড়িলি? দুষ্ট গ্রহের এ কি দারুণ অভিশাপ!

ক্রমে অদূরে নন্দন-সদৃশ ইডেন উদ্যানের উচ্চ ঝাউগাছগুলার শীর্ষদেশ কনক-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া সূর্য্য পশ্চিমে গঙ্গার কোলে হেলিয়া পড়িল। গাড়ী-ঘোড়ার শব্দে ও লোকজনের কোলাহলে চারিধার মুখর হইয়া উঠিল। দিনের শেষে শ্রমজীবির দল গৃহে ফিরিতেছে! অভাব-হীন বিলাসীর দল ভ্রমণে বাহির হইয়াছে! চারিধারে সুখের নির্ঝর উছলিয়া উঠিয়াছে! এত সুখের মধ্যে

বুকের ভিতর অসীম দুঃখ-ভার বহিয়া চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গৃহের পথে চলিল। সারা পথ শুধু সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, গৃহে ফিরিয়া হরসুন্দরীকে আজ কি বলিবে?

৩

হরসুন্দরীকে চন্দ্রনাথ কোন কথাই খুলিয়া বলিল না। সে স্থির করিল, একেই সে বেচারী এই দুঃখে সারা হইয়া আছে, ইহার উপর যদি সে শুনে, তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, সাধের চাকুরিটি খোয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে! পনেরো দিনের অতিরিক্ত মাহিনা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা কিছুদিন ত কাটানো যাইবে, ইতিমধ্যে সে অন্যত্র একটা চাকুরির যোগাড় করিয়া লইবে। তখন হরসুন্দরীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেই চলিবে, এখন থাক্!

পরদিন হইতে চন্দ্রনাথ নিত্য যথানিয়মে বেলা দশটার সময়েই নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যায়—আবার পাঁচটার সময় গৃহে ফিরে! হরসুন্দরীর মনে এতটুকু সন্দেহ জন্মিবার কারণ ঘটিল না। এটর্ণির অফিসে, হাইকোর্টে ও ছোট আদালতে উকিলদের নিকট চন্দ্রনাথ চাকুরির উমেদারী করিয়া ফিরিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক উত্তর মিলিল; "তোমার বয়স হইয়া গিয়াছে—আর অত মাহিনাই বা কে দিবে?" বেচারা প্রতিদিনই অবসন্ন চিত্তে ঘুরিয়া ফিরে, চাকুরি আর কোথাও মিলে না!

হরসুন্দরী একদিন কহিল, "হ্যাঁগা, তুমি দিন-দিন এমন

শুকিয়ে যাচ্চ, কেন? ভাতে ত বস শুধু, খাওয়া যে একেবারে গেছে! একজন ডাক্তারের কাছে যাও না, একবার। কোন অসুখ-বিসুখ হল, না, কি!"

চন্দ্রনাথের বুকের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পুঞ্জাকারে ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়ার আবার অসুখ! আমরা মলে দুঃখ ভোগ করবে কে?"

হরসুন্দরীর নয়ন-প্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। সে কহিল, "আমি তোমাকে অত কড়া কথা বলি—তাই কি রাগ করেছ?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "না, না, হর, রাগ করিনি! তোমাদের এত দুঃখ-কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না! মাহিনা বাড়াবার জন্য এত বলি, তা সাহেব কিছুতে শোনে না। ভাবছি, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর কোথাও চেষ্টা দেখব!"

হরসুন্দরী কহিল, "না, না, চাকরি ছাড়ে না! আগে কোথাও স্থির না করেই কি অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিতকে ছাড়তে আছে?"

পরদিন চন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলে মধ্যাহ্নে অবিনাশ আসিয়া ডাকিল, "চন্দ্রবাবু—"

চন্দ্রনাথের একাদশ-বর্ষীয় পুত্র দীননাথ আসিয়া কহিল, "বাবা আপিস গেছে।"

"অফিস? কোথাও তাহলে চাকরীর যোগাড় হয়েছে না কি? কত টাকা মাহিনা হল?"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া দীননাথ সবিস্ময়ে অবিনাশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অবিনাশ কহিল, "তোমার বাবা কোন্ অফিসে গেছেন ?"

দীননাথ কহিল, "কেন, আপিস। যে আপিসে বরাবর যায়।"

অবিনাশ কহিল, "মার্কার জোন্সের অফিস ? তা সে অফিস ত আজ দশ-পনেরো দিন হল একেবারে উঠে গেছে—"

দীননাথ কহিল, "কই, বাবা ত আমাদের তা বলেনি। বাবা রোজই আগেকার মত ঠিক সেই সময়েই আপিস যায়।"

অবিনাশ কহিল, "সে কি ? আজ চারদিন আগে তাঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, তিনি বললেন, চাকরীর চেষ্টা দেখছি, সুবিধা হয়ে উঠছে না। আমায় বলেছিলেন, একটা জোগাড় দেখতে—ক'দিন তাই আমার ওখানে যাচ্ছেনও—"

হরসুন্দরী দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল ; পুত্রকে ভিতরে আসিতে সঙ্কেত করিল।

মাতার সঙ্কেতে দীননাথ ভিতরে আসিল। পরে প্রশ্নোত্তরে উভয় পক্ষই ব্যাপারখানা বুঝিল। হরসুন্দরী বুঝিল, আজ দুই মাস হইল, চন্দ্রনাথের চাকুরি নাই ; কিন্তু কথাটা তাহার নিকট সে গোপন রাখিয়াছে। কেন ? পাছে জানিতে পারিলে তাহার মনে কষ্ট হয় ! যে স্বামী তাহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তাহার মুখের একটি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী মাত্র, তাহাকে

হরসুন্দরী রূঢ় বাণীতে অহরহ কিরূপ প্রপীড়িত করে! সে কি নিষ্ঠুর! অবিনাশ বুঝিল, ব্যাপারটা তাহা হইলে চন্দ্রনাথ বাড়ীতে ভাঙ্গে নাই।

অবিনাশ কহিল, সে অন্যত্র নিজের জন্য একটি চাকুরিব যোগাড় করিয়াছে। অফিস ছোট। বেতনও কাজে সামান্য! সেই অফিসে চন্দ্রনাথের জন্যও সে একটি চাকুরি জুটাইতে সমর্থ হইয়াছে। বেতন পঁচিশ টাকা মাত্র। তবে নূতন অফিস, উন্নতি হইলে বেতন বাড়িবারও সম্ভাবনা আছে।

হরসুন্দরী পুত্রকে দিয়া জানাইল, সংবাদটি চন্দ্রনাথেব জন্য লিখিয়া রাখিয়া গেলেই ভালো 'হয়। অগত্যা অবিনাশ কাগজ কলম লইয়া ইংরাজীতে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিল; দীনুর হস্তে পত্র দিয়া কহিল, "এই চিঠিতে আমি সব কথা লিখে গেলুম— তাঁর মতটা শীঘ্র জানা চাই। পারি ত সন্ধ্যার সময় এসে তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করব।"

অবিনাশ চলিয়া গেল।

নিয়মিত সময়ে চন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। হরসুন্দরী পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এ কার চিঠি?"

চন্দ্রনাথ ভিজা গামছায় গায়ের ঘাম মুছিয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়া পত্র খুলিল। হরসুন্দরী নিকটে বসিয়া স্বামীকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পত্র-পাঠ শেষ হইলে তাহার কোটর-গত

শুষ্ক চক্ষু বহুদিন পরে সহসা আজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কে চিঠি লিখলে গা?"

চন্দ্রনাথ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "বড় মুস্কিল হয়েছে—শুনলে তোমার কষ্ট হবে। অথচ তোমায় না বললেও নয়!"

হরসুন্দরী কহিল, "কি বিপদ?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "মাহিনা বাড়াবার জন্য তুমি সাহেবকে বলতে বল। কিন্তু অনেকের চাকরি একেবারেই যাচ্ছে—অফিসের অবস্থা ভারী খারাপ। সাহেব আমায় বলছিল, যদি পঁচিশ টাকায় রাজী হও ত, কাজ কর। না হলে রাখতে পারব না।"

হরসুন্দরী অলক্ষ্যে মৃদু হাসিল, অকম্পিত স্বরে কহিল, "তা তুমি কি বললে?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "আমি বলেছি, ভেবে দেখব, সাহেব! তারপর আজ অন্য কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছিলুম। বাজার একেবারে খারাপ! আর তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে বলে ও মাহিনাতে লোকে নিতে চায় না। সাহেব আমার মত জানতে চেয়েছেন, তাই এই চিঠি—"

হরসুন্দরী বুঝিল, আসল কথাটা স্বামী এখনও গোপন করিতেছেন! হায়, এ গোপন করার অর্থ, এ মিথ্যা বলার অর্থ, আর কিছুই নহে, শুধু অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা হইতে তাহাকে রক্ষা করা!

তথাপি আত্ম-গোপন করিয়া সে কহিল, "তা কি জবাব দেবে, তুমি?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "তাই ভাবছি। এইতেই ত চলে না—পঁচিশ টাকা হলে তোমার কষ্ট আরও বাড়বে, অথচ বাজার যা দেখছি—তুমি কি বল?"

হরসুন্দরী কহিল, "আমি বলি কি, ঐতেই তুমি রাজী হও। কোথায় আবার এ বয়সে আমাদের পোড়া পেটের জন্য কার উমেদারী করতে যাবে?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "কিন্তু চলবে কি করে?"

হরসুন্দরী কহিল, "ভগবান নিরুপায়ের উপায়। তিনিই উপায় করবেন'খন! জীব দিয়েছেন যখন, তখন আহারও তিনি যে করে হোক মেলাবেন!"

কৃতজ্ঞতায় চন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে কহিল, "তাই ত—"

হরসুন্দরী কহিল, "ছেলেবেলায় আমি লেস বোনা আর সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলুম—তাই করব। বাজারে বেচে কিছু পয়সাও ত তা হলে পাওয়া যাবে—"

চন্দ্রনাথ কহিল, "এমনিই তোমার এক দণ্ড অবসর নেই! সংসারের কত কাজ, ছেলে-পিলে দেখা, তাদের মানুষ করা! তার উপর আবার মেহনৎ সহ্য হবে কেন, হর? তার চেয়ে আমিই বরং কোথাও যাতে একটা ছেলে পড়ানো জোটে, তার চেষ্টা দেখি—"

হরসুন্দরী কহিল, "এত মেহনৎ তোমার সহ্য হবে, আর আমার হবে না?"

চন্দ্রনাথ কহিল, "এক দিনের জন্য তোমায় আমি সুখী করতে পারিনি, উল্টে আবার তোমার ঘাড়ে এতখানি বোঝা ফেলে দেব ?"

হরসুন্দরী কহিল, "ও কথা বলো না। সংসারের ভার তোমার একলার নয় ত! এতদিন তা না ভেবে তোমায় আমি কত রুক্ষ কথা বলেছি। জানি, আমাদের জন্য ভেবে তুমি সাবা হয়ে যাচ্ছ। তোমাব সে কষ্ট এতটুকু লাঘব না করে আমি আবও কত কটূ কথা বলেছি—! আমার সে অপরাধ তুমি ক্ষমা কব।"

চন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "হর, আজ এ দারিদ্র্যে সত্যই আমার আনন্দ হচ্ছে। চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা কোন দিন হবে, কি না জানি না; তবে আমার গৃহের লক্ষ্মীকে যে আজ আমার অন্তরের মধ্যে ফিরে পেয়েছি,—এ কি কম সুখ!"

গদ্‌গদ চিত্তে চন্দ্রনাথ হরসুন্দরীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। মিলনের পুলক-স্পর্শে তাহার সকল বেদনা নিমেষে যেন জুড়াইয়া গেল। এমন সময় বাহির হইতে ক্রীড়োন্মত্ত দীনু ডাকিল, "বাবা, অবিনাশবাবু এসেছেন। তোমায় ডাকছেন।"

অতির গতি

শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী ঢাকায় থাকিয়া কলেজে এফ, এ পড়িত। শ্মশ্রু-গুম্ফে সমস্ত মুখখানি আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ কিছুতে রেহাই হইতেছিল না। কলেজ ছাড়িলেই চাকুরিতে ঢুকিতে হইবে এবং বাঁধা মাহিনার চাকর হইলে আরাম-বিলাস ও স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাচারিতায় আঘাত ত লাগিবেই, তদ্ভিন্ন পঁচিশ-ত্রিশ টাকার অতিরিক্ত মাসিক বেতন মিলিবারও সম্ভাবনা ছিল না। তাহার চেয়ে মেসে থাকিয়া কলেজে নামটা লিখাইয়া সুবিধা ও অবসরমত সপ্তাহে তিন-চারি ঘণ্টামাত্র কায়-ক্লেশে ক্লাশে পশ্চাতে কোণের বেঞ্চে বসিয়া, ঢুলিয়া, নিদ্রা দিয়া ও গল্প করিয়া সময়টাও নেহাৎ মন্দ কাটে না—বাকী অবসরটুকু খোস-গল্প ও আমোদ-আহ্লাদে দিব্য উড়াইয়া দেওয়া যায়। শুধু এই কারণেই অল্প-বয়স্ক ছাত্রগণের সহিত কলেজের খাতায় নাম লিখাইতে শ্রীনিবাসের এতটুকু দ্বিধা জন্মিল না। পাঁচবার পরীক্ষার আসনে বসিয়াও যখন কৃতকার্য্য হওয়া গেল না, তখন ষষ্ঠ বার বসিতেই বা আপত্তি কি?

এমন সময় সমস্ত দেশ চকিত করিয়া স্বদেশীর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। বিলাতী বস্ত্র-দাহ ও গগনভেদী বক্তৃতার ধূমে যখন

বাঙ্গালার আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন আসিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী আসরে নামিলেন।

বক্তৃতা-মঞ্চ-গঠনে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা এবং যুগপৎ বিলাতী পণ্য ও লেখা-পড়ায় অগ্নি-সংযোগ-ব্যাপারে তাহাকে অসাধারণ শক্তি ও অবসর প্রয়োগ করিতে দেখিয়া দেশ-নায়ক-গণ 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন। নব-প্রকাশিত 'সম্মার্জ্জনী' পত্রের সম্পাদক চাকুরি-জীবি-গণকে গালি পাড়িয়া এবং এই উদীয়মান স্বদেশ-সেবীর জয়-গীতে আপনার স্তম্ভ ভরাইয়া নগদ দুই পয়সা উপার্জ্জনেরও বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইল।

শ্রীনিবাস যখন আপনাকে মাজিনি-গারিবল্ডির পকেট সংস্করণ ভাবিয়া আত্মহারা হইবার উপক্রম করিয়াছে, সহসা তখন কয়েকজন বিপথ-গামী যুবকের রাজদণ্ড ও পুলিশ-কর্ত্তৃক অত্যাচারীর বাটী-তল্লাসের ঘটায় শ্রীনিবাসের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। সে নিমেষে তখনই মনের গতি অশ্বের রশ্মির মতই টানিয়া সংযত করিয়া লইল এবং ক্ষিপ্র আগ্রহে দুই-চারিজন নিরীহ লোককে পুলিশ-নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া স্বদেশীর পঙ্ক মুছিয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ফলে অচিরাৎ শ্রীনিবাসের লক্ষ্মী ফিরিল এবং সব্-ইন্‌স্পেক্টরের পদে পাকা হইয়া মনসুরগঞ্জ থানার চার্জ্জ বুঝিয়া লইবার জন্য সরকার হইতে তাহার নামে আদেশ-পত্র আসিল।

২

স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যতখানি উৎসাহ সে তৎ-প্রচার-কল্পে প্রদর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেও তাহাব ঠিক ততখানি উৎসাহই দেখা গেল।

এক নিরীহ বেকার মিলের কয়েকখানা মোটা কাপড় আনিয়া ছোট দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল, শ্রীনিবাস আসিয়া তাহাকে ধরিয়া চালান দিল, পার্শ্ববর্ত্তী বিলাতী বস্ত্র-বিক্রেতার সহিত সে দাঙ্গা করিয়াছে। বেচারা বরদা অসুখের দায়ে চাকুরি হারাইয়া সুযোগ বুঝিয়া দেশী শাঁখা এবং "বন্দে-মাতরম্" আলুর চুড়ি ও রুলি মাথায় হাঁকিয়া ফিরিতেছিল, শ্রীনিবাস তাহাকে চালান দিল, মদ খাইয়া সে রাস্তায় হল্লা করিয়াছে! দোলগোবিন্দ সেন বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়াছিল,—অল্প আয়ে সংসারের ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না, তাই সে বেচারা ছোট একটি পাঠশালা খুলিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধেও শ্রীনিবাসের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এক ধারা ছুটিল,—ছাত্রদিগকে বয়কটে উত্তেজিত করিয়া সে পল্লীর বিলাতী পণ্যের দোকান লুট করাইয়াছে। করিমুদ্দি সেখ নীলকুঠির পিক্রু সাহেবের নিকট পাঁওরুটির দামের তাগাদা করিতে গিয়াছিল,—সাহেব হাঁকাইয়া দেওয়ায় দেওয়ানীতে নালিশ রুজু করিবে বলিয়া সে শাসাইয়া আসিয়াছিল। সে কথা ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বেচারা রাত্রে শয্যায় নিদ্রার কোলে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়াছে, শ্রীনিবাসের লোক আসিয়া তাহাকে

ঠেলা দিয়া উঠাইল, কহিল, তাহাকে থানায় যাইতে হইবে। অপরাধ—? পিক্র সাহেবকে না কি সে বোমা ছুড়িয়া মারিতে গিয়াছিল, সাহেব থানায় আসিয়া ডায়েরি করাইয়া গিয়াছে!

এমনই বিবিধ কাল্পনিক উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া ছোট গ্রাম খানিকে সে জ্বালাইয়া তুলিল। গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সকলেই শ্রীনিবাসেব ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। নিরীহ গ্রাম—বক্তৃতার কোন উপদ্রব ছিল না, এতটুকু বালাই ছিল না, তথাপি এ কি বিড়ম্বনা! কি উপায়ে এ বিপদ হইতে নিস্কৃতি লাভ কবা যায়, তাহাই এখন গ্রামের লোকের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সনৎ চাটুয্যে কলিকাতায় বি, এ পরীক্ষা দিয়া অবকাশ-যাপনার্থ গ্রামে ফিরিয়াছিল। ফিরিয়া সে শুনিল, শান্ত গ্রামে এক নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে!

কলিকাতার কলেজে পড়িবার দরুণ হউক, কিম্বা সংবাদ-পত্রাদির সহিত রীতিমত পরিচয় থাকার দরুণই হউক, তাহার বুদ্ধিতে বেশ একটু ধার জন্মিয়াছিল। সে একটা মতলব ঠিক করিয়া রাত্রে মণ্ডলদিগের আটচালায় গোপনে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিল। পাহারা দিবার জন্য লক্ষ্মণ নস্কর দ্বারে খাড়া রহিল। ভিতরে কাগজ, কলম ও কালি লইয়া সুগভীর গবেষণার সূত্রপাত হইল।

এমন সময় দূরে লণ্ঠনের আলো দেখিয়া লক্ষ্মণ আসিয়া চুপি চুপি সংবাদ দিল, "দারোগা বাবু রোঁদে বেরিয়েছেন! এই দিকেই আসছেন!"

তখন গলার স্বর একেবারে হঠাৎ দুই পর্দ্দা চড়াইয়া সনৎ কহিল, "এই যে চারি ধারে ভীষণ দাঙ্গা-গোলযোগ চলেছে—আমাদের গ্রামে সে সব বালাই নেই, এ কেন? এর জন্য ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় ত শ্রীনিবাস বাবুকে।"

নারাণ গ্রামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। সে কহিল, "বটেই ত! ওঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে বলেই না বদমায়েসগুলো শায়েস্তা হয়েছে।"

রাসবিহারী পাল ছোট একটি ড্রগিষ্ট হল্ খুলিয়া নূতন ব্যবসায় সুরু করিয়াছিল। সে কহিল, "তা না ত কি? পিক্র সাহেবটা ত মরেই গেছল, সে কি আর বাঁচত? করিমুদ্দি বেটা ত আর একটু হলেই সাহেবকে সাবাড় করেছিল—"

দীনু মোক্তার কহিল, "সাহেবকে যদি সাবাড় করত, তাহলে কি গ্রামে টেঁকা যেত! রেগুলেশন লাঠি আর স্পেশাল কনষ্টেবলের চাপে গ্রামের মেটে রাস্তা তিন হাত বসে যেত—"

সনৎ কহিল, "সেই জন্যই ত আমার ইচ্ছা, একটা বিশেষ সভা আহ্বান করে শ্রীনিবাস বাবুকে আমরা অভিনন্দন দি। আমরা গ্রামের লোক, এ অভিনন্দন দিলে পর শুধু যে আমাদেরই কর্ত্তব্য পালন করা হবে, তা নয়। শ্রীনিবাস বাবুও যে

সরকারের নিমক খেয়ে এতটা পরিশ্রম করছেন, তাঁর সে পরিশ্রমের মূল্যও না তা হলে কড়া-ক্রান্তিতে আদায় হয়।”

দীনু মোক্তার কহিল, “বটেই ত! এতে তাঁর চাই কি, ডবল্ প্রোমোশন ও হয়ে যেতে পারে।”

নারাণ কহিল, “এমন লোকের প্রোমোশন হলেই না গুণের আদর হয়! আর পাঁচজনও দেখে শেখে।”

সনৎ কহিল, “এতে শ্রীনিবাস বাবুর উৎসাহ বেড়ে যাবে কত! কালে হয়ত তিনি—”

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। সকলে শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, “কে?”

প্রসন্ন কণ্ঠে স্বর ফুটিল, “আমি শ্রীনিবাস—”

সনৎ দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল, “আরে! আপনি? আসুন, আসুন—আমাদের পরম সৌভাগ্য—”

হাতের হুঁকা নামাইয়া আটচালার কোণে বাঁশের গায় সেটি ঠেশ দিয়া রাখিয়া দীনু কহিল, “এতক্ষণ এই আপনার কথাই হচ্ছিল—”

“ধন্য আপনার উৎসাহ!”

“কিবা অধ্যবসায়!”

“আপনার গুণের কি আর তুলনা আছে!”

মধুচক্রে কে যেন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, এমনই ভাব দাঁড়াইল। চারিধারে মধু বর্ষিতে লাগিল।

অপ্রতিভভাবে হাসিয়া শ্রীনিবাস কহিল, “আমার আর কি গুণ আছে, বলুন—!”

সনৎ কহিল, "নেই! বলেন কি, মশায়? এই ত এত লোক সরকারের নিমক খাচ্ছে, কিন্তু এমন পরিশ্রম, এতখানি কর্ত্তব্য-বোধ আর কার আছে, বলুন দেখি! আমরা ত সেই কথাই বলছিলুম—আপনি রাজী হন বা না হন, আমরা মশায় এক প্রকাণ্ড সভা করে আপনার জয় গান করব, এতে আপনি যতই কেন আপত্তি করুন না, আমরা তা শুনছি না—এ কিন্তু পষ্ট বলে রাখছি, হাঁ। তখন যেন দূষবেন না, কি অবৈধ জনতা বলে চালান দেবেন না!"

শ্রীনিবাস কহিল, "হাঁ, হাঁ, বল্লেন কি আপনি—বলেন কি?"

অপ্রতিভ কাষ্ঠ হাসি দাবোগা বাবুর স্বল্প-বিকশিত দন্ত-পংক্তির উপর দিয়া, বিদ্যুতের মত মৃদুভাবে খেলিয়া গেল।

পথ হইতেই আটচালার ভিতর আলো ও লোক-কোলাহলের পরিচয় পাইয়া ভিতরকার কথা-বার্ত্তার আভাষ পাইবার আশায় শ্রীনিবাস আসিয়া চুপিচুপি দ্বারে কান পাতিয়াছিল। পাতিয়া সে শুনিল, ভিতরে তাহারই প্রসঙ্গ চলিয়াছে! কৌতূহলের সহিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল। এবং শ্রবণে এক নূতন রাগিণী ধ্বনিয়া উঠিল! তাহার নিন্দা নহে, গালি নহে, জয়-গান! আশ্চর্য্য! আনন্দের আতিশয্যে দ্বারে করাঘাত করিয়া সকলকে তাই দর্শন দিবার দারুণ প্রলোভন শ্রীনিবাস সম্বরণ করিতে পারিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া অভিনন্দনে সম্মতি দান করিয়া শ্রীনিবাস যখন আটচালা ত্যাগ

করিয়া বিদায় লইল, তখন ভিতরে সকলের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল এবং নয়ন-প্রান্তে সঙ্কেতের উত্তেজনা সহস্র চেষ্টাতেও কেহ রোধ করিতে পারিল না।

বারোয়ারির মাঠে তালি-দেওয়া সামিয়ানা খাটাইয়া প্রকাণ্ড সভার আয়োজন হইয়াছে! পূর্ব্ব ধারে মঞ্চের উপর সভাপতির আসন। তাহার পশ্চাতে ফুলের অক্ষরে 'সোণার বাঙ্‌লা' লেখা হইয়াছে। মণ্ডপের তোরণে লাল-নীল কাগজের উপর জরির পাড় বসাইয়া প্রকাণ্ড অক্ষরে 'বন্দে মাতরম্' জ্বল জ্বল করিতেছে! বাঁশের থামগুলা বিচিত্র বর্ণের কাগজে মণ্ডিত। পল্লীগ্রামে সভা-সজ্জার পক্ষে আয়োজন যতদূর সম্ভব, তাহা করা হইয়াছে, কোনখানে ত্রুটি নাই। বর-সভার মতই মণ্ডপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সভাপতির আসনের দক্ষিণে, চিকের আড়ালে মহিলাগণের জন্যও যথোচিত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তোরণ-দ্বারে সনৎ-প্রমুখ উদ্যোগীগণ দণ্ডায়মান। শ্রীনিবাস এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ভিতরে বালকগণের কোলাহল। সভাপতির আসন-সম্মুখে বসিয়া নীলু গায়েন পাখোয়াজে বোল ফুটাইবার উদ্দেশ্যে ময়দা মাখাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পাখোয়াজের গায়ে চাঁটি লাগাইয়া ধ্বনি পরীক্ষা করিতেছে।

ক্রমে শ্রীনিবাস আসিয়া পৌঁছিল। মহিলাগণ শঙ্খ ও হুলু

ধ্বনি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাজেরও ধারা ঝরিল। দেখিতে দেখিতে মণ্ডপ লোকারণ্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

সভা বসিল। প্রথমেই শ্রীনিবাসের গুণ গান করিয়া তাঁহাকেই সভাপতি বরণ করিবার জন্য প্রস্তাবাদি হইল। তজ্জন্য প্রস্তুত না থাকিলেও আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে শ্রীনিবাস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিল। তখন রীতিমত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথমেই "বন্দে মাতরম্" গীতে সভার উদ্বোধন! আপত্তিতে শ্রীনিবাসের প্রাণখানা ভরিয়া উঠিতেছিল, গায়ে কাঁটা দিল, তথাপি দায়ে পড়িয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে বেচারাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। তাহার পরই ঢাকার প্রসিদ্ধ স্বদেশী বক্তা রঞ্জিনীমোহন নিয়োগী বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। পুলিশ-কর্ম্মচারী হইয়াও যে স্বদেশের সেবায়, কর্ত্তব্যের আহ্বানে শ্রীনিবাস বাবু সমস্ত দ্বিধা-ভয় দূরে ঠেলিয়া আজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে যে শুধু তাঁহারই ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রীতি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা নহে, এবং এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, মনুষ্যত্ব আজ বাঙ্‌লার মাটিতে কিরূপ পরিপূর্ণ বিকাশ-লাভ করিয়াছে! স্বদেশী আন্দোলনের মূল সূত্রটি দেশবাসী আজ কি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিবাসের ললাটে স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। এ কি কাণ্ড! তাহার অভিনন্দন-সভায় স্বদেশীর দুন্দুভি-নাদ করিবার

কি এমন প্রয়োজন ছিল! পুলিশে তাহার শত্রুর সংখ্যা ত অল্প নহে। তাহার অকাল-পক্ক উন্নতিতে অনেকেরই মন ঈর্ষা-বিষে জর্জ্জরিত! তাহাকে একবার পাড়িতে পারিলে সব বর্ত্তাইয়া যায়! যদি তাহারা শুনিয়া ফেলে? সাহেবের কর্ণে যদি ইহার রঞ্জিত বিবরণীর কণামাত্রও প্রবেশ করে? তাহা হইলে যে সর্ব্ব-নাশ! তাহার অন্ন মারা যাইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিবে না! কিন্তু সভার মধ্যে স্পষ্ট বাধা দিতেও রসনা সরিল না! এ কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় আজ ফেলিলে, ভগবান! কম্পিত দেহে শঙ্কিত প্রাণে শ্রীনিবাস চারি দিকে চাহিয়া দেখিল! পুলিশের লোক কোথাও কেহ আছে কি না! ঐ না, একজন—ঐ? না, মনের ভুল! ঐ না, একটা টুপিওয়ালা শির দেখা যাইতেছে? না—।

বক্তৃতা যখন রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছে, বক্তার মুখের বাণী অগ্নির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন সনৎ আসিয়া শ্রীনিবাসের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসেছেন, ঐ কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—ওঁকে কে খপর দিতে গেল, শ্রীনিবাস বাবু?" আর শ্রীনিবাস বাবু! শ্রীনিবাসের মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী যেন সহসা ভূমিকম্পের বেগে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীনিবাস কহিল, "এঁ্যা! তাই ত! কি হবে, সনৎ বাবু? আমায় রক্ষা করুন! এ সবের আমি কিছুই জানি না—আপনারা এ কি করলেন, কি ফ্যাসাদ বাধালেন?"

"তাই ত মশায়, রোহিণী বাবু আমাদের কথা না বুঝে, সভার মর্ম্ম ঠাওরাতে না পেরে কি যে বেমক্কা ধরণে বক্তৃতা সুরু করে দিলেন—ভয়ে আমাদের অবধি বুক কাঁপছে।"

কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীনিবাস উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সবেগে মঞ্চ হইতে যেমন সে নামিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, অমনই একটা পতিত বংশ-খণ্ডে পা বাধিয়া সশব্দে বেচারা পড়িয়া গেল। চারিধারে হাস্য ও করতালির রোল উঠিল!

৮

সাহেবকে বুঝাইবার সকল চেষ্টাই শ্রীনিবাসের ব্যর্থ হইল। সাহেব এক জরুরি তদারকে এ দিকে আসিয়াছিলেন। পথে বিশ্রামার্থ মনসুরগঞ্জ থানায় আসিয়া সব্‌-ইনস্পেক্টর বাবুকে দেখিতে না পাইয়া সন্ধান করিলে একজন জমাদার বলে, ভারী জাঁকালো স্বদেশী সভা আছে; তিনি সেইখানে গিয়াছেন। সাহেব আসিয়া দেখিলেন, সে সভা জাঁকালোই বটে, তবে সে সভায় সব্‌-ইনস্পেক্টর শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী ছদ্মবেশী পরিদর্শক নহে, সভাপতি স্বয়ং!

তিন দিন পরে সব্‌-ইনস্পেক্টরের নামে On H. M. S. খামে মোড়া এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে শ্রীনিবাসের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে পত্র খুলিয়া সে দেখিল, সেখানি বিভাগীয় আদেশ-পত্র—ঝাঁপাকাটি আউট-পোষ্টে জমাদার করিয়া তাহাকে বদলি করা হইয়াছে। দুই দিনের মধ্যে নূতন সব্‌-ইনস্পেক্টরকে চার্জ্জ বুঝাইয়া তাহাকে সেখানে রওনা হইতে হইবে।॥

সমস্ত পৃথিবীখানা শ্রীনিবাসের চোখের সম্মুখে ক্ষুদ্র একটা নীল বর্ণের গোলার মত ঘুরিতে লাগিল।

গোরুর গাড়ীর উপর পেঁটরা বাক্স ও বিছানার মোট-ঘাট চাপাইয়া যেদিন অপরাহ্ণে শ্রীনিবাস সপরিবারে মনসুরগঞ্জ ত্যাগ করিল, সেদিন গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে ডাব ও চিনির পাহাড় জমিয়া উঠিল; সন্ধ্যা-আরতিতেও বিশেষ ধুম বাধিয়া গেল। সে সঘন শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে সন্নিকটস্থ বনের শৃগাল-গুলা অবধি সেদিন সন্ধ্যা-সঙ্গীত অসমাপ্ত রাখিয়াই বন ছাড়িয়া সভয়ে সুদূরে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

জীবন-নাট্য

বন্ধু শম্ভুনাথের সদ্য পত্নী-বিয়োগ-বেদনায় করুণ সহানুভূতি প্রকাশ-কল্পে যোগেশচন্দ্র যে দিন বহু সাধ্য-সাধনার পর গৃহাহূত কন্যাপক্ষকে দর্শনের সহিত স্পষ্ট জবাব দিল, সে বিবাহ করিবে না, বিবাহে তাহাব আদৌ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, সেদিন অন্দরের কক্ষে বসিয়া এ সংবাদ পাইয়া যোগেশচন্দ্রের মাতা প্রমাদ গণিলেন। ধন-জনের এতটুকু অভাব নাই, জ্ঞাতি-দেইজীর নিরানন্দকর দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই, অগাধ সম্পত্তি, নির্দ্দোষ স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত বয়স-সত্ত্বেও পুত্র বিবাহ করিবে না! একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূব চাঁদপানা মুখ দেখিয়া যে বিধবা মাতা সকল শোক ভুলিবেন, ইহ জন্মের শেষ সাধটুকু মিটাইবেন, স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, আর পুত্র কি না অকারণ এমন নির্ম্মমভাবে সে সাধে বাদ সাধিবে!

মাতার আহ্বানে অন্দরে আসিয়া যোগেশ যখন অকম্পিত স্বরে আপনার অভিপ্রায় জানাইল, এবং অভিপ্রায়ের হেতু-প্রকাশেও এতটুকু গোপনতা রাখিল না, তখন মাতার ধৈর্য্যের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল! বিরক্ত চিত্তে মাতা কহিলেন, "এ সব অনাছিষ্টি কাণ্ড, বাপু, আমি বরদাস্ত কর্ত্তে পারব না। আমায় কাশীতে রেখে এস, তার পর যা প্রাণ চায়, কর, আমি কিছু মানা করতে আসবো

না। বন্ধু আছে, বন্ধুই আছে,—তা বলে এত! যত সব অলুক্ষুণে সৃষ্টিছাড়া বাতিক!” মাতার চোখে অশ্রুর প্রবাহ নামিল।

কথাটা যখন উঠিল, তখন তাহা শম্ভুনাথের কর্ণে পৌঁছিতেও বিলম্ব ঘটিল না।

অপরাহ্নে শম্ভু আসিয়া যোগেশকে ধরিয়া পড়িল, “এ কি অন্যায় তোমার, যোগেশ—”

“কি অন্যায়?”

“তুমি না কি বিয়ে করবে না, বলেছ?”

“হাঁ। বিয়ে জিনিসটা যে সকলের কাছেই লোভনীয় হবে, এমন কি কারণ আছে?”

“তবু এ বয়সে বিয়ের প্রতি তোমার এতটা বৈরাগ্যের কারণই বা কি, তা জানতে পারি না?”

উত্তরে গদ্গদ ভাষায় যোগেশচন্দ্র যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ: বিরহী চিত্ত লইয়া বুকের মধ্যে দারুণ হাহাকার পুষিয়া শম্ভু দীর্ঘ জীবন বহন করিয়া বেড়াইবে, আর যোগেশ বিবাহ করিয়া বালিকা পত্নীর অলকে মৃদু দোল দিয়া বা তাহার নাসিকাটী ঈষৎ নাড়িয়া চপল খেলায় লঘু আমোদ-বিলাসে মাতিয়া দিন কাটাইবে, তাহা হইতেই পারে না! বন্ধুর বেদনার অংশ যদি সে আপনার বুকে তুলিয়া লইতে না পারে ত সে কিসের বন্ধু! কেমনই বা তাহার ভালবাসা! আর যে কেহ এমন কাজ করিতে পারে, করুক, কিন্তু তাই বলিয়া যোগেশ তাহা পারিবে না! শেষের দিকটায় যোগেশের স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল!

শম্ভুর সহস্র যুক্তি ও কাতর অনুরোধেও যখন যোগেশের সঙ্কল্প এতটুকু টলিল না, তখন সে অগত্যা নিরুপায় হইয়াই হাল ছাড়িয়া দিল।

তাহার মনে পড়িতেছিল, যোগেশের মাতার কথা, তাঁহার সেই ম্লান মুখ! বিধবা নারীর এ জগতে আর কি বন্ধন আছে? কিসের মায়া? কিসের মমতা? তাহারই জন্য আজ শেষ সাধে বঞ্চিতা অভাগিনী মাতা অন্তরে দারুণ বেদনা বোধ করিতেছেন! কিন্তু উপায় কি?

তথাপি তাহার প্রতি যোগেশের এমন প্রগাঢ় অনুরাগ-দর্শনে মুগ্ধ হৃদয়ে একটু আনন্দ ও গর্ব্বও যে সে অনুভব না করিয়াছিল, এমন নহে।

কিন্তু যোগেশের এ সঙ্কল্প অটল রহিল না। তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে অপর কোন দেবতার কৃপা-দৃষ্টি-লাভ বাঙ্গালীর ছেলের অদৃষ্টে দুঃসাধ্য বা দুর্ঘট হইলেও প্রজাপতি দেবের অকৃপা তাহাকে কখনও বহিতে হয় না! ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তটিকে উপলক্ষ করিয়া অনঙ্গ তাঁহার পুষ্প-শর তরুণ বাঙ্গালীর শিরে নিক্ষেপ করেন, নিপুণ জ্যোতিষীর সুদক্ষ খড়ির রেখায় তাহা ধরা না পড়িলেও অনঙ্গ আপন কর্ত্তব্য নির্ব্বিঘ্নেই সম্পাদন করিয়া যান। মাতুলালয়ের নিকটে এক ধনীর গৃহ-ছাদে গৃহ-স্বামীর একাদশ-বর্ষীয়া কুমারী কন্যা সঙ্গিনীগণ সহ খেলিয়া বেড়াইত; যোগেশ

প্রায়ই মাতুলালয়ে আসিত এবং এই বালিকাটিকেও যে নিত্য দেখিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু ঠিক কোন্ বিশেষ মুহূর্ত্তটিতে বালিকার মুখের কমনীয়তা ও রূপের জ্যোতিটুকু যোগেশের মনে সুদৃঢ় রেখা টানিয়া দিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য! তবে সহসা যেদিন দেখা গেল, যোগেশের অটল চিত্ত গিরিশৃঙ্গে তপস্যা-রত ধূর্জ্জটির চিত্তেব মতই বিপর্য্যস্ত হইয়া দীপ্ত তরল বাসনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সেদিন আর বুঝিতে বাকী রহিল না, অনঙ্গ পুষ্পধনুর সাহায্যে তাঁহার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ইহার ফলে কয়েকদিন পরেই টোপর মাথায় দিয়া বর সাজিয়া যোগেশচন্দ্র অমিয়বালাকে বিবাহ করিয়া মাতার মুখে প্রসন্ন হাস্য ও আপনাব হৃদয়ে আনন্দের নির্ঝর খুলিয়া দিল। বন্ধু শম্ভু বিদ্রূপের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। উত্তরে যোগেশ কহিল, দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদ গ্রহণ বা অগ্রহণে যখন অবস্থা সমানই, তখন মূঢ়ের ন্যায় স্বাদ-গ্রহণে বঞ্চিত থাকিয়া পস্তানো অপেক্ষা স্বাদ গ্রহণ করিয়া পস্তানোটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ! তাহাতে তবু একটা লাভ আছে,—রসনেন্দ্রিয়ের সহিত একটা অভিনব বস্তুর পরিচয় ঘটে।

তাহাব পর শুধুই আলো, হাসি ও গানের লহর! সে এক নূতন আনন্দের রাজ্য আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া যোগেশের নয়ন-সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল! যোগেশের মনে জাগিল, মেঘদূতের কবির কথা! স্বর্গের কোণ খসিয়া যেন মলিন মর্ত্ত্যে নামিয়া

আসিয়াছে! প্রত্যহ নব নব আশা, নব নব আনন্দ! পারসী কবির গান তাহার মনে পড়িল,—এ যেন কোন্ বেহেস্তের পরী স্বর্ণ-সাকী ভরিয়া তাহার তৃষিত মুখের সম্মুখে ধরিয়াছে! তরল ফেনিল উচ্ছল মদির-রাশি সে পাত্রের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে! বিচিত্র রঙ্গিন নেশায় যোগেশ মাতিয়া উঠিল। সে বিহ্বল হইল। বালিকার প্রেম, এমন মধুব, এমন কোমল,—সত্যই যেন এ কামিনীর পাপড়িটুকু! ভ্রমরেব চরণ-ভরও বুঝি সহে না! এই প্রেম, সে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল? কি মূঢ়, নির্ব্বোধ সে!

মান-অভিমানের শত তুচ্ছ কাহিনীটিও উন্মত্ত আবেগে কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে সে রঞ্জিত দেখিত! এমন স্থর কোন সঙ্গীতে ফুটে নাই, এমন ছন্দ কোন কাব্যে ঝরে নাই!

এ আনন্দের অংশ হইতে শম্ভুকে সে বঞ্চিত করিত না! শম্ভু সব কথা শুনিত, শুনিতে আগ্রহও দেখাইত! যোগেশের চিত্ত মুগ্ধ লুব্ধ হইয়া পড়িত—কোন কথা সে গোপন করিত না! সে যেন গোমুখী ভেদ করিয়া গঙ্গার তরল বারিরাশি সহস্র ঝর-ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িত!

যোগেশ আসিয়া বলিল, "কাল ভারী মজা হয়ে গেছে, শম্ভু—"

সাগ্রহে শম্ভু বলিল, "কি মজা? বল! আমি তাই ভাবছি, কখন তুমি আসবে! আজ তোমার একটু দেরী হয়ে গেছে।"

যোগেশ কহিল, "ওঃ! সে বড় মজা! অমিই ত দেরী করে

দিলে। নিজের হাতে সে আজ কোকো তৈরী করে ছিল। আমায় খাওয়াবে বলে ধরেছিল—খাইয়ে তবে ছাড়লে। সে যা হয়েছিল—"

শম্ভু কহিল "কেমন ?"

"চমৎকার, শম্ভু! তোমায় বললে ভাই, বিশ্বাস করবে না, এমন স্থন্দর কোকো আমি জীবনে কখনও খাইনি।"

"বাঃ! ছেলেমানুষ, অথচ কেমন গুণ! যাহোক এ অধমকেও একদিন শ্রীহস্তের তৈরী অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করতে অবসর দিয়ো, অনুগৃহীত হব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! আজই সন্ধ্যার সময় যেয়ো। আমার ওখানে নিমন্ত্রণ রৈল। কোকো খাবে, আর ডিমের বড়া, চিঙড়ির ক্যাট্‌লেট্‌—ওঃ, অমি যা খাসা সব তৈরী করতে পারে!"

"বটে! আব দেখ দেখি, যোগেশ, তুমি বিয়ে করতে চাইতে না! তারপর কাল রাত্রের কথা কি বলবে বলছিলে, বল, শুনি!"

যোগেশ কহিল, "সে হল কি, জান,—কাল যখন অমি শুতে এল, তখন আমি চুপটি করে বিছানায় পড়েছিলুম। অমি এসে ডিপে থেকে একটা পান নিয়ে আমায় খাইয়ে দিলে, এটি আমাদের নিত্যকার রুটিন হয়ে গেছে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলুম। অমি আমার পিঠের উপর মাথা রেখে বললে, "কথা কবে না, আমার সঙ্গে? রাগ করেছ, বুঝি?" আমি তার দিকে ফিরে আর একটা নিশ্বাস ফেললুম—

মনে যেন কতই কষ্ট হয়েছে, আর কি!” যোগেশ হাসিতে লাগিল।

শম্ভু কহিল, “তার পর?”

যোগেশ কহিল, “আমি বললুম, ‘একটা কথা ভাবছি।’ অমি বললে, ‘কি কথা?’ আমি বললুম, ‘সে কথা আর শুনে কাজ নেই! শুনলে কষ্ট পাবে।’ তবু সে ছাড়ে না! বলতেই হবে! শেষে আমি বললুম, ‘কদিন একটু খুক্-খুক্ করে কাশছিলুম, কাশীর সঙ্গে দু’এক ফোঁটা রক্তও আজ সকালে পড়ল দেখে নগেন ডাক্তারের কাছে গেছলুম। তিনি বুক-টুক দেখে বললেন, ‘তাই ত, বুক একটু খারাপ হয়েছে!’ আঃ, শুনেই ত অমির মুখখানা পাঁশের মত সাদা হয়ে গেল। সে বললে, ‘খারাপ হয়েছে? তা কোন ওষুধ নিলে না কেন?’ আমি বললুম, ‘আর ওষুধ! এ রোগ কি ওষুধে সারবার? যক্ষ্মা কি ওষুধে সারে, অমি? শুনেছ কখনও? তাই ভাবছিলুম, আমার ত দিন ফুরিয়ে এল, আমি মলে তোমার কি হবে? সে দুঃখ কি করে তুমি সহ্য করবে? তোমার কথাই শুধু পড়ে পড়ে ভাবছিলুম। কেন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল? এই বয়সে তোমার সব সাধ ফুরিয়ে যাবে!”

শম্ভু কহিল, “শুনে সে কি বললে? তুমি কিন্তু আচ্ছা এ ত!”

যোগেশ সানন্দে কহিল, “শোনই না তারপর মজাটা। অমির দুই চোখ জলে ভরে এল। ঘরে বাতি জ্বলছিল, তারি

অস্পষ্ট আলোয় আমি দেখলুম, এক ফোঁটা দু ফোঁটা করে অমির চোখে শেষে বন্যা নামল! দেখে আমার ভারী কষ্ট হল,—সত্যই আমি নিষ্ঠুর! তখনি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললুম, 'নারে পাগলী, অসুখ-বিসুখ হবে কেন, আমার? আমি শুধু তোমায় ভয় দেখাচ্ছিলুম যে, দেখি, শুনে তুমি কি কর!' চোখের জল মুছতে মুছতে অমি বললে, 'কি আবার করব?' আমি বললুম, 'তবু বলই না, যদি সত্যি হত, তাহলে কি করতে?' তা অমি কি বললে জান, শম্ভু?"

"কি?"

"সে বললে, 'সত্যি হলে যা করতুম, তাও ঠিক করে ফেলেছি।' আমি বললুম 'কি করতে, তুমি?' সে বললে, 'তোমার এঁটো খেয়ে আমিও ঐ অসুখ করতুম।' আমি বললুম, 'কি করে এঁটো পেতে?' সে বললে, 'কেন, তোমার চিবুনো পান খেয়ে।' আমি বললুম, 'তোমায় দিতুম কেন?' সে বললে, 'নাই দিতে! আমি নিজে জোর করে তোমার মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে পান বের করে নিতুম, তা হলে?' সত্যি, ভাব দেখি, ভাই শম্ভু, অতটুকু মেয়ে, তবু কি তার বুদ্ধি! এর কাছে কোথায় লাগে, তোমার বঙ্কিম-বাবুর সূর্য্যমুখী!"

শম্ভু কহিল, "ছি, ছি, এমন নিষ্ঠুরভাবে তুমি তাকে আর আঘাত দিয়ো না, যোগেশ।"

আনন্দে, গর্ব্বে যোগেশের চোখে জল আসিয়াছিল। তাহা

মুছিতে মুছিতে সে বলিল, "না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কখনও এমন করব না।"

ইহার দুই দিন পরে আবার প্রভাতে আসিয়া যোগেশ কহিল, "কাল আর এক মজা হয়ে গেছে, শম্ভু।"

"আবার কি হল?"

যোগেশ কহিল, "কাল রাত্রে বেল ফুলের বেশ একটি বড় গোড়ে পেয়েছিলুম। সেটা আমি অমির খোঁপায় জড়িয়ে দিলুম, সে খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। আবার সেটা আমি তাব খোঁপায় পরালুম, সে-ও আবার খুলে ফেললে। সে বায়না নিলে, ও মালা আমায় গলায় দিতে হবে, খোঁপায় সে কিছুতে লাগাবে না, আমারও গোঁ হল, আমি গলায় পরবো না, তাকেই খোঁপায় দিতে হবে! কেউ হঠব না! শেষে আমি রাগের ভাব দেখিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম, অমির সঙ্গে আর কথাটি কইলুম না। অমি এসে আমার পিঠে মাথা রেখে কত সাধ্য-সাধনা, শেষে কান্না! তবু আমি কথা কইলুম না। ভাবলুম, আর একটু মজা দেখি! তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম,—ক' রাত্তির রীতিমত জাগা যাচ্ছে, ঘুমেরই বা অপরাধ কি, বল?—শেষ যখন ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি, আমার পায়ের উপর মাথা রেখে অমি ঘুমুচ্ছে! চোখের জল শুকিয়ে মুখখানিতে এমন একটি মলিন ছাপ রেখে গেছে! অজস্র চুমো দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে আমি তখন বুকে টেনে নিলুম।"

এমনই নব নব কাহিনী শুনাইতে নিত্য যোগেশ শম্ভুর কাছে ছুটিয়া আসিত। কাহাকেও না জানাইলে যেন এ আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না! কাজেই এ কাহিনী শুনাইতে যোগেশের আগ্রহ যেমন, শুনাইয়া আনন্দ তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইত।

শম্ভু শুনিত, শুনিয়া আপনার মনে সে প্রার্থনা করিত, আহা, ভগবান ইহাদিগকে সুখে রাখুন! তাহার আর কোন সাধ নাই, বন্ধুকে সুখে থাকিতে দেখিলে তাহাব ব্যর্থ জীবন তবু কিছু সান্ত্বনা, কিছু সুখের স্বাদ পায়!

সহসা একদিন শম্ভুকে অফিসের কাজে পশ্চিম যাইতে হইল। পশ্চিমে অফিস উঠিয়া গেল। হয়, সেখানে যাইতে হইবে, চল! নয়, চাকুরি ছাড়! অনেকে সে চাকুরি ছাড়িয়া অপর চাকুরির জোগাড় করিল, শম্ভু বিদেশে গেল।

যোগেশ কত অনুরোধ করিল, "তোমার কি দরকার, চাকরি করবার? আর যদি করতেই হয় ত, এখানে কি অন্য চাকরি মিলবে না?"

শম্ভু কহিল, "বিধবা বোনদুটি, তাদের ছেলে-মেয়েবা, সব যে আমারই মুখ চেয়ে আছে, যোগেশ! আজ যদি আমি চাকরি ত্যাগ করি, তাহলে যে তাদেরও ত্যাগ করতে হয়। তাদের আর অন্য আশ্রয় কে আছে, বল? ভাগনে

ছুটিকে মানুষ করতে হবে, তিনটি ভাগ্নী,—তাদের বিয়ে দিতে হবে। বিদেশে গেলে সাহেবের নজরে পড়া যাবে, উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।”

যোগেশ কহিল, “ওদেরও সব নিয়ে যাচ্ছ বুঝি?”

শম্ভু কহিল, “নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি? এখানে একটা সংসার, সেখানে আর একটা, ছুটো চালানো কি আমার কাজ? তা ছাড়া বিপদ-আপদও আছে। নিয়ে যাওয়াই উচিত। তুমি চিঠি-পত্র দিয়ো। অমিব কথা মুখে যেমন আমায় বলতে, চিঠিতেও তেমনি সব খুলে লিখো।”,

বেদনা ও অশ্রুর মধ্যে ছুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হইল। ছুই জনেরই প্রাণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আশৈশব একত্র পাঠ, একত্র ভ্রমণ ও একত্র বাসে ছুইটি হৃদয় মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। ছুইজনেই ভাবিত, চিরদিন এমনই আনন্দে দিন কাটিবে! কিন্তু হায়, অদৃষ্টের নির্ম্মম ইঙ্গিতে আজ সব কেমন উলট-পালট হইয়া গেল।

বিদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম শম্ভু প্রায় প্রত্যহই যোগেশের পত্র পাইত! সে পত্রে অমির প্রতি যোগেশের সুগভীর প্রেম ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডের মত ঝকিয়া উঠিত। ক্রমে পত্রের সংখ্যা ও কলেবর কমিয়া আসিল এবং ছুই বৎসর পরে শম্ভু নয় মাসে ছয় মাসে যোগেশের পত্র পাইত। অদর্শনে যে তাহাদের সখ্য ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া পরে মিলাইয়া যাইতে পারে,

এ কথা পত্র না পাইলেও শম্ভুর মনে নিমেষের জন্য উদয় হয় নাই।

অফিসে কাজ-কর্ম্মের কোলাহলে পীড়িত-হৃদয় শম্ভু অবসর পাইলেই যোগেশকে পত্র লিখিত। যোগেশের এই নির্লিপ্ততায় সে বিদ্রূপ করিয়া লিখিল, "প্রিয়াকে পাইয়া যে প্রিয়কে একেবারেই পরিত্যাগ করিলে! তোমাদের লীলাকুঞ্জে ফুল-জোগানোর ভার যে স্বেচ্ছায় লইয়াছে, তাহাকে সে অধিকার হইতে সহসা বঞ্চিত কর কেন?"

উত্তরে যোগেশ লিখিল, "আমার কথা ছাড়িয়া দাও। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না! আমার চিত্তে ক্লৈব্য দেখা দিয়াছে। আমার আর আশা নাই!"

প্রায় সাত বৎসর পরে দুই মাসের ছুটি পাইয়া শম্ভু কলিকাতার ফিরিল। ভগ্নী ও ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীরা কর্ম্মস্থলেই রহিল। দুইটি ভাগিনেয়ীর জন্য পাত্র স্থির করাই তাহার কলিকাতা-আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল!

অপরাহ্ণে শম্ভু যোগেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নূতন ভৃত্য তাঁহাকে চিনিত না, বৈঠকখানা খুলিয়া বসিতে বলিল। শম্ভু কহিল, "তোর বাবু কি করছে রে?"

ভৃত্য বিনীতভাবে জানাইল, বাবু এখন ঘুমাইতেছেন। এমন অবেলায় ঘুম? ভৃত্য কহিল, কাল বাড়ী ফিরিতে রাত্রি গভীর

হইয়াছিল,—এমন প্রায়ই হয়,—কাজেই বাবু দুপুর বেলায় নিদ্রা গিয়াছেন। তবে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উঠিবেন, উঠিয়া স্নানাদি করিবেন।

শম্ভু আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল; টেবিলের উপব একখানা পুরাতন এল্‌বাম পড়িয়াছিল, তাহারই পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিল। তাহার ফটো, যোগেশের ফটো—এক খানিতে শম্ভু ও যোগেশ একত্র—শম্ভু বসিয়া, যোগেশ বন্ধুর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া! পাশে একটি শ্বেত পাথরের টেবিল, টেবিলের উপর ফুলদানী, ফুলদানীতে পশমে রচিত কৃত্রিম ফুলের তোড়া। এ ফুলের তোড়াটি শম্ভুর পত্নী চারুর স্বহস্ত-রচিত। সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া চারুর নিকট হইতে যোগেশ এটি আদায় কবিয়াছিল। একখানি ফটোতে বিবাহ-বেশে শম্ভু ও চারু! চারুর সুন্দর মুখখানি কোমল শান্ত শ্রী ও সরমের রাগে কি কমনীয় লালিত্যে ভরিয়া রহিয়াছে! তরুণ শম্ভুর চোখে প্রসন্নতা ও লজ্জাটুকু সুনিপুণ ফটোগ্রাফাব যন্ত্র-সাহায্যে দিব্য ফুটাইয়া বাহির করিয়াছে! আর একখানি ফটোতে যোগেশ ও অমিয়! উভয়ের বিবাহ-বেশ! রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে অমিয় ও যোগেশ উভয়েরই মুখে সৌন্দর্য্যের সহিত একটা ম্লানিমা জড়িত রহিয়াছে! অমিয়র মুখখানি কি সুন্দর! কুঞ্চিত কেশের রাশি—চূর্ণ কুন্তলগুলা উড়িয়া ললাটের উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ চোখ দুইটিতে কি গাঢ় নির্ভরতা, সুগভীর আশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে! এক স্বর্গীয় বিভায় সে মুখ

মণ্ডিত! যোগেশের মুখে হাস্য-রেখা সুস্পষ্ট সূচিত! শম্ভুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। এই যোগেশ, যাহার সুখের জন্য অকাতরে সে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পাবে! সেই যোগেশ আজ তাহাকে একখানি চিঠি দিবারও অবসর পায় না! কেন? কি তাহার এত কাজ? সে ত অবসর পায়! অফিসের সহস্র কাজের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়াও ত সে যোগেশকে পত্র দিবার সময় করিয়া লইয়াছে! সে ভাবিল, যোগেশের সহিত একবার দেখা হৌক, ইহার একটা বুঝা-পড়া সে করিবেই! সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না। অভিমান'! হাঁ, অভিমান একটু হইয়াছে বৈ কি! এমন ব্যবহারে কাহার না হয়?

পুবাতন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "এ কে, শম্ভুবাবু যে? তারপর কবে এলেন? ভালো আছেন? বাড়ীর সব খবর ভালো? দিদিমণিরা? দাদাবাবুকে খপর দেওয়া হয়েছ ত?"

শম্ভু এলবাম বন্ধ করিয়া কহিল, "কে, মাণিক যে! তুমি ভালো আছ? হাঁ, আমাদের সব খবর ভালোই। যোগেশ খপর পেয়েছে কি না, জানি না ত! এ বাড়ীর সব খপর ভালো?"

"ভালো আর কৈ, বাবু? দাদাবাবুর একটি খোকা হয়েছিল, আজ বছর দুই হল। আহা, চাঁদের মত ছেলেটি! তা আমাদের বরাতে থাকেঁবে কেন? চলে গেল! ছেলে ত নয়, যেন হীরের টুক্‌রো! কোলে-পিঠে করে বেড়াতুম, তা—" বৃদ্ধের চোখে জল আসিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে বলিল, "দাদাবাবুকে আমি খবর দিয়ে আসিগে।"

মাণিক চলিয়া গেলে শম্ভু ভাবিল, যোগেশের একটি পুত্র হইয়াছিল! কৈ, সে সংবাদ যোগেশ ত তাহাকে দেয় নাই! ষ্টুপিড! আজ আসুক যোগেশ, শম্ভু একটা কাণ্ড বাধাইবে!

নিদ্রা-কাতর চক্ষে যোগেশ আসিয়া কহিল, "আরে শম্ভু যে। কবে এলে? আমি ত তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছি। কোন খোঁজ নেই, খবর নেই,—কিছু না—"

যোগেশের কথায় বাধা দিয়া শম্ভু কহিল, "চমৎকার! খোঁজ-খবর নেই, কার? আমি বরাবর নিয়মিত চিঠি দিয়ে আসছি, তোমারই ত উত্তর দেবার নামটি নেই! সে জন্য আমার আসা সম্বন্ধে আগে তোমায় কোন খপরই দিইনি! এখন অনেক বোঝা-পড়া আছে! প্রেয়সীর গ্রাস থেকে একবার যখন তোমাকে ছাড়া পেয়েছি, তখন তিন-চার ঘণ্টা ত আর এখন ছাড়ছি না। আমার আরজী আছে, বেশ লম্বা আবজী, আগে তার জবাব দাখিল কর, না হলে এক তরফা ডিক্রী করে নোব। বুঝলে? উল্টো চাপ আমার উপর? বটে!"

যোগেশ কহিল, "আচ্ছা, সে সব পরে হবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এল। এসেছ, ভালই হয়েছে! আজ আবার থিয়েটারে যাব ঠিক করেছি। থিয়েটারে একখানা নূতন বই খুলছে। তা বেশ হল, দুজনে যাওয়া যাবে'খন। কি বল?"

শম্ভু কহিল, "কিন্তু দুটি সারা রাত্রি ট্রেণে কাটিয়ে—"

যোগেশ বাধা দিয়া কহিল, "না, না, কিছু কষ্ট হবে না।

বেশীক্ষণও থাকব না। এখানেই মুখ-হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর। আমি তা হলে চট্ করে স্নানটা সেরে নি।"

তর্কাতর্কি ও কোলাহল সে রাত্রির মত স্থগিত রাখিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া থিয়েটারে চলিল। যোগেশের ব্রুহামে ইলেক্‌ট্রিক আলো লাগানো দেখিয়া শম্ভু ঈষৎ বিস্মিত হইল। তাহার পর বন্ধুর বেশভূষাতেও অসাধারণ পারিপাট্য! শম্ভু ভাবিল, সে যাহা আশঙ্কা করিত, বুঝি বা তাহাই ঘটিয়াছে! নিকটে থাকিয়া যে প্রলোভন হইতে বন্ধুকে সে সর্ব্বদা দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত, করিয়া সক্ষমও হইয়াছিল—সেই সর্ব্বগ্রাসী বড়মানুষি চাল যোগেশকে বেশ পাইয়া বসিয়াছে! ইচ্ছা হইলেও প্রথম দিন আর শম্ভু এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না, কোনমতে ইচ্ছাটাকে দমন করিল।

যোগেশের প্রকাণ্ড কালো জুড়ি আসিয়া থিয়েটারের দ্বারে দাঁড়াইল। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। যোগেশ ও শম্ভু গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে আসিল।

দ্বিতলে বক্স রিজার্ভ ছিল। থিয়েটারে নূতন বহির প্রথম অভিনয়-রাত্রে যোগেশের জন্য প্রায়ই একটি বক্স রিজার্ভ থাকে। প্রকাণ্ড এক ফুলের তোড়া আনিয়া স্বত্বাধিকারী স্বহস্তে তাহা যোগেশকে উপহার দিল। থিয়েটারের ভৃত্য প্রকাণ্ড গড়গড়া

আনিয়া বক্সে রাখিল। বরফ-লিমনেড এবং মিঠা পানের দোনাও বাদ পড়িল না।

যোগেশের বস্ত্রাদি হইতে পুষ্পসারের একটা তীব্র মিষ্ট গন্ধ উত্থিত হইয়া সমগ্র রঙ্গ-গৃহটিকে বিস্মিত পুলকিত করিয়া তুলিল। নীচেকার দর্শকের দল সসম্ভ্রমে উপর-পানে চাহিয়া দেখে, মস্ত এক ফ্যাশনেব্‌ল্‌ বাবু আসিয়া বক্স রিজার্ভ করিয়া বসিয়া গিয়াছে। যোগেশের চারিটা অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়কের মণি-মাণিক্য আলোক-রশ্মি-পাতে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল সহস্র ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া তুলিতেছিল। ভাবী অভিনয়ের উৎকর্ষ-সম্ভাবনায় নীচেকার দর্শকের দল আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শম্ভুর নিকট কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার কদর্য্য বিসদৃশ ঠেকিতেছিল! তাহার সমগ্র অন্তর কি এক ক্ষুব্ধ বেদনায় গুমরিয়া উঠিতেছিল!

ঐক্যতান-বাদনের পর পট উঠিল। অভিনয় আরম্ভ হইল। অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত তানলয়-হীন একটা গান গাহিয়া প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন চুমকি-আঁটা খাটো ঘাগরা-পরা নটী অবতরণিকা শেষ করিলে নাটকের আখ্যান দেখা দিল।

অশ্লীল রুচি! কদর্য্য বহি! কদর্য্যতর অভিনয়-ভঙ্গী! তথাপি দর্শকের উৎসাহ দেখে কে! দর্শকের দলে হাসির তরঙ্গ খেলিল, করতালির বজ্র-নাদ উঠিল।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে শম্ভু কহিল, "তুমি কি বসে আগাগোড়া এই বই দেখবে না কি হে?"

যোগেশ কহিল, "কেন, তোমার ভাল লাগছে না? আমোদ-আহ্লাদ মন্দ কি চলছে?"

শম্ভু কহিল, "রাম বল! এর চেয়ে পথের ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি খেলেও সুখে রাত কাটে!"

যোগেশ কহিল, "বেশ, তবে ওঠা যাক। কিন্তু যাবার সময় পথে একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব।"

উভয়ে উঠিল। স্বত্বাধিকারী 'হাঁ-হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিল। যোগেশ কহিল, "আমার এই বন্ধুটির জন্য উঠলুম, দু রাত্তির ওঁকে ট্রেণে কাটাতে হয়েছে, আবার আজ সারা রাত ধরে থিয়েটার দেখা- "

স্বত্বাধিকারী সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত কহিল, "কিন্তু আজ ত সারা রাত থাকতে হবে না! রাত তিনটেয় আজ থিয়েটার ভাঙ্গবে,—নতুন বই কি না!"

"থাক্! তার জন্য ভাবনা কি? আর একদিন আসব। বেশ বই হয়েছে! খাসা বই! মার্কণ্ড বাবুর লেখা না? খাসা! যেমন প্লে, তেমনি বইয়ের বাঁধুনি!"

গাড়ীতে উঠিবার সময় যোগেশ বন্ধুকে কহিল, "তোমার এ শুচি-বাইত্ব আর ঘুচল না! বিশেষ তোমার স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে তোমার যা চাল হয়েছে, তাতে দেখছি তুমি এখন যেন ঠিক একটি মদ্দ বিধবা দাঁড়িয়েছ! কোন আমোদ নেই, সখ নেই, কি এ!"

৬

গাড়ী আসিয়া এক সজ্জিত বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। দেউড়িতে টুলের উপর তকমা-আঁটা এক দ্বারবান বসিয়াছিল। যোগেশ ও শম্ভু নামিলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া সে অভিবাদন করিল। দ্বার অতিক্রম করিয়াই দালান। দালানের দুই ধারে নানা-জাতীয় পাম সাজানো, মধ্যে সরু পথ!

উভয়ে সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে সজ্জিত কক্ষে আসিল। ঘরখানির মেজে কার্পেটে মোড়া। কার্পেটের উপর এক পাশে গদি-পাতা শুভ্র বিছানা। অপর পাশে গৃহ-কোণে প্রকাণ্ড অর্গিন। গৃহখানি সুসজ্জিত। দেওয়ালে চিত্র, বিলাতী সুন্দরীগণের নগ্ন মূর্ত্তি! আর্টের চরম হইলেও সেগুলিকে সুরুচির নিদর্শন বলা যায় না!

শম্ভুকে বসাইয়া যোগেশ উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। ব্যাপারটা শম্ভুর নিকট আগাগোড়াই একটা দুর্ব্বোধ জটিল হেঁয়ালির মত মনে হইতেছিল। সে দারুণ সমস্যায় পড়িয়াছিল।

সে সমস্যার কোনরূপ একটা সমাধান করিয়া লইবার পূর্ব্বেই এক নারীর হাত ধরিয়া যোগেশ কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল। নারী সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! সে রূপে মোহের উদয় হয়, তবে তাহাতে যেন স্নিগ্ধতার একান্ত অভাব! এত রূপেও নারীর শ্রীটুকু তেমন খুলে নাই! এ রূপে কেমন-একটা দাহ আছে।

নারীর দিকে চাহিয়া বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া যোগেশ কহিল,

"বিজু, আমার এই বন্ধুটি ভারী রুচি-বাগীশ। এঁর সঙ্গে যদি আলাপ জমাতে পার, তা হলে বুঝি, তোমার বাহাদুরী!"

ব্যাপার বুঝিতে শম্ভুর আর বিলম্ব ঘটিল না। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌-চন্‌ করিয়া উঠিল। এই সেই যোগেশ! এই নারী,—তাহার বন্ধু! ইহার সহিত এমন সহজ-কৌতুকে সে আলাপ করিতেছে!

দ্রুত সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদরখানা কাঁধে তুলিয়া লইতেই যোগেশ কহিল, "ওকি হে, উঠলে কেন? বস!"

"না, আমি এখনই যেতে চাই,—"

বিজলী কহিল, "কোথায় যাবেন শম্ভুবাবু? গরিবের কুঁড়ের যদি এলেন—"

যোগেশ কহিল, "হাঁ, দুটো গান-টান শোন, তার পর এক সঙ্গেই ওঠা যাবে। এত ব্যস্ত কেন? দু'এক ঘণ্টায় ত আর ঘুম মশায় চটে যাচ্ছেন না!" যোগেশ শম্ভুর হাত ধরিল।

হাত ছাড়াইয়া শম্ভু কহিল, "না যোগেশ, আমার শরীরটা আজ অত্যন্ত খারাপ বোধ হচ্ছে! একে রেলে দু রাত কষ্ট গেছে, তারপর আজ সারা দিন ঘুরতে হয়েছে, থিয়েটারে গিয়ে গরমে মাথা বেজায় ধরে উঠেছে, দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও। তুমিও বরং আজ আমার সঙ্গে বাড়ী এস।"

"আমি!" হাসিয়া যোগেশ কহিল, "আমার আর আজ শীঘ্র যাওয়া হচ্ছে না! বিজলী নিজের হাতে মাংস রেঁধেছে, আমার নিমন্ত্রণ। না খেয়ে গেলে কি আমার আর রক্ষা থাকবে?"

শম্ভুর চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, সেই দীর্ঘ অতীতের কথা! অমির হাতের ক্যাট্‌লেট ও ডিমের বড়া খাইবার জন্য যেদিন যোগেশ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল! কি সে আনন্দে রাত্রি কাটিয়াছিল। আর আজ!

শম্ভুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছিল, পায়েব তলা হইতে পৃথিবীটা বুঝি সরিয়া যাইতেছে! এ কি ভূমিকম্প!

বিজলী কহিল, "শম্ভুবাবুকে ছেড়ো না, বাবু। আজ দুজনে নেমন্তন্ন খেয়ে তবে যেতে পাবে।' আমি একবার মাংসর জ্বালটা দেখে আসি।"

বিজলী চলিয়া গেলে যোগেশ শম্ভুর হাত ধরিল, কহিল, "তুমি বোধ হয় ভড়কে গেছ, শম্ভু! আমার উপর রাগ কচ্ছ?"

শম্ভু তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "রাগ! হাঁ, কচ্ছি, ভয়ানক রাগ কচ্ছি। এ সব কি, যোগেশ? তুমি কি সেই লোক? একদিন অমির জন্য—"

বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া যোগেশ কহিল, "আমার উপব অন্যায় রাগ করছ, শম্ভু! এতে আমার কোন দোষ নেই—"

শম্ভু কহিল, "নির্লজ্জের মত এ কথা তুমি বলতে পারছ! আশ্চর্য্য! অমিয়র প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য নেই? এমনি করে বুঝি সে কর্ত্তব্য পালন করছ?"

যোগেশ কহিল, "ও সব কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য কথার কথা, ও সব রেখে দাও। ছেলেটা মারা গিয়ে অবধি দিন-রাত সে যা প্যান-

প্যানানি ধরেছে! আঃ! তার উপর তার নিজেরও অসুখ, ভালো লাগে না! বাড়ীতে কি যে এক নিরানন্দ ভাব! সে সব আমার বরদাস্ত হয় না। কাজেই গান-টান শুনে মনটাকে ভালো রাখতে চাই, তাই এখানে আসি। বিজুকে তুমি নেহাৎ যেমন-তেমন ভেবো না। ও বড় ভালো, আমাকে ভারী ভালবাসে। বাড়ীতে গেলেই ত সেই প্যানপ্যানানি—জ্বালাতন হয়ে গেছি। অমিকে ত অযত্ন কচ্ছি না। তার অসুখ, তা চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেদিকে কোন ত্রুটি পাবে না। তা যদি পেতে, তা হলে নয় আমার দোষ দিতে পারতে।"

শম্ভু কোন কথা কহিল না। সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল! নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে যোগেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। যোগেশের স্বরে একটা কাতরতা যে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু শম্ভু লক্ষ্য করিল। সে শুধু ভাবিতে ছিল, সেই যোগেশ! এমন অধঃপাতেও সে যাইতে পারে! অমিয়র প্রতি অত প্রেম, দুই দিনেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল! আহা!

বিজলী আসিয়া বলিল, "তুমি ত বেশ লোক! শম্ভুবাবুকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছ?"

যোগেশ কহিল, "না, না, শম্ভুর শরীরটা সত্যই খারাপ, ও বাড়ী যাক। ওকে আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। শম্ভু, তা হলে তুমি এস। আমার গাড়ীতেই যাও। তোমায় নামিয়ে গাড়ী আবার আসবে'খন।"

দুই বন্ধুতে নীচে নামিয়া আসিল। কোচমানকে যথা-রীতি উপদেশ দিয়া যোগেশ আবার উপরে গেল। শম্ভুও গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সহিস গাড়ীর বাতি জ্বালিতে লাগিল।

অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে বসিয়া শম্ভুর বার বার শুধু অমিয়র সেই ফটোর মুখখানি মনে পড়িতেছিল। সেই আয়ত চোখের উজ্জ্বল কোমল দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে কি আশ্বাস, কি সুদৃঢ় নির্ভরতা! সে সরল বিশ্বাসের উপর এমন নির্ম্মম আঘাত! রোগে শোকে কাতর হইয়া কোথায় আঁধার গৃহের কোণে পড়িয়া বেচারী গুমরিয়া কাঁদিতেছে,—সে শোকে এতটুকু সান্ত্বনা নাই, সহানুভূতি নাই, স্নেহ নাই! হারে অভাগিনী পুত্র-হারা বালিকা! এই বয়সেই তোর কপাল ভাঙ্গিল? কি পাপে? কাহার অভিশাপে? পাষণ্ড যোগেশ!

রোষে শম্ভুর সমস্ত দেহ যেন তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি—উপায় কি? তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল।

বাতি জ্বালা হইয়াছিল। কোচমান ঘোড়ার রাশ টানিল। আলো ও ছায়ার একটা চকিত মিশ্রনের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। উপরের ঘর হইতে অর্গিনের স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরের সহিত এক নারী-কণ্ঠের মিষ্ট স্বর-লহরী বেদনা-কাতর শম্ভুর শ্রুতির মূলে আসিয়া আঘাত করিল,

আমারি হে তুমি পরাণেরি ধন, আর কারো নহ বঁধু,
আমার কোমল হৃদয়-ফুলে তুমি হে সোহাগ-মধু!

লঘুক্রিয়া

পুলিনবিহারীর কথা

রবিবার। কয়েক বাজি তাস খেলার পর বন্ধুগণ যখন একে একে সকলে বিদায় লইল, দিনের আলোও তখন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বন্ধুবর পুলিনবিহারী একটা তাকিয়া টানিয়া তক্তাপোষের উপর আমার পাশে শুইয়া পড়িল। আমি শিবুকে তামাক ও আলো আনিতে আদেশ দিলাম।

তখন 'বেল ফুল' ও 'কুলপী বরফ' হাঁকিয়া ফিরিওয়ালা পথে চলিয়াছে। উড়িয়া বেহারা মই লইয়া রাস্তার গ্যাস জ্বালিতে সুরু করিয়াছে। পাশের বাড়ীর একটী ছোকরা নূতন হার্মোনিয়ম শিখিতেছে, তাহার বেসুরা আওয়াজে সকলের প্রাণান্ত ঘটিবার উপক্রম!

পুলিন কহিল, "ওহে, তামাক ডাক না—।"

"সবুর কর, মিলছে।" খপরের কাগজখানা খানিক নাড়াচাড়া করিয়া পুলিন কহিল, "ভারী একটা মজার কথা আছে, শুন্‌বে?"

আমি কহিলাম, "কেন শুন্‌ব না?"

শিবু তামাক দিয়া গেল। গুড়গুড়ির নলটা করায়ত্ত করিয়া কহিলাম, "কি বলবে বল না—নীরব রইলে কেন?"

"তবে শোন, বলি।"

পুলিন বলিতে আরম্ভ করিল,—"সে প্রায় তিন বৎসরের কথা। তখন আমি কলিকাতার মেসে থাকিয়া এম, এ পড়ি! বাগবাজারে মামার বাড়ী থাক্‌বার জন্য মামা বিস্তর অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য সেখানে থাকতে আমি রাজী হইনি। সেবার আমার এক-জামিন। পূজার ছুটিতে মেস বন্ধ হলে বাড়ী না গিয়ে মামার বাড়ীতেই থাকব স্থির করলুম। মামার বাড়ী মাসিমার জামাইও থাকতেন, জান বোধ হয়—বিরাজদা'! তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, হাল্কা জিনিষগুলোর উপর তিনি যত খানি মনোযোগ দিয়ে থাকেন, গুরুতর বিষয়গুলো ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁর নজরে পড়ে না। এর আর দৃষ্টান্ত দেবার কোন প্রয়োজন নেই! আমাব গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে। তিনি আমাদের সঙ্গে খুব মিশতেন—অর্থাৎ ভারী সরল নিরীহ ধাতের লোক আর কি!

দিন কতক হাসি-তামাসার পর আমার মাথায় কেমন দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব হল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিরাজদার সঙ্গে কাব্য নিয়ে আলোচনা চলছিল। হঠাৎ আমি খুব গম্ভীরভাবে বলে উঠলুম, "বিরাজদা, আপনার সঙ্গে আমার একটা খুব গুরুতর কথা আছে!" আমার মুখের দিকে না চেয়েই বিরাজদা বললেন, "কি কথা?" আমি বললুম, "ঠাট্টা করবেন না?" "না।" "কারুর কাছে প্রকাশ করবেন

না, বলুন।" "কি কথা পুলিন?" "যদি কারুকে না বলেন, তবেই বলি। আর শুধু শুনলে চলবে না, শুনে আপনাকে তার উপায় করতে হবে বিরাজদা।" এমন কথা ত' বিরাজদা আগে কখনও শোনেননি—কাজেই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "কাউকে বলব না—তুমি বল।" আমি মাটির দিকে মুখ নামিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বললুম, "আমার লভ্ হয়েছে"! কথাটা বোধ হয় বিরাজদা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না—কানটা এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "কি হয়েছে?" "আমি ভালবেসে ফেলেছি, বিবাজদা।" চোখদুটো বিস্ফারিত করে বিরাজদা বললেন, "কাকে?" আমি মুখ না তুলেই বললুন, "আমার এক বন্ধুর বোনকে"। বিরাজদা অনেক ক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন; পরে বললেন, "তাই ত! তা কি রকম করে এ সব কাণ্ড হল?" "আমার কোন দোষ নেই, বিরাজদা!" কথাটা শুনে বিরাজদা খুব দুঃখিত হলেন, বোধ হল। তিনি কি ভাবতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে আমার মুখেব দিকে চাইতে লাগলেন। গলাটা একটু কাঁপিয়ে আমি বললুম, "যদি ঠাট্টা মনে না করেন ত বলি। কিন্তু জানবেন, আমার জাবনের সুখ-দুঃখ এর উপর নির্ভর করছে।" বিরাজদা খুব উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তুমি কি আমাকে পাগল পেলে যে এই সব মিহি ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করব? ছি ছি!" বিরাজদা খুব গম্ভীরভাবে ঘাড়টা নাড়লেন! কোন রকমে আমি হাসি চেপে বললুম, "আপনি কি লভ্ বিশ্বাস করেন?" "এ কি কথা হল

হে! লভ্ বিশ্বাস করি না? আহা, লভ্, লভ্! They sin who tell us Love can die. কবিদের প্রধান ব্যাসাতিই হল গে লভ্! সেই লভ্ মানি না?" আমি ভাবলুম, বিরাজদা এ বলেন কি! বললুম, "তবে শুনুন বিরাজদা। আমার বন্ধুটি আমাদের সঙ্গেই পড়ে। সে আমাকে তাদের বাড়ী পড়তে যেতে বলেছিল—তাই আমি গেছলুম—" বলে একটু থামা দিলুম। বিরাজদা আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "লজ্জা করো না। সব খুলে বল। আমার যতদূর সাধ্য—"

আমি কোনমতে হাসি চাপিয়া' রাখিতে পারিলাম না—কহিলাম, "কি বাজে গল্প আরম্ভ করলে হে!" পুলিন হাসিয়া বলিল, "না ভাই, সব সত্য বলছি!"

"এ্যাঁ বল কি হে, বিরাজবাবু আগাগোড়া এ সব বিশ্বাস করছিলেন?" পুলিন কহিল, "তবে আর মজা কিসের? শোনই না, তার পর কি হল—"

পুলিন আবার বলিতে লাগিল, "আমি বললুম, 'দেখুন বিরাজদা, প্রথম যে দিন অমলদের বাড়ী পড়তে গেলুম, সেদিন গিয়ে অমলকে দেখতে পেলুম না—অমলদের চাকর বললে, 'বাবু বলে গেছেন, একটু বসতে হবে।' আমি তখন পড়বার ঘরে বসে রইলুম! টেবিলের উপর একখানা "স্বরলিপির" বই পড়েছিল, সেখানা দেখছি, এমন সময় একটি মেয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি যেন ঠিক একটি মোমের পুতুল! এসেই সে বললে, 'দাদা, বিনুকাকার বাড়ী আজ আমাদের—"

কথা শেষ না করেই মেয়েটি হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেল। তোমায় বলব কি, বিরাজদা, তেমন সুশ্রী মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। কোঁকড়া কোঁকড়া খোলা চুল পিঠের উপর যেন ঢেউ তুলে নেচে চলেছে! গোলাপ ফুলের মত রঙটুকু, আর কি মিষ্টি গলা—! এর বেশী তখন কিছু মনে হয় নি। তারপর অমলদের বাড়ী যখন-তখন যাতায়াতে মেয়েটির সঙ্কোচ কেটে গেল। সে আমার কাছে আসত! ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা থেকে বেশ বুঝতে পারা গেল যে, আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলেছি।" বিরাজদা একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি তাকে ভালবাস, মানলুম, কিন্তু সে যে তোমায় ভালবাসে, তার প্রমাণ কি?" আমি বললুম, "তার প্রমাণ না পেয়েই কি আর বলছি, বিরাজদা? একদিন আমি অমলদের বাড়ী যাইনি, তাব পরদিন যখন গেলুম, তখন অমল বাড়ী ছিল না। আমি যেতেই রমা—অমলের বোনেব নাম রমা—এসে বললে, 'কাল আপনি আসেননি কেন? আমি রাত অবধি বাইরের ঘবে বসেছিলুম।' আমি বললুম, "কাল আমার একটা কাজ ছিল রমা, তাই আসতে পারিনি।" রমা বললে, "আপনি এলে আমার বড় আহ্লাদ হয়।" একটু নরম সুরে আমি বললুম, "তাহলে আমায় তুমি ভালবাস?" চার দিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে রমা বললে, "আমি আপনাকে খুব ভালবাসি, পুলিনবাবু। আপনি বোধ হয়—?" লজ্জায় রমা আর কিছু বলতে পারলে না। তার কথা কেমন বেধে গেল। আমি বললুম, "আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি রমা—তোমার বাবাকে আমাদের

বিয়ের কথা বলব, মনে করেছি!" রমা লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, "রাগ করলে?" রমা ঘাড় নাড়লে। আমি বললুম, "কথা কয়ে বল।" রমা বললে, "না।" সত্যি বল্‌ছি, বিরাজদা, সেদিন যে আমার কতখানি সুখ হয়েছিল, তা আর বলতে পারি না। তবু তুমি বলতে চাও, সে আমাকে ভালবাসে না—?"

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

পুলিন আবাব বলিতে লাগিল, "বিরাজদা গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ!" তারপর খানিকটা থেমে আবার বললেন, "দেখ পুলিন, এর ভিতর বিস্তর ফ্যাসাদ আছে।" আমি বললুম, "ফ্যাসাদ আবাব কি বিরাজদা?" বিরাজদা বললেন, "হিঁদুর বিয়ে কি আর দু এক কথায় ঠিক হয়, ভাই? এ ত বিলিতি কোর্টশিপ্ নয়!" বিরাজদার গলার আওয়াজে এমন একটা করুণ সমবেদনা মেশানো ছিল যে, আমার ভারী হাসি পাচ্ছিল! বিরাজদা বললেন, "তারা জাত্যংশে ছোট কি বড়, সেটা দেখতে হবে; তারপর ঘব-টর সব কেমন, কোষ্ঠী মেলে কি না, তাও দেখতে হবে—" আমি বললুম, "সে খোজ নিয়েছি, তারা আমাদের পাল্টা ঘর।" বিরাজদা কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন। আমি বললুম, "কি ভাবছেন?" বিরাজদা চিন্তিতভাবে বললেন, "তাই ত হে, তুমি বড় মুস্কিল বাধিয়ে তুললে, দেখছি! বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ে যে প্রেমে পড়ে, এ আমার বিশ্বাসই ছিল না। আমি ভাবতুম, লভ্-টভগুলো নভেলের পাতায়,

থিয়েটারের ষ্টেজে আর ব্রাহ্মদের ঘরেই হয়ে থাকে! হিঁদুর ঘরে ও সব ল্যাঠা নেই। তা তুমি রীতিমত এক কাণ্ড পাকিয়ে তুলেছ—” আমি বিষণ্ণভাবে বললুম, “আমার দোষ আমি পাঁচশো বার স্বীকার করছি, কিন্তু বিরাজদা, এতে আমার এতটুকু হাত ছিল না!” শেষ দিকটায় গলার আওয়াজ খুবই করুণ করে তুলেছিলুম! বিরাজদা বললেন, “আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। যাতে তোমাদের এ মিলন সুসম্পন্ন হয় সে বিষয়ে—” আমি ব্যগ্রভাবে বললুম, “কিন্তু দেখবেন, বাবা মামা কি কোন গুরুজন যেন এখন এর বিন্দু-বিসর্গও না জানতে পারেন।” “আমাকে কি ছেলে মানুষ পেলে হে” বলে বিরাজদা পাগলের মত খুব ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।”

গুড়গুড়ির নলটায় টান দিয়া আমি কহিলাম, “বেশ জমিয়েছিলে ত! তার পর?”

পুলিন বলিতে লাগিল, “তারপর ত দিনকতক বেশ নিঝুমভাবে কাটল। এম, এ এক-জামিনের পর মামার বাড়ী এলুম। তখন ভাবলুম, ব্যাপারটাকে নিবুনো হবে না—ফুঁ দিয়ে দিয়ে রীতিমত ঘন করে তোলা যাক্। তাই সমস্ত ব্যাপার যেমন যা দাড়িয়েছিল, নরেনদাকে খুলে বললুম। নরেনদার সঙ্গে সব রকম পরিহাস-রসিকতাই বেশ চলে। নরেনদা খুব খুসী হয়ে বললে, “এইবার আর একটু চাল্ চালো দেখি!” তখন দুজনে পরামর্শ আঁটলুম। বাঁ হাতে আমি একখানা চিঠি লিখে ফেললুম। মেয়েলি ছাঁদের মত অক্ষরগুলোও হল—একেবারে

হুবহু যেন মেয়ের হাতের লেখা! নরেনদা তখন চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে বিরাজদাকে দেখালে, বললে, "দেখেছ, এখানে পুলিন কি কাণ্ড করে বসেছে।" "কি কাণ্ড?" বলে বিরাজদা হাঁ করে নরেনদার মুখের দিকে তাকালেন। নরেনদা চিঠিখানা বিরাজদার হাতে দিলে তিনি সেখানা পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হলে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কোথায় সে?" নরেনদা বললে, "সে আমার ঘরে বসে রয়েছে। বেচাবার চোখদুটো ছল-ছল করছে!" বিরাজদা নরেনদার সঙ্গে আমার ঘরে এলেন। এসেই বললেন, "আমাকে মাপ কর পুলিন, আমি এতদিন ব্যাপারটা তত গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, বুঝি, এ পাগলামি! দুদিনেই সেরে যাবে।" নরেনদা বাধা দিয়ে বলে উঠল, "বল কি বিরাজদা, এ কি পাগলামি হল? এঁ্যা! লভ—" বিরাজদা অপ্রতিভভাবে বলে গেলেন, "না, না, চিঠিখানা যা দেখছি—" বিরাজদার মুখ রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠল! নরেনদা বললে, "তোমাকে এর উপায় দেখতেই হবে, বিরাজদা!" "সে বিষয়ে কিছু ভাবতে হবে না" বলে বিরাজদা ত চলে গেলেন। সে চিঠিটা ভারী মজার ছিল; তাতে কি লেখা ছিল, জানো? ধরণটা ঠিক এই রকম আর কি—

প্রিয়তম,

অনেক দিন তোমায় দেখিনি। হয়ত তুমি আমাকে ভুলে গেছ! কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারব না, ভুলবও না।

তুমিই আমার স্বামী—সে কথা ত তোমার সামনে কত বার বলেছি! আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। তুমি বলেছিলে, তোমার এক আত্মীয়কে সব কথা খুলে বলেছ, তিনি না কি সুখেরও আশা দিয়েছেন! তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, তিনি যেন একটু চাড় কবে আমাদের বিয়ের চেষ্টা করেন! অনেক জায়গা থেকে আমার সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু দাদাবও মত শুনেছি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়! আর আমার যা মত, তা ত তুমি ভালোই জান!

যদি আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি থাকে কিম্বা যদি আমাকে ভুলে যেতে চাও, তবে দয়া করে খানিকটা বিষ আমায় পাঠিয়ে দিয়ো, তাহলে আর কখনও তোমায় বিরক্ত করতে যাব না।

রমা।

চিঠিখানা দেখাবার সাত-আট দিন পরে বিরাজদা হঠাৎ একদিন আমার ঘরে এসে বললেন, "পুলিন, তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলুম—সে লিখেছে, সব ঠিক-ঠাক করতে! এই মাঘ মাসেই যাতে বিয়ে হয়, সেই রকম তাঁদের ইচ্ছা! ঠিকঠাক হলে তোমার বাবার সে মত করাবে।" আমার মাথায় রক্ত চন্‌চন্‌ করে উঠল। আমি বললুম, "ভারী খারাপ করেছেন, বিরাজদা, ভারী খারাপ কাজ করেছেন—" ভয়ে আর কোন কথা আমি বলতে পারলুম না! পৃথিবীটা তখন আমার চোখে ধোঁয়ার মত মনে হচ্ছিল। কি সর্ব্বনাশ! এর

তিন চার দিন পরে আবার এক বিপদ। দাঁতের বোঝা বার করে বিরাজদা বললেন, "মামাকে আজ সব কথা বলেছি, তাঁর খুব মত আছে।" রাগে দুঃখে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠ্‌ল। ভারী কাজ করেছেন—আবার বাহাদুরি করে হাসি হচ্ছে! সত্যি ভাই, মাথায় বাজ পড়লে মানুষ কি রকম জ্বলে ওঠে, তা জানি না বটে, কিন্তু আমার তখন মনে হল, যেন আমার মাথায় বাজ পড়েছে! অস্থির হয়ে আমি বলে উঠলুম, "করেছেন কি, বিরাজদা—আমার মাথা খেয়েছেন? আমি যে শুধু তামাসা করেছিলুম!" "সে কি?" বিরাজদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমি বললুম, "হাঁ। ওর ভিতর এতটুকুও সত্যি ছিল না—আগাগোড়া মিথ্যে, বানানো গল্প।" "চিঠিখানা?" "তাও বানানো—বাঁ হাতে সেটা আমি লিখেছিলুম!" "তা কি করে বুঝব বল, ভাই?" আমি কোন মতে চোখের জল সামলাতে পারলুম না—বললুম, "মামা, বাবা, সব কি মনে করবেন, বলুন দেখি!"

"তা আমি কি করে বুঝব বল, ভাই, যে তুমি ঠাট্টা করছ!" "ছি, ছি, বিরাজদা, তোমার এতটুকু কাণ্ড-জ্ঞান নেই!" "এখন উপায়?" আমি বললুম, "উপায় আপনারই হাতে—আপনি বলবেন, ও আমার সঙ্গে তামাসা করেছিল!" "আচ্ছা, দেখব, কিন্তু ভাই এমন তামাসাও করে?"

বলব কি, সেই অবধি এমন একটা লজ্জা আমাকে ঘিরে আছে যে, বলতে পারি না। বাড়ীতে কাউকে চুপি চুপি কথা কইতে দেখলেই আমার মনে হয়, বুঝি আমারই কেলেঙ্কারির

কথা হচ্ছে! ছি, ছি, মনের দুর্ব্বলতায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারিনি যে এক ফোঁটা সরল হাস্য-কৌতুকের মধ্যে এতখানি ট্রাজেডি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে!"

পুলিন চুপ করিল।

নরেন্দ্রনাথের কথা

ইহাব কিছুদিন পরে একদিন ঈডেন উদ্যানে বেড়াইবার সময় নরেনের সহিত আমাব সাক্ষাৎ। একটা বেঞ্চে বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। নরেনের স্ত্রী বেশ পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে! নরেন শীঘ্রই একখানা কবিতা-পুস্তক ছাপাইবে ইত্যাদি! হঠাৎ আমি বলিলাম, "হাঁ হে, তোমার বিরাজদাকে নিয়ে পুলিন একটা মজা করেছিল?"

নরেন বললে, "কি রকম?" আমি তখন পুলিনের কাহিনী নরেনের কাছে বিবৃত করিলাম।

শুনিয়া নরেন মৃদু হাসিল। পরে কহিল, "ওর আর একটু বাকী আছে যে! সেটা শুধু আমি আর বিরাজদা জানেন, পুলিনও জানে না।" আমি কহিলাম, "সে আবার কি? বল ত!"

"তবে শোন—" বলিয়া নবেন বলিতে লাগিল, "এম, এ একজামিনের পর পুলিন এসে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে খুলে বলে! পুলিন বললে, "বিরাজদাকে নিয়ে রীতিমত মজা করা যাক্, এস।" আমিও তাতে সায় দিলুম! তারপর যখন সেই বানানো চিঠিখানা বিরাজদাকে একেবারে কাহিল করে ফেললে, তখন আমি

ভাবলুম, একটা নিরীহ লোককে নিয়ে তুজনে মিলে এতখানি মজা করাটা ভালো দেখায় না। অধর্ম্ম হয়! আমি তখন এক উল্টো চাল চালবার চেষ্টা দেখলুম। সমস্ত ব্যাপার বিরাজদাকে খুলে বললুম। অবশ্য পুলিন এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা কিছুই জানতে পারেনি, এখনও জানে না। বিরাজদা বললেন, "এ কখনও হতে পারে?" বিস্তর তর্ক-যুক্তি ফেঁদে আমি বললুম যে, হ্যাঁ, এটা খুবই হতে পারে—তাঁকে নিয়ে মজা করার প্রলোভন হওয়াটা মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক! তখন বিরাজদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আচ্ছা নরেন, তাহলে ওকে কি রকম জব্দ করা যায় বল দেখি?" আমি বললুম, "তাকে বলবেন যে তোমার বাবাকে চিঠি লিখেছি, এ বিয়েতে তাঁর মত আছে, তোমার মামারও মত আছে,—দেখবেন, পুলিনচন্দর একেবারে মুষড়ে যাবেন'খন!" কাযেও তাই হল। সে সময় আবার আমার এক খুড়তুতো বোনের বিয়েতে পিশেমশায়রা আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। পুলিনচন্দর উপরের ঘরে যেতে সাহস পেত না—পাছে কেউ সেই কথা পেড়ে বসে। কেউ চুপি-চুপি কথা কইলেই পুলিন এসে আমায় বলত, "ঐ আমারই কথা হচ্ছে, নরেনদা।" একদিন পুলিন এসে বললে, "মামার ঘরে বসে মামাতে বাবাতে সেই কথাই হচ্ছে,—আমার নাম হচ্ছিল শুনে এলুম।" অনেক কষ্টে হাসি চেপে আমি বললুম, "সে বিরাজদা সব ঠিক করে দেবেন'খন।" পুলিন বললে, "উঃ—আর কখনও এমন ঠাট্টা করব না, নরেনদা—কি ঝকমারিই করেছি!"

আমি বললুম, "জানই ত শাস্ত্রের বচন আছে—অরসিকেষু রসস্থ নিবেদনম্—" বাস্তবিক পুলিনের অবস্থা তখন এমন হয়ে পড়েছিল যে বোধ করি চোরেরও তেমন হয় না। আবার এর উপর বৌদি একদিন পুলিনকে শুনিয়ে আমায় বললে, "আজ তোমরা নির্ম্মলবাবুর বাড়ী যাচ্ছ ত ঠাকুরপো?—নিম্মলবাবুটি হচ্ছেন কাল্পনিক রমার কাল্পনিক পিতা!—পিশিমা বলছিলেন, আজই মেয়ে দেখে আসতে! পুলিন ঠাকুরপোকে আর দেখতে হবে না, বোধ হয়! শুভদৃষ্টি ত হয়েই আছে—কি বল—?" আর বল! পুলিন ঠাকুরপো একেবারে অজ্ঞান!—এ সব কিন্তু বিরাজদার কাণ্ড! তিনি আবার বৌদির হাত দিয়ে এব জের চালিয়ে ছিলেন! পুলিন ঠাকুরপো এক ছুটে বিরাজদার কাছে হাজির। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "এই কান মল্‌ছি বিরাজদা, আমার ঘাট হয়েছে—এমন ঠাট্টা আর করব না—কখনও না। আমাকে বাঁচান। নইলে বাড়ীতে আর এক দণ্ড তিষ্ঠুতে পারছি না। ছি, ছি, সবাই ভাবছে, বুড়ো ছোঁড়া মেসে থেকে কেবল এই সব বখামি করে বেড়িয়েছে!" এখনও পর্য্যন্ত পুলিনের এ সঙ্কোচ কাটেনি। কি অশুভ ক্ষণেই যে বেচারা ঠাট্টার সূত্রপাত করেছিল! স্বপ্নেও ভাবেনি, যে সাপের ল্যাজ ধরে সে টান দিয়েছে!"

আমি কহিলাম,"পুলিন এ শেষের ব্যাপারখানা আজও তা হলে জানে না?" নরেন কহিল, "কিছু না। সে জানে, বিরাজদা সত্যিই বুঝি বাবাকে পিশেমশায়কে সব কথা বলে দিয়েছেন।"

আমি কহিলাম, "তা হলে বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে, বল ?"

"তা পাচ্ছে বৈকি। একেই বলে, কর্ম্মভোগ !"

"এ কথা তা হলে তাকে বলা উচিত ?"

"বললে তার উপকার হয় বটে ! তা ছাড়া প্লট্‌টাও শেষ হয়।"

আমি কহিলাম, "একেই বলে মিছরির ছুরি মেরে প্রতিশোধ ! মোদ্দা পুলিন যেমন বহ্বারম্ভ করে তুলেছিল—"

আমার মুখের কথা লুফিয়া নরেন কহিল, "তেমনি লঘুক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—এর আর কথা আছে ?"

স্নেহের জয়

সুখের চাকরি অদৃষ্ট-দোষে খোয়াইয়া বসিলাম। কি করিয়া, তাহাই খুলিয়া বলিতেছি।

এফ, এ ফেল করিয়া দুই-চারিটা নূতন ইনসিওরেন্স অফিসে বিনা বেতনে পলিসির কাগজে শ্রীহস্তের অক্ষর ছাঁদিয়া ফিরিতে ছিলাম। ঠিক মাহিনা স্থির হইবার পূর্ব্বক্ষণেই আমি 'শ্লো'—আমার দ্বারা কাজ চলিবে না বলিয়া কোম্পানী আমায় বিদায় দিয়া দ্বিতীয় এপ্রেন্টিস ধরিয়া আপনার তহবিল মোটা করিবার সাধু সঙ্কল্প পূর্ণ করিতেছিল। এমন সময় "দংষ্ট্রা" কার্য্যালয়ে সম্পাদকের বাহনের পদে বাহাল হইলাম। 'দংষ্ট্রা' বাঙ্গালার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ, তাহার নাম আর কে না জানে? ঢাউসের মত প্রকাণ্ড আকার! এত বড় দীর্ঘ কাগজ কালির অক্ষরে ভরাইতে গেলে একজন সম্পাদকের লেখনী তাহার যোগ্য খোরাক যোগাইতে পারে না। কাজেই নানা আকারের অসংখ্য ইংরাজী কাগজ হইতে নীল পেন্সিলে চিহ্নিত অংশ-বিশেষের তর্জ্জমার প্রয়োজন। সেই কাজ আমায় করিতে হইত। সম্পাদক মহাশয় তাহারই উপর দুই-চারিটা কাটকুট করিয়া গুরুগিরির মর্য্যাদা রাখিয়া কম্পোজিটরের হাতে তাহা তুলিয়া দিতেন। প্রুফ আমি দেখিতাম। ইহাই ছিল, আমার কাজ।

মন্দ লাগিত না। সাত-সমুদ্র-পারে কোথায় কোন্ দেশে দারুণ করকা-পাতে শস্যহানি হইয়াছে, ভেনেজিউলায় এক মাতাল বিষম রাগিয়া মদের বোতল ছুড়িয়া স্ত্রীর নাকটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে, কোথায় কোন্ বালুস্তূপের মধ্য হইতে বুদ্ধের জীর্ণ প্রাচীন মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তিব্বত, শ্যাম, জাপান হইতে অগণ্য পণ্ডিত ছুটিয়া আসিতেছে, কোথায় সফ্রেজিটের বিরাট ঘুসির ঘা খাইয়া পালোয়ান বিলাতী গোরার মাথা ফাটিয়াছে, পেরুতে মাংসের উপর ট্যাক্স বসাইতে তথাকার কসাইয়ের দল ধর্ম্মঘট করিয়াছে! এমনই বিচিত্র নূতন সংবাদের মধ্য দিয়া সারা বিশ্বের সহিত আমার পরিচয়-লাভ ঘটিত। তর্জ্জমার কাজে উৎসাহও কেমন চড়িয়া গিয়াছিল।

শীতের গোড়ায় সম্পাদক মহাশয় রোগে পড়িয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। সম্পাদকীয় কার্য্য-ভার পড়িল, আমার উপর! অর্থাৎ নানাবিধ মুরব্বিয়ানার বোলে দীর্ঘ স্তম্ভ ভরাইয়া দিতে হইবে! স্বত্বাধিকারী আসিয়া বলিয়া দিলেন, একটু যেন হুঁসিয়ার হইয়া লিখি! হিন্দুয়ানী না কোথাও এতটুকু চিড় খায়! আমরা নব্যের দল, তাই তিনি কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

বসিয়া বসিয়া সম্পাদকের লিখিত কয়েকটা বিরাট স্তম্ভ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। বাল্যকালে ছাত্র সমিতিতে একটু-আধটু বাঙ্গলা লেখার চর্চ্চাও যে রাখি নাই, এমন নহে। ভালো না লিখিতে পারিলেও, কোনমতে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারি। অন্ততঃ মনের মধ্যে এ বিশ্বাসটুকু প্রবলভাবেই ছিল।

দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বজেটের আলোচনা লাগাইয়া দিলাম। ইংরাজী কাগজ হইতে কয়েকটা জমা-খরচের তালিকা তর্জ্জমা করিয়া একেবারে হিন্দুর সত্য-ত্রেতা যুগের কথা আনিয়া ফেলিলাম। বিদেশ ও বিদেশী ভাষায়-ভাবে শিক্ষিত বাবু-ভাই-দিগকে অত্যন্ত কড়া রকমে গালি দিয়া, মনু-অত্রি-হারীতের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িলাম! আমার কলমের খোঁচায় ঠেলা পাইয়া হিন্দুত্ব একেবারে আকাশে চড়িয়া বসিল। লেখা শেষ করিয়া একবার আগাগোড়া সব পড়িয়া দেখিলাম। মনে হইল, মুনি-ঋষিবংশীয় কাহাকেও আর বাদ রাখি নাই। ষ্টীল পেনের খোঁচায় দোয়াতের মধ্য হইতে সকলকে টানিয়া এই ঢাউস কাগজের একটি কোণে ঠাসিয়া ধরিয়াছি!

বিজয়-গর্ব্বে মাতিয়া কলম রাখিয়া ভাবিতেছি, এবার কোন্ বিষয়টাকে ভেলা করিয়া ভাবের স্রোতে গা ভাসান দিই, এমন সময় স্বত্বাধিকারীর ঘরে বড় জোর তলব পড়িল। লেখা কাগজগুলা কম্পোজিটরের কাছে পাঠাইয়া উঠিয়া গেলাম।

স্বত্বাধিকারীর ঘরে তখন ভারী ভিড়! স্মৃতিভূষণ মহাশয় একখানি চেয়ারে বিরক্ত মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি ঘরে ঢুকিতেই তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "গেল! গেল! ম্লেচ্ছ আচারে সব গেল—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুঁকায় একটা দীর্ঘ টান দিয়া কহিল,

"সমাজ, ধর্ম্ম, কিছুই রইল না।" বুঝিলাম, ব্যাপার সাংঘাতিক।

স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "মাণিকবাবু, একটা লীডার এখনি লিখে ফেলতে হবে। আজই লিখে অর্ডার দেবেন, না হলে কাল কি করে বেরুবে! আস্‌চে হপ্তা হলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। অন্য কাগজে আগেই বেরিয়ে পড়বে।"

আমি কহিলাম, "কিসের উপর লিখতে হবে?"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "গুরুতর সামাজিক সমস্যা! একেবারে কলম ছুটিয়ে লিখে যাবেন!"

আমি কহিলাম, "ব্যাপারটা শুনি—"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "এই যে বলি, বাপু!" ট্যাঁক্ হইতে শামুকের খোল বাহির করিয়া তাহা হইতে নস্য খুঁটিয়া চক্রবর্ত্তী সবেগে তাহা নাসারন্ধ্রে গুঁজিয়া দিল; পরে নাসিকাগ্রভাগ ও হাত দুইটা ঝাড়িয়া বলিল, "বেশ করে শুনে যেয়ো, বাপু, ভুললে চলবে না। খুব হুঁস রেখো। জগৎবাবুকেও এতক্ষণ সব বলছিলাম। আমাদের পাড়ায় একবারে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। অত বড় দলপতি, তাঁর এই কাজ!"

চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিল, "আমাদের পাড়ার রামহরি চাটুয্যের নাম বোধ হয় আর কাহারও শুনিতে বাকী নাই। সেই সেবারকার বিধবা বিবাহের ব্যাপারে শাস্ত্র চিরিয়া এ বিবাহের

অবৈধতা কেমন জলের মত তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন! যেমন অগাধ পয়সা, সমাজের প্রতি অনুরাগ-মমতাও তেমনই প্রগাঢ়! নহিলে শুধু কি আর পয়সার জোরে এ কালে দলপতি হওয়া যায়? মনের তেজও কি ছিল! সেই সেবার পিতৃহীন ভাইপোটা লেখাপড়ার গর্ব্বে সমাজ ঠেলিয়া জাপান পলাইয়া গেলে আর তাহাকে বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়াইতে দেন নাই! অথচ এই ভাইপোটার উপর কি টানই না ছিল!

সুরমা রামহবি বাবুর একটি মাত্র মেয়ে। ছেলে দুটি বড়—ঐ যে, একজন হাইকোর্টেব উকিল হইয়াছে, আর একজন গালার দালালি করে। গৌরী-দানে পুণ্যলাভের আশায় আট বৎসর বয়সে তিনি সুরমার বিবাহ দেন! বিবাহও হয়, এক মস্ত ঘরে—রাজগিরের কাছে ঐ যে কি একটা দেশ আছে, সেখানকার জমিদারের এক ছেলের সহিত। দশ বৎসর বয়সে মেয়েটির কপাল পুড়িল—সে বিধবা হইল।

রামহরি বাবুর বুকে এ শোক বাজের মতই বাজিল। এই মেয়েটি তাঁহার প্রাণ ছিল—এইটিকে আঁতুড়ে রাখিয়াই তাঁহার স্ত্রী মারা যান! মেয়ের মুখে মায়ের ছবি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এত আদরের মেয়ে, বিধবা হইল! কত আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া জুটিলেন, রামহরি বাবুর কাণে কত মন্ত্র ফুঁকিলেন, কত পরামর্শ দিলেন, মেয়েটির আবার বিবাহ দাও। কত শাস্ত্রের দোহাই পড়িল, পণ্ডিতের মত আসিল, কিন্তু রামহরি চাটুয্যে কিছুতেই হঠিবার পাত্র নহেন। মেয়েটিকে বুকে ধরিয়া তাহার সম্মুখে তিনি

রামায়ণ-মহাভারত খুলিয়া বসিলেন, শাস্ত্রের বোঝা আনিয়া বাড়ী ভরিয়া তুলিলেন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

মূলে কিন্তু তিনি একটি ভুল করিয়া ছিলেন। সরু কালাপাড় ধুতি মেয়েটিকে ছাড়িতে দেন নাই, এবং হাতে চারগাছি করিয়া বিস্কুট প্যাটার্নের চুড়ি, ও দুই কাণে দুটি সোণার টপ্ রহিয়াই গেল। কি যে মানুষের ভ্রম! আসল যখন খোয়াইলাম, তখন এ সবের মায়া আব কেন?"

আমি কহিলাম, "এতে আর ক্ষতি কি, বলুন!"

চক্রবর্ত্তী একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "কি ক্ষতি, এখনই শুনিবে। মেয়ে ক্রমে ডাগর হইয়া উঠিল। রূপও দেহে উছলিয়া পড়িল। বিধাতার বিচার কেমন! বিধবাকেই তিনি অজস্র রূপ ঢালিয়া দেন!

চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীর পাশে ছোকরা বাবুদের একটা মেশ ছিল,—এখন নাই। বাড়ীখানা এখন একজন ডাক্তার ভাড়া লইয়াছে। এই মেশে থাকিয়া অনেকগুলি ছোকরা কালেজে পড়িত। তাহাদের মধ্যে একটির কেমন রোগ জন্মিল! সন্ধ্যার সময় সকলে যখন গোলদীঘিতে কিম্বা মাঠে হাওয়া খাইতে যাইত, সে ঘরের বাহির হইত না। ছাদের হাওয়াই তাহার কাছে তখন দার্জ্জিলিঙের হাওয়ার মত স্নিগ্ধ মনে হইত! ছেলেটি কোথাকার এক বড় লোকের ছেলে। বখামির সুবিধা হইবে বলিয়াই সে কলিকাতায় থাকিত। কালেজে পড়া ছিল, তাহার শুধু একটা ছল!"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "এ খপরটুকু আবার আপনি পেলেন কোথা থেকে?"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "বাপু হে, তোমরা নব্যের দল—জানিবে কি বল? সমাজে থাকিতে গেলে সব খোঁজ রাখিতে হয়। এই যে আজ সাত বৎসর পেন্সন লইয়া বসিয়া আছি, সারাক্ষণ শুধু সমাজটির পানে নজর রাখিয়াছি। কাহার ঘরে কে কি করে, কোথায় কি নড়ে, এখনই তাহা বলিয়া দিতে পারি! এমনভাবে নজব রাখিয়াছি বলিয়াই না সমাজ টিঁকিয়া আছে! নহিলে ম্লেচ্ছ শিক্ষার স্রোতে কোন্ কালে সে ভাসিয়া যাইত! হিন্দু ধর্ম্মের টিকিটিও আজ খুঁজিয়া পাইতে না! তা সে কথা যাক্। যাহা বলিতে ছিলাম,—সুরমা মেয়েটি মাঝে মাঝে ছাদে উঠিত। কখন্ যে দুইজনে চোখোচোখি হইয়া গেল, তাহার সঠিক সংবাদটুকু এখনও জানিতে পারি নাই। তবে চোখোচোখি যে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ শীঘ্রই সে ছোকরাটির গান-বাজনার দিকে অসম্ভব ঝোঁক পড়িয়া গেল। আপনার ঘবে জানালার ধারে বসিয়া সে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিত—তোমার নিধুর টপ্পা, বিদ্যাপতির ভণিতা কিছুই বাদ যাইত না! সুরমা তন্ময় চিত্তে খড়খড়ির পাখি তুলিয়া সেই জানালার পানে চাহিয়া গান শুনিত!

বেচারা রামহরি বাবু তখন বিলাত-যাত্রা শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় তাহারই প্রমাণ-সংগ্রহে অত্যন্ত ব্যস্ত, বাড়ীর দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। একদিন শেষে বৃদ্ধের শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরীর মত সুন্দরী, যুবতী কন্যা কুলের বাহির হইয়া

গেল। পাড়ায় টি-টি পড়িল। বৃদ্ধ শোকে উন্মাদ হইয়া উঠিলেন।”

স্মৃতিভূষণ ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

স্বত্বাধিকারী বলিলেন, “শুনলে ত সব ?”

আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে কহিলাম, “এ সব কেচ্ছাগুলো কাগজে ছাপা কি—”

বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী কহিল, “আগে সব শোনই হে—পরে টিপ্পনী কাটিয়ো। শোকের ধাক্কাটা বৃদ্ধ সহজেই সামলাইয়া লইলেন ! মেয়ের উপর রাগ বাড়িয়া উঠিল। মেয়ের তিনি কোন সন্ধানই করিলেন না ; যাহারা করিতেছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, ঐ মেয়ে আমার চোখের তারা ছিল, এখন সে আমার চক্ষুশূল। আমার মেয়ে নাই। সে মরিয়াছে। আমাব বাড়ীতে কেহ যদি সে মেয়ের নাম করে, তাহা হইলে তাহার মুখ দর্শন করিব না, তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না।”

চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিল, “তাহার পর ত তিন বৎসর মেয়ের নাম মুখে না আনিয়াই কাটিয়া গেল। কিন্তু মন যে তাহাকে এক তিলও ভুলে নাই, ইহা আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি ! হঠাৎ সেদিন রামহরি চাটুয্যের এক হাকিম বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। আমি তখন অনাথ আশ্রমের চাঁদা আনিতে গিয়াছি, সেইখানেই বসিয়া। হাকিম বলিল, সুরমার সে সন্ধান পাইয়াছে।

যে ছোকরাকে অবলম্বন করিয়া সে বিপথে বাহির হইয়াছিল, সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে! একটি ছেলে হইয়াছিল, সেটিও গিয়াছে। লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে মেয়েটি একদিন গঙ্গায় ডুবিতে গিয়াছিল, কিন্তু একটা পাহারওয়ালা দেখিয়া ফেলে, তাই আব মরা হয় নাই। হাকিমবাবুটি নদীর তীরে অসহায়া স্ত্রীলোক দেখিয়া তাহাকে আপনার বাড়ীতে আনাইয়া রাখিয়াছেন। পরিচয়ও পাইয়াছেন। কাজেই পুলিশ হাঙ্গামায় কুলের কলঙ্ক আব প্রচার হইতে পায় নাই। রামহরি বাবু ক্ষমা করিয়া এখন হতভাগিনীকে আপনার গৃহের এক কোণে ঠাঁই দিন, নহিলে সে কোথায় দাঁড়াইবে? উদরের জ্বালায় যদি সে অবশেষে পাপের পিছল পথে আরও গড়াইয়া পড়ে, তখন ত আর জাতি-কুলের ধ্বজা উড়িবে না!"

স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "তাতে কি হল?"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "তাহাতে বৃদ্ধ চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। হাকিম সাহেবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, সে আমার কেহ নয়, তাহার কথা আমার সম্মুখে তুলিয়ো না, বন্ধু-বিচ্ছেদ হইবে! তবু সে জবরদস্ত! হাকিম কি না! সে বলিল, আর যদি তোমার ছেলে এই দোষে দোষী হইত? মেয়ে বলিয়াই কি যত অপরাধ! অনুতাপে সে সারা হইয়া যাইতেছে, লজ্জায়, ঘৃণায় জ্বলিয়া খাক্ হইতেছে, তবু দেখিবে না? দাসী-বাঁদী তোমার বাড়ীতে যেটুকু ঠাঁই পায়, সেটুকু ঠাঁইও তোমার এত বড় বাড়ীতে তাহার জন্য নাই? কেন? না, সে মেয়ে!

আমার গা জ্বলিয়া উঠিতেছিল—আরে মূর্খ হাকিম, এ কি তোমার মামলা না মকদ্দমা যে যুক্তি খাড়া করিতেছ! হাঁড়ি যেমন একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাতে ভাত রাঁধা চলে না, ফেলিয়া দিতে হয়, মেয়ে-মানুষও তেমনই একবার একটি ভুল করিলে তাহার আর মুক্তি নাই! তাহাকে ফেলিয়া দিতে হয়! এই মেয়ের হাতের জল খাইলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে না?”

আমি কহিলাম, “শেষে হল কি?”

চক্রবর্ত্তী কহিল, “হাকিম বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলে বুড়ার দুই চোখে যেন বন্যা নামিল। আমায় তিনি বিদায় করিয়া দিলেন! আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দালানেই আমি বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে চাটুয্যের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখি, তিনি সেই মেয়েব ছেলেবেলাকার যত খাতা-পত্র, গহনা, তাহার রামায়ণ-মহাভারত, এমন কি তাহার একটা ছবি অবধি টেবিলেব টানা হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন! সেইগুলার সম্মুখে বসিয়া দুই চোখে বাণ ডাকাইয়া দিয়াছেন। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া তিনি উঠিলেন। আমি সরিয়া বসিলাম। বৃদ্ধ একেলাই পথে বাহির হইলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

বৃদ্ধ আসিয়া হাকিমের বাড়ী পৌছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া প্রাণপণ-বলে ডাকিলেন, “সুর—মা——”

আমি পথের ধারে রোয়াকে বসিয়া ছিলাম। তখন সন্ধ্যা। অস্পষ্ট আঁধারে চারিধার ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। রাস্তার

আলোগুলা তখনও জ্বালিয়া দেয় নাই! বসিয়া আমি দেখিতে লাগিলাম, কি হয়! ব্যাপার কোথায় গড়ায়! এতখানি পথ হাঁটিয়া কষ্ট বেশই হইয়াছিল। কিন্তু উপায় কি? সমাজকে ভালো বাসিলে এমন কষ্ট অনেক সহিতে হয়।

সাড়া পাইয়া হাকিম বাবুটি বাহিরে আসিলেন।

চাটুয্যে বলিলেন, "কৈ, একবার দেখাও, আমার মাকে একবার দেখি।"

হাকিমবাবু সুরমাকে ডাকিয়া আনিলেন। ঘরের মধ্যে ইলেকটিবি আলো জ্বলিতেছিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া আমি দেখিলাম, সুরমা ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ নত করিয়া মৃদু স্বরে ডাকিল, "—বাবা—" "মা—" বলিয়া বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া সুরমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। সে দৃশ্যে আমার বুকটাও একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে ঐ মুহূর্ত্তের জন্য!

মেয়ের মুখের উপর হইতে লুণ্ঠিত কেশের রাশি সরাইতে সরাইতে বৃদ্ধ কহিলেন, "আর কোথাও যাস্নে মা—আমায় ছেড়ে কখনও যাস্ নে!" মেয়ে আবার ডাকিল, "বাবা—" চাটুয্যে কহিল, "কিচ্ছু ভাবিস নে মা, কোন ভুল করেনি, এমন লোক এ জগতে বিরল। সে ভুলের জন্য মার্জ্জনাও সকলে পেয়েছে। তোরও মার্জ্জনা আছে!"

সুরমা কহিল, "দাদাদের—?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "বুঝেছি মা, কাঁটা তোর কোন্ খানে এখনও

বিঁধে রয়েছে! তাদের কাছে যাব কেন, মা? সব তাদের দিয়ে যাচ্ছি যে। তাদের সব থাক্! ঘর, বাড়ী, ঐশ্বর্য্য, সমাজ, এ সব তাদেরই রইল, আমাদের কাজ নেই। তুচ্ছ এ সবের বিনিময়ে স্নেহটাকে ত একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারিনে মা। এ স্নেহের মর্য্যাদা যে দিন ধূলোয় লুটিয়ে দেব, পতিত-পাবন দয়াময় ভগবানও যে সেদিন ধূলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়বেন। এদের কিছু চাই না। চল্, আমরা দুজনে কাশীবাস করিগে। মা অন্নপূর্ণার প্রসাদ দুটি করে বরাতে জুটবেই! ভোলানাথ, বিশ্বের ভুল বয়ে বেড়াচ্ছেন, এ ভুল মার্জ্জনা করে নিশ্চয় আমাদের তিনি পায়ে ঠাঁই দেবেন।”

চক্রবর্ত্তী স্থির হইল। আমার চোখে জল আসিয়াছিল। কোন মতে তাহা সামলাইয়া লইলাম।

স্বত্বাধিকারী কহিলেন, “এখন বেশ করে এর উপর রঙ্ ফলিয়ে টিপ্পনী কেটে একটা লিখে ফেলুন গে। মনে থাকে যেন, কালকের কাগজেই বেরুবে!”

স্মৃতিভূষণ বলিয়া উঠিলেন, “একে দলপতি! তাঁর এ দুর্ব্বলতা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। বেশ একটু কড়া করে লিখবেন।”

নিজের ঘরে আসিয়া লিখিতে বসিলাম। কয়টা কথা কেবলই মনে জাগিতেছিল, তোমার ছেলে যদি এমন দোষ করিত! মেয়ে বলিয়াই কি যত অপরাধ! ভুল কাহার না হয়! একটা

ভুল যদি দৈবাৎ হইয়াই গিয়া থাকে, তবে তাহার কি মার্জ্জনা নাই! জীবনে একটিও ভুল করে নাই, এমন দেবতা স্বর্গে আছেন কি না, জানি না, মানুষ কোন্ ছার!

তীব্র রকমের একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। প্রুফ দেখিয়া অর্ডার দিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে।

পরদিন,—বেলা তখন নয়টা। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় দংষ্ট্রা অফিস হইতে এক চিঠি ও একখানি সদ্য প্রকাশিত দংষ্ট্রা লইয়া লোক আসিয়াছে। চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমি হিন্দু সমাজের মাথায় লগুড় মারিয়াছি! সে লগুড় আবার শুধু সমাজের গায়ে পড়ে নাই, দংষ্ট্রার সকল শক্তির মূলে অবধি ভীষণ নাড়া দিয়াছে। আমি কি না দীপ্ত ভাষায় সেই রামহরির এই অনুচিত করুণায় গলিয়া তাহারই শিরে অজস্র পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিয়াছি! এমন পুকুর ভুল হইলে আমার দ্বারা কি করিয়া কাজ চলে! অতএব আমার জবাব। আর অফিসে যাইতে হইবে না।

আমি অবাক হইয়া কাগজখানা খুলিলাম, তাই ত! ভাবের নেশায় উন্মাদ হইয়া একেবারে দংষ্ট্রার উল্টা সুরে পালা গাহিয়া গিয়াছি! দংষ্ট্রার দফা সারিয়া দিয়াছি! যে ডালে বসিয়া ছিলাম, সেই ডালেই কুড়াল মারিয়াছি! হায়, হায়, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছি। এমন সাধের চাকরিটি অবধি হস্ত-স্খলিত হইল!

কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এত বড় বিষম ভুল ভাবের ঝোঁকে যে করিয়া ফেলিতে পারে, বাঙ্গলা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকীয় কার্য্য-ভার তেমন লোকের হাতে কখনই বিশ্বাস করিয়া দেওয়া যায় না। আমিও তাহা বেশ বুঝিয়াছি। তাই আর সাপ্তাহিকের বাজারে চাকরি খুঁজিতে ছুটি নাই! আবার সেই ইনসিওরেন্স অফিসে এপ্রেন্টিসিতে ঢুকিয়াছি। এ কাজে অবশ্য এমন ভুল করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দেখি, এবার যদি এখানে মাহিনার, ব্যবস্থাটা কোনমতে অদৃষ্টে ঘটিয়া যায়!

হকের ধন

কোনমতে নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া আহার শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিপিন উপরে আসিল। ঘরের জানালায় একটা কামিজ হাওয়ায় শুকাইতেছিল। সেটা টানিয়া সে গায়ে চড়াইল। পরে তাহার উপর কোট উঠাইয়া বোতাম আঁটিতে আঁটিতে হাঁক পাড়িল, "ওগো, আমার জল-খাবারের বাক্সটা দিয়ে যাও—আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। ন'টা বাজে!"

পুস্তকাকৃতি একটা টিনের বাক্স হাতে লইয়া মনোরমা ঘরে আসিল; স্বামীর সম্মুখে বাক্স রাখিয়া অঞ্চল হইতে ছোট একখানা ফর্দ্দ বাহির করিয়া বলিল, "কাল-বাদে পরশু অক্ষয়-তৃতীয়া। কাল আবার রবিবার, তোমার ছুটি। বেরুবে না ত। বামুন খাওয়াবার জিনিষ-পত্তরগুলো কলকেতা থেকে আজই তাহলে নিয়ে আসা চাই। দেখো, যেন একটিও না ভুল হয়। এতে বাদ দেবার কিছু নেই। ফর্দ্দটা শুনবে?"

জুতা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বিপিন কহিল, "থাক্, আর পড়তে হবে না। বেশী ফ্যাসাদের কিছু নেই ত? দেখো—"

মনোরমা কহিল, "না, না, ক'দিন আমাদের মাস-কাবারের ময়দা ফুরিয়ে গেছে—তা এখানকার ধূলো-বালি দিয়েই চালাচ্ছি।

তুমি বলেছিলে, শনিবার কিনে আনবে। তা আজ এনো, ভুলো না। না হলে সত্যি ত আর ঐ ধূলো-বালিগুলো বামুনদেব পাতে দিতে পারব না।”

বিপিন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ফর্দ্দ ও খাবারের বাক্স পকেটে ফেলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। তামাক খাইবারও সেদিন তাহার অবসর হইল না।

বিপিনের বাড়ী হইতে কাঁকনাড়া ষ্টেশন দশ মিনিটের পথ। কাঁকনাড়া হইতে বিস্তর লোক প্রত্যহ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিয়া কলিকাতার অফিসে চাকুরি বজায় রাখেন। প্রতি ট্রেনেই অফিস-যাত্রীর বিরাম নাই—যাহার অফিস যতখানি কড়া, তত শীঘ্র তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়। বেলা এগারোটায় বিপিনের অফিস হাজিরা গ্রহণ করে। তাই নয়টাব সময় তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইলেও চলে। নয়টা সতেরোর ট্রেন কলিকাতায় দশটা পনেবোয় আসিয়া পৌছায়। স্থতরাং বিপিনেব কোন অস্থবিধা হয় না।

গাড়ীতেই বিপিন দিবানিদ্রাটুকু সারিয়া লয়। সেদিনও নিত্যকার মত সে নিদ্রার আয়োজন করিল। তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় পত্নী-প্রদত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফর্দ্দের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া সে পড়িতে বসিল। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে মনোরমা এক দীর্ঘ ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়াছে। ঘি, ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া আনারস, তরমুজ, ছাঁচি ও মিঠা পান অবধি সে ফর্দ্দ হইতে

বাদ পড়ে নাই। বিপিন ভাবিল, তাই ত! এতগুলা জিনিষ! সারা কলিকাতা সহরটাই আজ ঘুরিতে হইবে, দেখিতেছি। অফিস হইতে বেলা দুইটার সময় সে বাহির হইবে, স্থির করিল। স্ত্রীর উপর একটু রাগও যে না হইল, এমন নহে! পরক্ষণে হাসিও আসিল। সে ভাবিল, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েগুলা সত্যই অদ্ভুত জীব বটে! কলিকাতায় অফিস যাই ত একেবারে হুকুম করিয়া বসিয়াছে, রাজ্যের দ্রব্য-সামগ্রী সেখান হইতে কিনিয়া আনো। এতটুকু ভাবে না বা বোঝে না যে, বিশাল সহর কলিকাতার কোথায় কোন্ এক ক্ষুদ্র কোণে অফিস, আর কোথায় থাকে কত দূরে এই সকল ঘি-ময়দা ও ফল-মূলের দোকানগুলা! কলিকাতা কি কাঁকনাড়া যে, একটা অশথ-তলায় হাট বসাইয়া রাজ্যের দোকানী-পশারী মেলা জমাইয়া দিয়াছে, ছুটিয়া গিয়া এক-নিশ্বাসে জিনিস-পত্র কিনিয়া আনা চলে? না বুঝিয়া সব এমন জিনিসের ফরমাস করিয়া বসে, যে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেই সারা দিন কাটিয়া যায়, কেনা ত দূরের কথা!

ইছাপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ভুপেন, মহীন্ ও হাবুল আসিয়া ট্রেনে উঠিল। হাবুল কহিল, "এই যে বিপিনদা! আজ বড় ঘুমোওনি যে? তা যাক্, ভালই হয়েছে। রতন পৌনে আটটার ডাউনে বেরিয়ে গেছে, আমাদের তাস খেলার সঙ্গী কম পড়বে, ভাবছিলুম। তা তুমি ত ঘুমোওনি—বসতে হবে।"

দুই-চারিবার আপত্তি করিয়া বিপিন দেখিল, না খেলিলে

কিছুতেই ইহারা নিষ্কৃতি দিবে না। অগত্যা সে খেলায় যোগ দিল।

বেলা দুইটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীর ফর্দ্দ-মাফিক জিনিস-পত্র কিনিয়া বিপিন যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিল, রাণাঘাট লোকাল তখনও প্লাটফর্ম্মে ইন্‌ হয় নাই। বাহিরের কুলি কহিল, "হামলোককো ভিতর যানেকা হুকুম নেহি বাবু—"

কয় ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিয়া-বকিয়া বিপিনের মেজাজের ঠিক ছিল না। সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "হুকুম নেহি ত কেয়া হোগা! এ সব কি হাম বয়েগা?" রেলের এক কেরাণী বাবু নিকটে ছিলেন, বিপিনকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, নিয়ম যখন নাই, তখন উহার সহিত বাদানুবাদ বৃথা। বিপিন যে তাহা না জানিত, এমন নহে, তবে সব-কেমন তাহার গোল হইয়া গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের এই প্রচণ্ড রৌদ্রে শুধুই কি সে ঘুরিয়াছে, পয়সাও আজ বিস্তর খরচ হইয়া গিয়াছে। যাক্‌, এখন বকাবকি করিয়া লাভ নাই।

অগত্যা সে রেল-কুলি ডাকিয়া জিনিস-পত্র তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া অগ্রসর হইল। প্লাটফর্ম্মে আসিয়া তাহার মনে পড়িল, ঐ যাঃ! ভারী ভুল হইয়া গিয়াছে! তামাক কেনা হয় নাই,—অথচ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। বালাখানার ধার দিয়া আসিল, তবু তখন হুঁস হইল না? কি আপদ! কাল আবার রবিবার, ছুটির দিন। তাস খেলিতে গৃহে

বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইবে। তখন সে আসর জমিবে কি করিয়া? কুলির নম্বরটা দেখিয়া লইয়া জিনিস-পত্র তাহার চার্জ্জে রাখিয়া তাহাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া তামাক আনিবার জন্য বিপিন আবার শিয়ালদহের মোড়ে ছুটিল।

মোড়ে তখন পুতুল নাচ ও ময়ূর-পঙ্খীর আড়ম্বর করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী, লোক-লস্কর ও গাড়ী-ঘোড়ায় সমস্ত পথ জুড়িয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করিতে। সম্মুখে বাধা দেখিয়া বিপিন মহা বিরক্ত হইল। প্রোসেশন চলিয়া গেলে রাস্তার অপর পারের মোড় হইতে এক টাকার তামাক কিনিয়া হন্ হন্ করিয়া প্রফুল্ল মনে সে ষ্টেশনে ফিরিল।

যাত্রী-বোঝাই গাড়ী তখন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছুটিবার জন্য অধীর আগ্রহে ফুঁসিতেছিল। কুলিকে জিনিস-পত্র উঠাইতে বলিয়া কোনমতে গাড়ীতে ভিড়ের মধ্যে বিপিন একটু স্থান সংগ্রহ করিল; পরে জিনিস-পত্র তুলিয়া গুছাইয়া কুলিকে পয়সা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহসা সম্মুখস্থ বাঙ্কের উপর তাহার চোখ পড়িল। চোর-কুঠরীর মত ট্রেনের কামরা। অন্ধকারে ভালো নজর চলে না, তবু দেখা গেল, টুকরি-ভরা গোলাপ জাম ও প্রকাণ্ড একটা তরমুজ বাঙ্কের উপর রহিয়াছে। তাহার তরমুজের চেয়ে এটা বড় না কি! অমনই তাহার নিজের তরমুজটার কথা মনে পড়িল। এ ধার ও ধার চারিধারে সে ফিরিয়া চাহিল। কৈ, নাই ত! তবে ভুল হইয়াছে! নিশ্চয় সেটা প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া আসিয়াছি!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল ; সম্মুখের তুই-তিন জনকে টপকাইয়া একেবারে কামরার দ্বারের সম্মুখে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনও তাহার দীর্ঘ দেহ-ভার নাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল! বিপিনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না—হাতল ঘুবাইয়া ঠেলিয়া সে কামরার দ্বার খুলিয়া ফেলিল ; পরে সেই খোলা দ্বার-পথে যেমন লাফাইয়া পড়িবে, অমনি তাহার কোমর জড়াইয়া সবলে কে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে সুদৃঢ় বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া বিপিন কহিল, "আঃ, কে? আমি তরমুজ ফেলে এসেছি, মশায়, তরমুজ। বিস্তর ঘুরে নগদ দেড় টাকা দাম দিয়ে কেনা—গোয়ালন্দর তরমুজ!"

ভদ্রলোকটি তাহাকে টানিয়া বসাইলেন, কিন্তু তাহার উপর দখল ছাড়িলেন না। পরে ধীরভাবে বুঝাইলেন যে, ট্রেন যখন চলিতে সুরু করিয়াছে, তখন সে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িলে নিশ্চয় জরিমানা হইবে। এবং কোর্টে গিয়া পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেওয়ার চেয়ে দেড় টাকার তরমুজটা খোয়া গেলে ক্ষতি যে কম হইবে, সে বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত করিতে ভুলিলেন না।

বিপিন কহিল, "আহা, বুঝচেন না, মশায়—"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "বেশ বুঝচি। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে শুধু আপনারই ক্ষতি হবে, আর সেইজন্যেই যে আপনাকে ধরেছি, তা ভাববেন না! একে ত এই বেজায় গরমে অফিসে গরম সাহেবকে নিয়ে জ্বলে মরছি, এর উপর যদি আপনার মকদ্দমায় রেল-কোম্পানির তরফে সাক্ষী হয়ে শেয়ালদার পুলিশ কোর্টে হাজরে দিতে হয়, তাহলে প্রাণে ত বাঁচবই না, মধ্যে

থেকে চাকরিটিও খোয়া যাবে! আপনি কি সে বিপদে না ফেলে ছাড়বেন না?"

গ্রীষ্ম-তপ্ত যাত্রীব দল ভদ্রলোকটির কথায় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া উঠিল। বিপিন কেমন অপ্রতিভভাবে বাহিরের পানে চাহিল।

ট্রেন তখন গতিব বেগ বাড়াইয়া প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া খালেব পুল অতিক্রম করিয়াছে। উপায় নাই দেখিয়া সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল—ভদ্রলোকটিও নির্ভয়ে তাহাকে বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি দিলেন।

বিপিন ভাবিল, এখন বাড়ী গিয়া তরমুজ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? বলিবে কি যে, ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে সেটা ফেলিয়া আসিয়াছি? তাহা হইলে বেকুবির চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হয় বটে! হুঁসিয়ার ক্রেতা বলিয়া পাড়ায় যে সুনামটুকু কেনা গিয়াছে, তাহা হাবাইতেও বিলম্ব ঘটে না! বানাইয়া তবে মিথ্যা একটা কিছু বলিবে কি? কিন্তু মনোরমা কলিকাতার মেয়ে। তাহার তীক্ষ্ণ জেরার মুখে মিথ্যা কৈফিয়ৎগুলা বন্যা-স্রোতে তৃণ-খণ্ডের মতই ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে! সাত বৎসর পূর্ব্বে চাণকের কোর্টে সে একবার এক মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিল, সেখানে উকিল-মোক্তারের জেরা হইতে অনায়াসে অক্ষত দেহে ফিরিতে পারিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীর জেরা,—তাহার কাছে আর পরিত্রাণ নাই। তবে গৃহে ফিরিয়া কি বলা যায়? এই তরমুজের প্রতি স্ত্রীরও আবার মমতার সীমা নাই! গ্রীষ্মে অক্ষয়-তৃতীয়ার

ব্রাহ্মণকে তরমুজে তুষ্ট• করিতে না পারিলে অন্তিমে তাহার স্বর্গলাভে বিষম অন্তরায় ঘটিবে বলিয়াই যে স্ত্রীর হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে! এবং এই ধারণার কথা আজ এক মাস ধরিয়া নিত্য মনোরমা বিপিনকে শুনাইয়া আসিতেছে!

এমন সময় ট্রেন সহসা থামিয়া গেল। নাড়া পাইয়া বিপিনের হুঁস হইল। সে দেখিল, ট্রেন দমদমা জংসন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছে। কত লোক উঠিল, নামিল। বিপিন ভাবিল, এখানে নামিয়া শিয়ালদহে একবার সে ফিরিবে কি? কিন্তু এই জিনিসগুলা যে আবার তাহা হইলে বহিতে হয়! সে-ও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তাহার উপর তরমুজটা যে এখনও ষ্টেশনে পড়িয়া আছে, তাহারই বা ঠিক কি! ভাবিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইবার পূর্ব্বেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বিপিন ভাবিল, থাক্, ও আর ভাবিয়া কোন লাভ নাই।

বেলঘরিয়া ষ্টেশনে ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন—নামিবার সময় বিপিনের প্রতি একটি সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়িলেন না। বিপিনের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সেই তরমুজের কথাই ভাবিতেছিল। মন হইতে যতই সে চিন্তাকে সে দূর করিবার চেষ্টা করে, ততই যেন মনের মধ্যে সে চিন্তা চাপিয়া আঁটিয়া বসে!

ট্রেন যখন পল্‌তা ছাড়াইল, কামরা তখন প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। শুধু বিপিন ও এক ধারে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাত্র বসিয়া ছিলেন। ভদ্রলোকটি কামরার কোণ ঠেসিয়া

দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার বর্ণ গৌর, মাথার সম্মুখে টাক্, গায়ে ভাগলপুরী বাফ্তার চায়না কোট। কোলের উপর একখানা বাঙলা খপবের কাগজ! বিপিন দেখিল, বাঃ, গোলাপ জামেব টুকবি ও তরমুজটা যে বাঙ্কে এখনও রহিয়া গিয়াছে। তাহার মতই কেহ ভুল করিয়া ফেলিয়া গেল না ত! কিন্তু না, ইঁহারও ত হইতে পারে! ঠিক তাহাই হইবে!

তবু আশার একটা ক্ষীণ জ্যোতি তাহার বিষণ্ণ আঁধার চিত্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। ঘুমন্ত ভদ্রলোকটির নিকটে গিয়া তাঁহাব গায়ে ঠেলা দিয়া বিপিন ডাকিল, "মশায়, ও মশায়, শুনছেন?"

ভদ্রলোক ধড়মড়িয়া চক্ষু মেলিলেন। কহিলেন, "কি,—হালিসহর এসেছে?"

"না।"

"তবে?" তীব্র দৃষ্টিতে তিনি বিপিনের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে বিপিন হঠিল না, কহিল, "এ তরমুজটি কত দিয়ে কিনেছেন?"

"সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?" বলিয়া ভদ্রলোক চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন কহিল, "বলি, ঘুমোলেন না কি?" ভদ্রলোক চোখ খুলিলেন না।

বিপিন তাঁহার গা ঠেলিয়া পুনরায় কহিল, "শুনছেন—?"

"কি?"

"তরমুজটা বেচবেন? আমি তা হলে কিনি।" ভদ্রলোক

কট্‌মট্‌ করিয়া বিপিনের পানে চাহিলেন, কঠিন স্বরে কহিলেন, "পাগল না কি, আপনি? বেশী পাগলামি করেন ত ট্রেনের শেকল ধরে এখনই টেনে দেব—" বলিয়া আবার নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন অবাক হইয়া গেল, ভাবিল, এমন অদ্ভুত লোকও দুনিয়ায় থাকে! তাহার মাথার মধ্যে রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষোভে নিরাশায় সমস্ত দেহ তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরের মধ্যে চিন্তার ঝড় বহিল।

ট্রেন ক্রমে শ্যামনগর ছাড়াইল। চারিদিক তখন ঈষৎ আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে। অন্ধকার গাছগুলার গায় জোনাকির দল চুমকির মত জ্বলিতেছে! এবার তাহাকে নামিতে হইবে। যদি কোন উপায় থাকে ত এই বেলা তাহার জোগাড় দেখিতে হইবে! নহিলে আর কোন আশা, কোন পথ নাই। বাঙ্কের উপর বিপিনের নজর পড়িল। তরমুজটা তখনও তথায় রহিয়াছে। ট্রেনের দোল্‌ পাইয়া নড়িতেছে! মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বিপিন পকেট হইতে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া দুই ছত্র পত্র লিখিয়া ফেলিল,—

"মহাশয়, আপনার তরমুজটি আমি লইয়া চলিলাম। বাড়ীতে আমার তরমুজের বিশেষ প্রয়োজন আছে, না হইলে নয়। তরমুজের দরুণ দুইটি টাকা এই চিঠিতে মুড়িয়া আপনার পকেটের মধ্যে ফেলিয়া গেলাম।"

পরে পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া চিঠির মধ্যে

পূরিয়া ভাঁজ করিয়া সেই কাগজের মোড়কটি সন্তর্পণে বিপিন ভদ্রলোকটির পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ভদ্রলোকের নাসিকা তখন বিপুল গর্জ্জনে নিদ্রাদেবীর প্রচণ্ড প্রভাব ঘোষণা করিতেছিল। তিনি ইহার কিছুই জানিলেন না।

"কান্-কিনারা—" প্লাটফর্ম্মের কুলির কণ্ঠ হইতে কয়টি কথা বিপিনের কর্ণে আজ যে মধু বর্ষণ করিল, কোন সঙ্গীতের সুরেও বুঝি তেমনটি কোন দিন ঝবে নাই! হাত-ছানি দিয়া বিপিন ইঙ্গিতে একটা কুলি ডাকিয়া তাহাব মাথায় জিনিস-পত্র উঠাইয়া নিঃশব্দে ট্রেনের কামরা ত্যাগ করিল। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল, গা ছম-ছম কবিতেছিল। নামিবার সময় নিদ্রিত সহযাত্রীর পানে সভয়ে একবার সে চাহিয়া দেখিল। অত্যন্ত সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে প্লাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া বিপিন যখন ষ্টেশন-গৃহের বাহিরে আসিল, ট্রেন তখন বাঁশী বাজাইয়া সরীসৃপের মত দীর্ঘ দেহ-ভার নাড়িতে সুরু করিয়াছে। এঞ্জিনের চিমনি হইতে অগ্নিময় ধূমোদ্গার হইতেছিল। বিপিনের মনে হইল, ট্রেনটা যেন দৈত্যের মত রক্ত বমন করিতেছে! কিছুক্ষণ ট্রেনের পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল। পরে সেখানা দূরে চলিয়া গেলে, তাহার পশ্চাতের লাল আলোগুলা যখন ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে তিনটা রক্ত-বিন্দুর মত মনে হইতেছিল, বিপিন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। উঃ—মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে! যদি সে লোকটার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত? তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল! তখনই আসিয়া চোর বলিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিত!

বিপিনের চোখের সম্মুখে এক রাশি লাল-পাগড়ী-পরা মাথা ও লৌহ গরাদযুক্ত ক্ষুদ্র একটা অন্ধকার ঘর নিমেষে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জাগিয়া উঠিল। কুলি ডাকিল, "বাবু—।" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল, "হাঁ, চল্।"

ঝিল্লী-মুখরিত অন্ধকার গলির পথ ধরিয়া বিপিন গৃহে চলিল। সেদিন কুলিটা কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর ছয় পয়সার জায়গায় বিপিন কি না তাহাকে একটা আধুলি বখ্‌শিস করিয়াছে!

৩

মনোরমা কহিল, "আজ তোমার ফিরতে এত দেরী হল যে? আমি ভাবছিলুম—"

বিপিন কহিল, "খুব ছোট ফর্দ্দখানি দিয়েছিলে কি না! আজ একেবারে কলকেতা সহর প্রদক্ষিণ করে ফেলেছি!"

বাজার দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে মনোরমা কহিল, "যাক্, তরমুজ আর আনারস যে আনতে ভোলনি, এতে আমার খুব আহ্লাদ হয়েছে! তুমি আনবে বলে আমি মনেও করিনি। বোশেখ মাসের দিনে ও দুটি জিনিস বামুনদের দিতে না পারলে কি তৃপ্তি হয়!"

বিপিন সে কথার কোন জবাব দিল না। এই তরমুজের জন্য আজ তাহাকে কম হায়রাণ হইতে হইয়াছে! জেলে অবধি যাইবার জো ঘটিয়াছিল। নেহাৎ অদৃষ্ট-গুণে বাঁচিয়া

গিয়াছে। লোকটার ঘুম যদি ভাঙ্গিয়া যাইত? ভাবিতে এ গ্রীষ্মের দিনেও বিপিনের সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখনও কে বলিতে পারে, অদৃষ্টে কি আছে! হালিসহরে পৌঁছিয়া যখন দেখিবে, তরমুজ নাই—তখন সেই চিঠির টুকরা ও টাকা দুইটা লইয়াই যদি সে সন্তুষ্ট না হয়? বিপিন স্থির করিল, ও পাড়ার যদুবাবুর ছেলেটি মোক্তারি পড়িতেছে, কাল সকালে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া একবার পরামর্শ না করিলে ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না! তরমুজ লইয়া এ যে বিষম উৎপাতে পড়া গেল!

অন্ধকার ঘরে পড়িয়া বিপিন কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মাধব আসিয়া দাবার ছক্‌ পাতিয়া বসিল। খেলায় বিপিনের যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও আজ সে নিতান্তই আনাড়ির মত হারিয়া গেল। মাধব কহিল, "যাও, যাও, আর খেলে না। তোমার মাথার ঠিক নেই। না হলে এ সব চালেও—"

মাধবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিপিন কহিল, "সারা দিন রোদে ঘুরে মাথাটা ভারী ধরেছে হে—"

রাত্রেও কি নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়! যেমন একটু তন্দ্রা আসে, অমনই ভাঙ্গিয়া যায়। মনে হয়, কে ঐ সদরের দ্বারে ঘা দেয় না! জানালার ফাঁক দিয়া অন্ধকার পথে লণ্ঠন হাতে কাহাকেও চলিতে দেখিলে, মনে হয়, বুঝি ফাঁড়ির চৌকিদার তাহার সন্ধানেই আসিতেছে! বিপিনের বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া ফুলিয়া

উঠিতেছিল! তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন-বিভীষিকারও অন্ত ছিল না। থানার প্রাঙ্গণ ও কাছারি-ঘরের আসামীর ডক্ চোখের সম্মুখে চাকার মতই যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্রিব অন্ধকারে ভয়টাও অতিরিক্ত ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এখন দিনের আলোয় মনের আঁধার অনেকখানি কাটিয়া গেল। কিন্তু না—দিনের আলো যতই তীক্ষ্ণ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, পাখীর ডাকে, লোকের কোলাহলে কর্ম্ম-চক্র যতই আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া চলিল, বিপিনের মনখানা ভয়ে ও ভাবনায় ঠিক সেই অনুপাতেই একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে ছিল। যদুবাবুর ছেলের কাছে আর যাওয়া ঘটিল না। পথে বাহির হইতে ভয় করে। কি জানি, রাত্রি বলিয়াই হয় ত পুলিশ আর কাল ততটা চাড় করে নাই, আজ দিনের বেলায় পথে বাহির হইলে যদি ধরিয়া বসে! সারা গ্রামে তাহা হইলে তখনই একেবারে ঢি-ঢি পড়িয়া যাইবে। এ অপবাদের পর কি আর কাহারও কাছে কখনও মুখ দেখানো যাইবে! আর মনোরমা? আহা, বেচারী মনোরমা! স্বামীর এ লাঞ্ছনার কথা শুনিলে সে আর এক দণ্ডও বাঁচিবে না। তখনই বিষ খাইয়া মরিবে!

তাই যখন মনোরমা আসিয়া তাহাকে কহিল, "ও কি গো, ঘরের কোণে বসে রইলে যে! কাকে-কাকে বলতে হবে, বলে এস না! এর পর রোদ উঠবে, বেরুবে কি করে? তার

পর ত দুপুর বেলা তাসের মাতন চলবে। আজই সব বলে এস গে—”, বিপিন তখন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল ; তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

আহা, বেচারী মনোরমা ! হরিণীর মত দিব্য স্বচ্ছন্দ লঘু চিত্তে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে ! সে জানেও না, কোথা হইতে ব্যাধের গোপন শর এখনই নিমেষে তাহাকে বিদ্ধ, জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতে পারে ! দুর্ভাবনায় তাহার মনের ভিতরটা একেবারে অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল ! ভরা মেঘের পিছনে জল যেমন স্তম্ভিত রুদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, একটা দম্‌কা বাতাসের ঘা খাইলেই ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহারও চোখের পিছনে অশ্রুর রাশি তেমনই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মনোরমা যদি তাহার সহিত আর দুই-একটা কথা কহিত, তাহা হইলেই বিপিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে অশ্রুর রাশি হু-হু করিয়া ঝরিয়া পড়িত ! কিন্তু বিপিনের সৌভাগ্য যে মনোরমা দাঁড়াইল না, ব্যস্তভাবে তখনই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু শুধু যে আবার এমন চুপ কবিয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না। বন্ধু-বান্ধব আসিয়া বাহিরে ডাক পাড়ে, স্নানাহারের বেলা হইয়া যায় বলিয়া মনোরমা সঘন তাগিদ দেয়। এ সব-গুলার দিকে মনোযোগ অর্পণ না করিলে সকলের সন্দেহ জন্মিতে পারে, বুঝি কিছু ঘটিয়াছে ! অথচ এ বিপদের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা যেন একেবারে কাটা যায় ! মনোরমাকেও এ কথা খুলিয়া বলা চলে না !

রবিবার তাহার খেলা-ধূলা ও আনন্দ-বিশ্রামের ডালি বিলাইয়া বিদায় লইল। বুকের মধ্যে সারা ক্ষণ আশঙ্কার কাঁটা খচ্ খচ্ করিলেও শুধু লোক দেখাইবার জন্য বিপিন ভারাক্রান্ত চিত্তে সে আনন্দ-বিশ্রাম ও খেলা-ধূলার ডালির অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সোমবার সকালে আবার নিত্য'কার মতই নয়টা বাজিল। ভয়-ভাবনা, বজ্রের মত মাথাব উপর উদ্যত থাকিলেও অফিস কিন্তু কামাই করা যায় না। অফিসে যাইতেই হইবে। সেদিন আবার গৃহে অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রাহ্মণ-ভোজন। মনোরমার অনুরোধ-অনুযোগ-সত্ত্বেও বাড়ীর কাজ-কর্ম্মে বিপিন একবার উঁকিটি অবধি পাড়িতে পারিল না।

অফিস যাইবার সময় স্ত্রীর মুখখানির পানে কতবার যে সে ম্লান দৃষ্টি পাত করিয়াছে, তাহা সে-ই জানে। স্ত্রী কিন্তু কাজের ভিড়ে সে করুণ দৃষ্টি লক্ষ্যও করিতে পারে নাই! শেষে বাড়ী ছাড়িবার সময় তাহার মনে হইল, একবার ডাকিয়া বলি, "ওগো বিদায়, চির-বিদায়! আর বুঝি বাড়ী ফিরিব না। এখান হইতে একেবারেই জেলে চলিলাম!" কিন্তু না, এ কথা বলা চলে না। বাহিরের লোক বিস্তর আসিয়া বাড়ীতে জমা হইয়াছে। খাঁদুর পিসী, রাধির মা, গগির খুড়ী—সকলে অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিবে! ফলে ব্যাপারখানার মধ্যে

যতটুকু করুণ রস আছে, তাহা কাহারও নজরেই পড়িবে না, তাহারা শুধু নিঙড়াইয়া ইহার মধ্য হইতে কৌতুক-রসটুকুই নিঃশেষে আদায় করিয়া ছাড়িবে! কাজেই আর স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া বিদায় লওয়া হইল না। কিন্তু যদি আর গৃহে ফেরা না ঘটে? বিপিনের সারা প্রাণ এক আকুল উত্তেজনায় হায়-হায় করিতে লাগিল।

ট্রেন আসিলে বিপিন তাহাতে চড়িয়া বসিল। সহসা পাশের কামরায় তাহার নজর পড়িল। ও কি! শনিবারের ট্রেনের সেই ভদ্রলোক—না? ঠিক! কোন ভুল নাই! সেই মাথায় টাক, ভাগলপুরী বাফতার কোট গায়ে—পাশে সেই চাঁচের তৈয়ারী ছোট ব্যাগ! সে কামরায় লোকও একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। ভদ্রলোকটি এক পেণ্টুলেন-পরা যুবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কি কথা? বিপিন উদ্‌গ্রীবভাবে কান পাতিল।

ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন, "ভাগ্নেটির আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, রবিবার—তাই আর কি শনিবার হালিসহর গেছলাম। শোন, তারপর মজার কথা। ভগ্নীপতি লিখেছিলেন, কলকেতা থেকে যেন কতকগুলো ক্ষীরের খাবার-দাবার আর কিছু ফল-ফুলুরী কিনে নিয়ে যাই! তা বাড়ী থেকে মেয়েরা তার ব্যবস্থাও করে দিছল। আমার ছোট ছেলে ষ্টেশনে এসেছিল, দেখে-শুনে সব উঠিয়ে দেবার জন্য! তা টিকিট কিনে প্লাটফর্ম্মে আসবার সময় দেখি, আমার জিনিস-পত্রের কাছে প্রকাণ্ড এক গোয়ালন্দর

তরমুজ পড়ে আছে। অথচ সেটাকে দাবী করবার কেউ নেই—আমার সঙ্গে তরমুজ মোটে নেওয়াই হয় নি। ছেলে বললে, 'বাবা, তরমুজটা তুলে নি—কেউ ফেলে চলে গেছে বোধ হয়। এখানে পড়ে থাকলে এখনই রেলের কোন্ বেটা কুলি নিয়ে গিয়ে হয় ত সাবাড় করে দেবে।' বলে সে সটান্ সেটা নিয়ে আমার গাড়ীতে তুলে দিলে। বাঙ্কে সব রেখে আমি ত একটি কোণ জোগাড় করে দিব্যি বসে গেলাম। আর গাড়ীতে বসলেই, কি জান, আমার কেমন বদ্ স্বভাব, ভাবী ঘুম পায়। এই তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তাই জেগে আছি, না হলে এতক্ষণ বেশ এক ঘুম হয়ে যেত—"

পাশের কামরা হইতে বিপিন উৎকর্ণভাবে সব কথা শুনিতে লাগিল। যুবা কহিল, "তার পর ?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তাব পর ত দিব্যি ঘুম এসেছে, ঘুমুচ্ছি—হঠাৎ ঠেলা দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, 'মশায়, তরমুজটা বিক্রী করবেন ? আমি কিনব। ভারী রাগ হল। ঘুমটা চটে যাওয়ায় মন একেবারে খিচড়ে গেল। তাকে ধমক দিয়ে ফের ত ঘুমোতে লাগলাম।—কি জবাব দিছলাম, তা অবশ্য কিছুই মনে নেই। তার পর শোন মজা—হালিসহরে এসে নামবো—দেখি, তরমুজটা নেই। তখন অবশ্য অতখানি খেয়ালও হয়নি। ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়ে কুলি ভাড়া দেব বলে পকেটে হাত দিতেই কি একটা মোড়া কাগজ হাতে ঠেকল। বের করে ভাগ্নের হাতে দিলাম। সে পড়লে—সে একটা চিঠি—এই দেখ।"

বলিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া পকেট হইতে একটা কাগজের টুকরা বাহির করিয়া যুবার হাতে দিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে বিপিন সে কাগজটার পানে চাহিল—এ যে সেই চিঠি,—ছুইটা টাকা মুড়িয়া যেখানা সেদিন সে ভদ্রলোকটির পকেটে ফেলিয়া দিয়া ট্রেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল!

পত্রখানা পড়িয়া যুবা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি হাসিয়া কহিলেন, "এখন দেখ একবার গ্রহ। পরের তরমুজ ঘাড়ে করে তার উপর আবার ছুটো টাকা খেয়ে পাতক-গ্রস্ত হতে বসেছি! এখন এ টাকা ছুটো নিয়ে বিষম বিপদে পড়েছি। ভদ্রলোক এ টাকা না দিয়ে যদি শুধু সে তরমুজটাই নিয়ে যেতেন, তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকত না। এখন এ টাকা ছুটো নিয়ে যে কি করি, তা ত মোটে ভেবেই পাচ্ছি না।"

একজন বলিল, "সে লোকটি কোথায় নেমে গেলেন, তা জানেন না?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তা আর জানব কোথা থেকে? আমার যে তখন মাঝ রাত্রি!"

আর-একজন বলিল, "তাঁর চেহারাখানাও মনে নেই?" বিপিনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল; নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, "না।"

আবার বিপিন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার বুকের মধ্যে এই কয় ঘণ্টা ধরিয়া যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা যেন কতক শান্ত

হইয়া আসিল। হাসিও না পাইল, এমন নহে, কিন্তু অনেক কষ্টে সে হাসি সে চাপিয়া গেল।

যুবা কহিল, "তাই ত! কার টাকা, কি করে সন্ধান পাবেন?"

একজন কহিল, "বঙ্গবাসীতে একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিন না—"

"পাগল!" বলিয়া ভদ্রলোক হাসিলেন। পরে কহিলেন, "এক হপ্তা চুপ্‌চাপ্ থেকে দেখি। তার পর ভাবছি, হালিসহরে একটা নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে,—ষ্টেশনের ধারেই একেবারে,—ট্রেন থেকে দেখা যায়—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, "ওঃ—ঐ দয়াময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা বলছেন?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "হাঁ, দয়াময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ই বটে! তা ভাবছি, এক হপ্তা পরে ভাগনের হাত দিয়ে টাকা-দুটি ঐ চিকিৎসালয়েই পাঠিয়ে দেব। কি বল?"

আকাশে মেঘ করিয়া রৌদ্রটুকু চাপা পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ শীতল বায়ু বহিতে সুরু করিয়াছিল। বিপিন কামরার জানালার কাঠে মাথা রাখিল। তপ্ত ললাট বায়ু-স্পর্শে জুড়াইয়া গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, আজ যেন তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

মোহ

বিনোদচন্দ্র এফ-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় বি-এ পড়িতে আসিল। কলিকাতায় তাহার এক নূতন উপসর্গ জুটিল,—থিয়েটার!

থিয়েটারে নূতন নাটক খুলিলেই মেসের সঙ্গীগণের সহিত তাহার অভিনয় দেখিতে যাওয়া তাহার কখনও বাদ পড়িত না। সঙ্গীর দল অভিনয় দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া, খানিকটা-বা তারিফ দিয়া অভিনয়েব জের শেষ করিয়া ফেলিত, কিন্তু এই মায়া-বিভ্রমের মধ্য দিয়া বিনোদচন্দ্রের অন্তরে ধীরে ধীরে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল।

এই নিতান্ত একঘেয়ে জীবনের উপর তাহার কেমন ঘৃণা জন্মিতেছিল! নিত্য সকালে উঠিয়া সেই বই লইয়া বসা, তাহার পর মাথায় একটু জল ঢালিয়াই নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া কলেজ যাওয়া। তথায় হাই তুলিয়া অধ্যাপকগণের গণ্ডী-ঘেরা নীরস বক্তৃতা শুনিয়া অপরাহ্নে মেসে প্রত্যাগমন—ও পরে অর্থহীন হাসি-গল্প-গানে সময় কাটাইয়া আহার ও নিদ্রা! একদিনের জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই! কোথাও এতটুকু বৈচিত্র্য নাই! কলের মত ঘড়্ ঘড়্ করিয়া দিনগুলা বহিয়া চলিয়াছে—এই কি জীবন?

কিন্তু ঐ মায়াময় ইন্দ্রজালময় আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের

লোকগুলির জীবন-স্রোত কি বিচিত্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে! সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ, প্রেম, নৈরাশ্য, তাহারই চকিত স্পর্শে কখনও হর্ষ, কখনও বেদনার আভাষ—কি সুন্দর লোভনীয় জীবন! দারুণ দুঃখে জীবন ভার বোধ হইতেছে, কোন দিকে এতটুকু আশার আলো দেখা যায় না! সহসা কোথা হইতে স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল! জাগিয়া দুঃখী চাহিয়া দেখে, অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া কোন্ দেবী আসিয়া তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়াছে! কোন সুদৃঢ় নিয়মের বন্ধন নাই! এ এক অপূর্ব্ব রাজ্য! এই অপূর্ব্ব রাজ্যে শুধু আলো, হাসি, গান ও আনন্দ! সেখানে না আছে, চাকর বামুনের দ্বন্দ্ব-ফর্দ্দ, না আছে সহযোগীগণের তর্ক-কোলাহল, না আছে ট্রামের ঘর্ঘর বা অধ্যাপকের প্রলাপ!

২

লিলি থিয়েটারে সেদিন মহাসমারোহে "মনিয়া" গীতি-নাট্যের প্রথম অভিনয় হইবে! চিত্র-বিচিত্র-করা বিজ্ঞাপনের রঙ্গিন কাগজে থিয়েটার-ওয়ালারা সহরের বুক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! বিনোদচন্দ্রের মেসের সঙ্গীর দল সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই থিয়েটার-গমনের উদ্যোগ-আয়োজনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

রাত্রি নয়টায় থিয়েটার বসিবে। আটটার সময় হইতেই থিয়েটার-গৃহের সম্মুখস্থ পথে বিষম লোকারণ্য! টিকিট কিনিবার কোন সুযোগ-সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বহু দর্শক টিকিট-ঘরের দিকে

ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া নিবাশ হৃদয়ে পথে ফিরিতেছে। বিনোদচন্দ্রের দল অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া গিয়াছে। ভবানী পান বিলাইতেছে, হেমেন্দ্র সিগারেট টানিতেছে, দয়াল প্রোগ্রাম পড়িতেছে, আর বিনোদচন্দ্র মঞ্চস্থ পটের পানে চাহিয়া ভাবিতেছে—ঐ পট! ঐ মোটা পর্দ্দার পশ্চাতে কি বিরাট কাব্য এখনই উন্মুক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! সুখ-দুঃখের তড়িৎ খেলা! কাব্য-লোকেব যে সকল নরনারীর হর্ষে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, বেদনায় চিত্ত কাতর হইয়া পড়িবে, তাহারা তাহাব হাসি বা অশ্রুর কণাটুকু লক্ষ্য করিবে না, তাহার এতখানি আন্তরিক সহানুভূতির মর্ম্মও বুঝিবে না! কোন্ দেশের সুখ-দুঃখ-ভোলা প্রাণী ইহারা, —সুখে, দুঃখে, অনুবাগে, বিরাগে এমন অবিচল অচপল চিত্ত!

ঘণ্টা বাজিল। পট উঠিল। প্রথম দৃশ্য, রাজার প্রমোদ-উদ্যান। রাজবধূ মনিয়া মৃগয়া-গত স্বামীর সংবাদ না পাইয়া কাতর উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন। গান গাহিয়া, গল্প করিয়াও সখীগণ মনিয়ার সে উদ্বেগ দূর করিতে পারিতেছে না! বধূর মুখে প্রেমের আলোটুকু ম্লানিমার ছায়া-পাতে দিব্য কমনীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রাবণের আকাশে মেঘের কোলে চাঁদের পাণ্ডু ছবির মতই তাহা করুণ, মর্ম্মস্পর্শী! বিনোদচন্দ্র ভাবিল, আহা অভাগিনী রাজবধূ!

দৃশ্যের পর দৃশ্য পবিবর্ত্তন হইতেছিল! নাটিকার ঘটনা ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। বিনোদের মনে হইতেছিল, এ যেন সে জাগিয়া চোখে কিছু দেখিতেছে না—এ স্বপ্ন!

প্রথম অঙ্কের শেষে দেখা গেল, রাজপুত্র মোহনসিংহ এক ছদ্মবেশিনী দৈত্য-কন্যার রূপের মোহে পড়িয়া, পত্নী, রাজ্য, গৃহ, সব ভুলিয়া বসিয়াছে! নানা উৎপীড়নে মোহনের প্রেম বাধা পাইলেও বন্ধ মানিতেছিল না। দৈত্য-কন্যা যত যন্ত্রণা দেয়, তাহার প্রেম তত তীব্র, অনুবাগ ততই প্রবল হইয়া উঠে! গৃহে এখানে মনিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তথাপি মোহনের মোহ আর ভাঙ্গে না! বিনোদের চোখে জল আসিল।

তৃতীয় অঙ্কে নাটিকাব সমাপ্তি। ক্রমে সেই তৃতীয় অঙ্ক দেখা দিল। মনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বামীর সন্ধানে নিজেই বাহির হইয়াছে! কত নদী-পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ক্ষেত্র-প্রান্তর পার হইয়া বিপদে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া দূর শৈলতলে রাজকন্যা এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইল। সন্ন্যাসীর মুখে সে শুনিল, তাহার স্বামী এক দৈত্য-কন্যার প্রেমে মজিয়া সব বিসর্জ্জন দিয়াছে! দৈত্য-কন্যা নানা প্রলোভনে কত সুশ্রী তরুণ যুবককে ভুলাইয়া আনিয়া নৃশংসভাবে তাহাদের হত্যা করে! সন্ন্যাসী খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিলেন, মোহন যদি তাহার প্রিয়জন মনিয়াকে দেখিতে পায়, তবেই শুধু তাহার মুক্তির আশা আছে,—এ মোহ কাটিবার সম্ভাবনা আছে! নহিলে আজ রাত্রি-শেষে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চয়!

তবে ত আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নহে! সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে! পথ জানিয়া লইয়া মনিয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিল। সে এক তুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ শৈল-শিখরে দৈত্য-কন্যার কনক-প্রাসাদ—মোহন

সেইখানে আছে! সে শৈলের পথও দুর্গম! সন্ন্যাসীর বাস-শৈলের অপর ধারে যে গভীর প্রপাত, তাহারই পরপারে দৈত্যের শৈল-পুরী!

শুধু একটি উপায়! মনিয়া তাহাই অবলম্বন করিল। সন্ন্যাসীর বাস-শৈলের শৃঙ্গে সে উঠিতে লাগিল। পা আর চলে না —ভারিয়া যায়! কঠিন বন্ধুব পথ!

ক্রমে আকাশ মেঘে ভরিয়া আসিল। মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়—ভীষণ প্রলয় ঝড়! কিন্তু মনিয়ার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই! ক্ষণে ক্ষণে বিজলী হানিতেছে! সেই ক্ষণিক আলোকের সাহায্যে পথ খুঁজিয়া মনিয়া ক্রমে শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল! আবার বাজ হাঁকিল, কক্কড়! কড়! বিদ্যুৎ চমকিল! বিদ্যুতেব আলোয় মনিয়া দেখে, ঐ যে সেই দৈত্য-কন্যার কনক-প্রাসাদ! কালো মেঘের কোলে ঝিক্-ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। যেন কালো কাপড়ের গায় কে ছোট একটি সোণার চুমকি বসাইয়া দিয়াছে! এই চকিত আলোকে কি করিয়া মোহন তাহাকে চিনিবে? কি কবিয়া তাহার মোহ ভাঙ্গিবে, প্রাণ বাঁচিবে?

পর্ব্বত-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া মনিয়া তখন গান ধরিল। সে এক আকুল কাতর কণ্ঠস্বর! মর্ম্মভেদী বিলাপ! কোথায় প্রিয়তম, কোথায় তুমি—আলেয়ার আলোয় পথ ভুলিয়া দিক্‌ভ্রান্ত তুমি কোন্ বিপথে গিয়াছ? তোমারই পথ চাহিয়া এখানে তোমার দুঃখিনী দাসী যে বসিয়া আছে, প্রভু! ওগো দয়িত, ওগো

প্রেমাধার, ওগো জীবন-সর্ব্বস্ব—এস, এস! তোমার মনিয়ার বুকে ফিরিয়া এস!

মিষ্ট কণ্ঠের করুণ সঙ্গীতে সারা রঙ্গমঞ্চে একটা শোকের প্লাবন বহিয়া গেল। দর্শকমাত্রেই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল। বিনোদচন্দ্রের চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতেছিল। এমন সুন্দরী বধূ—রূপে মাণিক ঠিকরিয়া পড়িতেছে—তন্বী দেহলতা-খানি কবি-বর্ণিতা পল্লবিনী লতার মতই সুশ্রী, কোমল! হৃদয়ে তাহার এত প্রেম, তবু—সে দুঃখ, পাইবে! অবোধ রাজপুত্র! যে রূপের পদতলে সমগ্র বিশ্ব বিপুল শ্রদ্ধায় শির লুণ্ঠিত কবিয়া দিতে চায়, দিয়া ধন্য হয়,—সে রূপের তুমি আদর জান না? মূঢ়, দুর্ভাগা তুমি!

মনিয়ার অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিল! প্রতি শনিবার থিয়েটারে মনিয়ার অভিনয় চলিল এবং প্রতি অভিনয়-রাত্রেই বিনোদচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত আসিয়া দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল! মনিয়ার রূপ, মনিয়ার ভাগ্য তাহাকে একান্তই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল! বিনোদ ভুলিয়া গেল, সে থিয়েটার দেখিতেছে, ভুলিয়া গেল, মনিয়ার অস্তিত্ব শুধু কবির কল্পনায়! ভুলিয়া গেল, মনিয়ার ভূমিকা যে লইয়াছে, সে একজন অভিনেত্রী,—অভাগিনী, সমাজ-পরিত্যক্তা, পতিতা নারীমাত্র!

ক্রমে এই মনিয়া তাহাকে রীতিমত আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

থিয়েটারের এক গার্ড একদিন বিনোদচন্দ্রের এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিল। সে আসিয়া গায়ে পড়িয়া একদিন তাহার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল, "কেমন দেখছেন ?"

তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিনোদের চমক ভাঙ্গিল! সে অভিনয় দেখিতেছে বটে! সে বলিল, "চমৎকার!"

তখন গার্ড বলিল, এই অভিনেত্রী মুরলাকে অনেক টাকা বেতন দিয়া থিয়েটারে নিযুক্ত করা হইয়াছে—এত বেতন থিয়েটারে আর কাহাকেও দেওয়া হয় না—যেমন তাহার মধুর কণ্ঠ, অভিনয়-কলায় দক্ষতাও তেমনই অসাধারণ! বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুল্য শক্তি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নাই! থিয়েটার বাটীর সম্মুখেই সে থাকে! অভিনয় শিখিতে আগ্রহও তাহার

বিনোদচন্দ্র ভাবিল, এই মনিয়া–ইহার সহিত দুইটা কথা কহিতে দোষ কি! আহা, অভাগিনী রাজবধূ! বিনোদচন্দ্রের মনে আকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল! একটা মোহ! সে এই মনিয়ার রূপের! দুঃখিনী রাজবধূ. মনিয়া—একবার সে তাহাকে দেখিবে– সে যে মনিয়ার ব্যথায় ব্যথা অনুভব করিয়াছে, ইহা সে একবার তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে! বিনোদের মনে হইতেছিল, রূপের কথা! রূপের পূজার কথা। কবির দল যে রূপের সাধনায় সারা জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সে রূপ

কি অর্থ-হীন, উপেক্ষার সামগ্রী? রূপ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—তাঁহারই প্রতিবিম্ব! এই রূপের প্রতি যদি সে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ত তাহাতে কাহার কি আপত্তি থাকিতে পারে! নারায়ণ যেদিন মোহিনী-মূর্ত্তিতে জগতে দেখা দিয়াছিলেন, সেদিন সর্ব্ব-ত্যাগী শঙ্করও যে সে রূপ দেখিয়া উন্মাদ হইয়া ছিলেন! রূপের উপাসক কে নয়? রূপের উপাসনা করিব, তাহাতে কিসের দ্বিধা, কিসের সঙ্কোচ?

দুর্ব্বল চিত্ত! ক্ষণিক ভ্রান্তি!

গার্ডের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া বিনোদচন্দ্র স্থির করিল,—পরদিন সন্ধ্যার সময় মনিয়ার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। গার্ড হাসিয়া বলিল, "এ ত অনুগ্রহ!"

পরদিন সন্ধ্যার সময় কথামত বিনোদ আসিয়া থিয়েটার-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। গার্ড তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিনোদকে দেখিয়া বলিল, "আসুন।"

বিনোদচন্দ্রের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! সহসা পা যেন বাধিয়া গেল! মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল! কিন্তু কেন এ সঙ্কোচ! কে জানে, কেন? তবু পা যেন কে চাপিয়া ধরে—ছাড়িতে চাহে না!

বিনোদচন্দ্রকে লইয়া গার্ড একটা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। উপরের একটা ঘর হইতে তবলার ধ্বনি ভাসিয়া

আসিতেছিল, তাহার সহিত তারিফের একটা জড়িত স্বর, 'হা হাঃ—হাঃ !'

সিঁড়ি বহিয়া বিনোদ গার্ডের সহিত দ্বিতলের দালানে উঠিল। দালানের প্রান্তে বসিয়া এক নারী ছোট হুঁকায় তামাকু টানিতেছিল। নারী প্রৌঢ়া—দেহ কৃশ, মুখে-চোখে গভীর কালির রেখা, সমস্ত অবয়বে যেন একটা কদর্য্যতার ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে ! গার্ড ডাকিল, "মুরলা—"

প্রৌঢ়া নারী উঠিয়া দাঁড়াইল—হাতের হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আসুন।"

বিনোদ সসঙ্কোচে কহিল, "এ কে ? আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?"

গার্ড হাসিয়া কহিল, "আরে, এই ত মশায়, আপনার প্রাণের মনিয়া—আমাদের মুরলাসুন্দরী—"

এই মনিয়া ! এই কুশ্রী বীভৎসা নারী ! পাপের মূর্ত্তিমতী ছায়া—এই মনিয়া ! সেই রূপের নির্ঝর, প্রেমের আদর্শ, ললামভূতা মনিয়া—সে এই ! দারুণ দাহে বিনোদের অন্তর পুড়িয়া গেল ! মনিয়া,—তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের শান্তি,—সে এই ! কল্পনার স্বর্গ একটা নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল—সেই খণ্ড ভগ্ন-স্তূপে কি আবর্জ্জনা প্রকাশ হইয়া পড়িল ? এ যে নরক ! ধিক তাহাকে ! সে এই নীচ ঘৃণ্য প্রাণীটাকে দেখিতে আসিয়াছে ! যেখানে নরকের দারুণ বহ্নি জ্বলিতেছে, সেখানে সে সঞ্জীবনী সুধার অন্বেষণে আসিয়াছে ! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান,

রূপ,—তাহাও ইহার নিজস্ব নহে? ভাড়া-করা বেশ ও বর্ণের সাহায্যে শুধু কুহকের জাল বিস্তার করিয়া বেড়ায়!

বিনোদের সমস্ত প্রাণ ঘৃণায় লজ্জায় কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল! সে একেবারে সিঁড়ি বহিয়া নীচে আসিল। গার্ডটা পশ্চাতে ছুটিল—বিনোদের হাত ধরিয়া সে কহিল, "পালাচ্ছেন কেন? আসুন, গানটান শুনুন!"

পৈশাচিক ক্রোধে বিনোদ জ্বলিয়া উঠিল।

তীব্র স্বরে চীৎকার করিয়া সে বলিল, "ছেড়ে দে, পাষণ্ড— এই নরকে আমায় তুই টেনে এনেছিস্? ছেড়ে দে।"

সজোরে গার্ডেব হাত ছিনাইয়া বিনোদ বাহিরে পথে আসিয়া পড়িল। তাহার ললাটে স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল—রুমালে তাহা মুছিয়া দ্রুত একখানা চলন্ত ট্রামে সে উঠিয়া পড়িল।

স্তম্ভিত গার্ড উপরে আসিলে মুরলা কহিল, "ব্যাপার কি? অমন করে চলে গেল যে—?"

"পাগল! পাগল!" বলিয়া সম্ভাবিত অর্থ-লাভে নিরাশ ব্যথিত-চিত্ত গার্ড মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

আইনের প্যাঁচ

বি, এল পাশ করিয়া আলপাকার নূতন চোগা-চাপকান গায়ে আঁটিয়া মাথায় শামলা চড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক সতীর্থ সুহৃদ্ আসিয়া আশ্বাস দিলেন, "ওহে, ক্রিমিনালে ঢুকে পড়। কাঁচা পয়সা—সিভিলের মত বিরাট ধৈর্য্য নিয়ে বসে থাকতে হয় না, চট্ করেই পশার জমে যায়।"

হাসিয়া সতীর্থ আরও কহিলেন, এই দুই বৎসর ক্রিমিনালে বাহির হইয়া তাঁহার দিনগুলা নিতান্ত বিফলে কাটে নাই! বিশেষ যদি ভালো একটি দালাল জুটাইতে পারি ত দুই বৎসরের মধ্যে গাড়ী-ঘোড়া করিবারও সামর্থ্য-সম্ভাবনা আছে!

ক্রিমিনালে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘর হইতে প্রাচীন তক্তা-পোষখানিকে বিদায় দিয়া টেবিল-চেয়ারে ঠাঁই জুড়িলাম। খেলা-ধূলা ও গল্প-গুজবের পাট উঠিল। শেষে অদৃষ্টক্রমে একদিন বরাত খুলিবারও সূচনা দেখা দিল।

সকালে চায়ের পিয়ালা নিঃশেষ করিয়া খপরের কাগজখানা খুলিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকার হাত ধরিয়া অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠনা এক প্রৌঢ়া আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আপনি কি ফৌজদারীর উকিল?"

খপরের কাগজখানাকে ঠেলিয়া রাখিয়া হেণ্ডারসনের বিরাট-

বপু 'ফৌজদারী কার্য্যবিধির' পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গম্ভীর-ভাবে কহিলাম, "হুঁ।"

প্রৌঢ়া কহিল, "জজ-কাছারির বিশ্বম্ভরবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন—আমার একটা নালিশ আছে—তিনি বললেন, সেখানে হবে না, ফৌজদারীতে দরখাস্ত দিতে হবে।"

আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল! আসিয়াছে! আমার মক্কেল-বঁধূ এই যে আসিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তোমার নালিশ?"

"এই মেয়েটি নিয়ে বাবা এক বিপদে পড়েছি—মেয়েটিই আমার সম্বল।—বিয়ে দিয়েছি—তা জামাইয়েব সঙ্গে মোটেই বনিবনা নেই—আমি গরীব, অবীরে, কোথা থেকে একে খাওয়াই? তাই হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিয়ে একটা খোরাকির বন্দোবস্ত যদি করে দেন!"

নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ৪৮৮ ধারা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার উপর দিয়া চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "কেন? জামাই নেয় না?"

"সে বাবু অনেক কথা। আর যখন নালিশ করতেই এসেছি, তখন আপনাকে সব কথা খুলে বলব বই কি! এইখানে সরে আয় মালতী—বোস্।"

মেয়েটির নাম বুঝিলাম, মালতী।

তাহার পর প্রৌঢ়া বকিয়া গেল—কেমন করিয়া কত দেবতার দ্বারে হত্যা দিয়া, কত সাধুর পদধূলি শিরে ধরিয়া, কত মন্দিরে

মানত করিয়া এই কন্যা হয়! কন্যা হইলে কি হইবে, পুত্রের মতই তাহার শত আব্দার-অত্যাচার নীরবে মাথায় বহিয়া প্রৌঢ়া মেয়েটিকে মানুষ করিয়াছে। বরাত মন্দ, তাই কর্ত্তা একদিন ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তখন কাট্না কাটিয়া লোকের বাড়ী রাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া মেয়ের সে বিবাহ দিয়াছে। জামাইয়ের অর্থও কিছু আছে, তবে কেমন যে তাহার স্বভাব, মেয়েকে মার কাছে পাঠাইতে চায় না। পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, উঠিতে-বসিতে জামাইয়ের মা-বৌনের বাক্যযন্ত্রণাও কি মেয়েকে কম সহিতে হয়! মার এই একটি সন্তান! তাহাকে না দেখিলে মার প্রাণ কেমন করিয়াই বা সুস্থির থাকে? আর মেয়েও এক মা বই আর কিছু জানে না—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তের বৎসরে পা দিলে কি হয়, মাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। তা উহারা দুইদিনের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না! আসিবার জন্য বায়না ধরিলে মার-ধর অবধি করে! মেয়ে কান্নাকাটি করে—তাহারা বিরক্ত হয়। একবার অসুখের সময় বেহুঁস মেয়ে রাঁধিতে গিয়া ভাতটা একটু ধরাইয়া ফেলিয়াছিল—তা শ্বাশুড়ী মাগী হাতে গরম ফেন ঢালিয়া দেয়! মেয়ের খুব ব্যামো হয়। মা মেয়েকে একবার দেখিতে গিয়াছিল, মেয়ে মার সঙ্গে চলিয়া আসিবে বলিয়াছিল। মা বুঝাইয়া ছিল, না, তাহা হইবে না। সেই ঘরেই কোনমতে তাহাকে বনাইয়া থাকিতে হইবে। সেই ঘরই তাহার নিজের ঘর!

মেয়ে কিন্তু বুঝিল না। অসুখ সারিলে সে কান্নাকাটি ধরিল, মার কাছে যাইবে! তাহারা বিরক্ত হইয়া মার কাছে মালতীকে একদিন ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। মেয়ে সেখানে যাইতে চাহে না—এই বয়সে বাছাকে রাঁধিতে হয়, বাড়িতে হয়, এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জল অবধি আনিতে হয়! দেইজী জ্ঞাতিও দুই-চারিজন আছে, তাহারা দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়! কুটাটি নাড়িয়া কেহ কখনও সাহায্য করে না—কিন্তু এ সকলই সহ্য হয়, তবে এই যে পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, উঠিতে বসিতে গালি দেয়, মার-ধর করে —এমন করিলে মার প্রাণ কি করিয়া সুস্থির থাকে! কাজেই মেয়েকে সে-ও আর পাঠাইবে না। এইটিই তাহার সম্বল! এত বড় পৃথিবীতে আর কে-ই বা তাহার আছে! মেয়েকে নিজের কাছে রাখিবে। কিন্তু সে গরীব, অন্নের সংস্থান নাই, —জামাই খোরাকী না দিলে কি করিয়াই বা মেয়েকে খাওয়ায়। নিজের যেমন করিয়া হোক, এক রকমে চলিয়া যাইত, তাহার জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু মেয়ে—

কথাটা সংক্ষেপে রিপোর্টে সারিলাম। এইটুকু বলিতে তাহার কিন্তু অনেকখানি সময় লাগিয়াছিল। বিস্তর অশ্রু ও হা-হুতাশে বক্তব্যটুকু সে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, "তোমার মেয়েকে যে মার-ধর করে, তার কোন চিহ্ন আছে?"

প্রৌঢ়া কহিল, "সবে আয় ত মা, মালতী।" বলিয়া মেয়ের করপুট টানিয়া প্রৌঢ়া আমাকে দেখাইল। ছোট হাত দুটিতে কড়া পড়িয়াছে। কড়ার মাঝে মাঝে সাদা দাগ! গরম ফেন ঢালার চিহ্ন! আমি ঈষৎ বিচলিত হইলাম,—কহিলাম, "এ যে বড্ড পুরোনো দাগ—এতে চলবে কি!"

মা তখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোথাও দাগ আছে রে?" মেয়ে সাড়া দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বহিখানা বন্ধ কবিয়া আমি কহিলাম, "মাব-ধর কি কোন অত্যাচারেব চিহ্ন না দেখাতে পারলে সে খোরাকী দিতে বাধ্য হবে না ত, বাপু। যদি সে বলে, আমার স্ত্রী আমার কাছে আসুক। হাকিম তখন জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেন যাবে না? তখন?"

প্রৌঢ়া বলিল, "কেন, তখন বলবে, আমি মার কাছে থাকব। ওখানে বড় জালা-যন্ত্রণা দেয়। সে সব সয়ে থাকতে পারি না। আমার, বাবা, এই মেয়েটি ছাড়া আর কে আছে, বল—ঐটিই হলগে আমার চোখের তারা! তাদের বৌ গেলে আবার বৌ হতে কত ক্ষণ? কিন্তু আমার মেয়ে গেলে আর ত তাকে ফিরে পাব না।"

আমি বিরক্ত হইলাম। নাঃ—এখন এ সেন্টিমেণ্টালিটি থামাই কি করিয়া! আইনের কূট রহস্য ইহাকে বুঝানো অসম্ভব। তথাপি কহিলাম, "আসল কথা কি হচ্ছে জান, বাপু, স্ত্রীর উপর স্বামীরই পূরা অধিকার। বাপ-মার কোন

অধিকার থাকে না। স্বামীর ঘর ছেড়ে এলেই স্ত্রী মাসহারার দাবী করতে পারে না। তবে যদি স্বামী মার-ধর করে, কিম্বা হিন্দু হয়ে মুসলমানী বিয়ে করে তাকে নিয়ে এক বাড়ীতে এসে বাস করে, যার দরুণ স্ত্রীর হিন্দুত্বে আঘাত লাগতে পারে, তখন শুধু স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে পারে, আর স্বামীও তখন মাসহারা দিতে বাধ্য হয়!"

প্রৌঢ়া কহিল, "তবে উপায়?"

"এক উপায় হয়, যদি তোমার মেয়ের গায়ে জামাই হাত তোলে, কি এমন কোন অত্যাচার করে, যাতে মেয়ের প্রাণের আশঙ্কা জন্মাতে পারে—আর আদালতে সে মার-ধরের চিহ্ন কি অত্যাচারের কোন প্রমাণ দেখাতে পার।"

প্রৌঢ়া একবার কন্যার পানে চাহিয়া পরে কহিল, "তা হলে টাটকা মার-ধর না হলে—"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "সে মার-ধরের আবার সাক্ষী চাই।"

"সাক্ষী! স্বামী আবার স্ত্রীকে কবে পথে নিয়ে গিয়ে মার-ধর করে থাকে, বাবা! যদিই বা হাত তোলে ত সে ঘরেই তোলে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি পাড়ার পাঁচ জনের সামনে হয়, না, পাড়ার পাঁচজনে তা দেখতে ছোটে? তার উপর যারা তাদের পাড়া-পড়শী, তারা ওদের দিক না নিয়ে কি আর আমাদের হয়ে বলবে?"

দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ হইলে তাহাতে

মালতীর ঢেরা সহি লইলাম। প্রৌঢ়াকেই সাক্ষ্য করিলাম, আর প্রমাণ সেই হাতের পোড়া দাগ! অঞ্চল হইতে তুইটি টাকা বাহির করিয়া প্রৌঢ়া আমার হাতে দিল। আমি ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে কহিলাম, "মোটে তু টাকা?"

প্রৌঢ়া একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "গরিব মানুষ বাবা, পেটে খেতে পাই না, তা আপনার পরিশ্রমের দাম দেব কি? সন্তুষ্ট হয়ে এই নাও বাবা। গরিবকে রাখ, ভগবান তোমায় রাখবেন!"

আর একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। টাকা তুইটা যেন গরম লোহার মতই হাতে বাজিল। তখন সবে ওকালতিতে হাতে খড়ি,—এখন হইলে কি করিতাম, জানি না, তবে—কিন্তু সে কথা যাক্! টাকা তুইটা ফিরাইয়া দিলাম, কহিলাম, "তবে এ তুমি রেখে দাও। অমনিই আমি তোমার কাজ করে দেব।"

প্রৌঢ়া বিষণ্ণ চিত্তে অপ্রতিভভাবে কহিল, "রাগ করো না, বাবা।"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "না, না, রাগ নয়—তুমি গরিব মানুষ, আমার টাকার পীড়াপীড়ি কিছু নেই। যদি জেতা যায়, তখন না হয় তু'টাকার সন্দেশ খাইয়ে যেয়ো।"

প্রৌঢ়া কহিল, "সে কথা মন্দ নয়, বাবা। আমার মাকেও সেদিন এসে প্রণাম করে যাব।"

"তা হলে তুমি এখন এস। বেলা ঠিক এগারোটার সময়

আদালতে ঝাউগাছগুলোর সামনে থেকো, আমি দরখাস্ত দিয়ে দেব।"

প্রৌঢ়া আবার আমায় প্রণাম করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপরে আসিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, বাইরে ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?"

আমি কহিলাম, "একটা মক্কেল এসেছিল।"

এক মুখ হাসিয়া স্ত্রী কহিলেন, "মক্কেল! ইস্! বরাত তবে খুলল, বল। কি মকদ্দমা?"

আমি আমূল বর্ণনা করিলাম। আবও কহিলাম, মকদ্দমা টেঁকে কি না, সন্দেহ! মার-ধরের কোন চিহ্নই নাই! স্ত্রী কহিলেন, "আচ্ছা আইন বাপু। গায়ে দাগ না দেখালে বুঝি মারটা সাব্যস্তই হবে না! আবার সে মার-ধরেরও সাক্ষী চাই! মুণ্ডুটা তা হলে দেখচি ছিঁড়ে আদালতে যেতে হবে! এই যে খেতে দেয় না, বাক্য-যন্ত্রণা দেয়, এইই কি যথেষ্ট অত্যাচার নয়? অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

একট রসিকতার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "যাও যাও, আমায় আর আইন শেখাতে হবে না—" বলিয়া ডিমের বড়া পুড়িয়া যাইবে ভয় দেখাইয়া স্ত্রী রন্ধন-শালার দিকে ছুটিলেন।

দরখাস্ত দিলাম। শমন বাহির হইল। দিনও পড়িল। মকদ্দমার দিন স্বামী আসিয়া হলফ্ করিয়া চার-পাঁচজনের সাক্ষ্য-সমর্থনে আদালতকে বুঝাইয়া দিল,—আসল কথা, শাশুড়ীব কাছে স্ত্রীকে পাঠাইতে সে একান্ত নারাজ! কন্যা-সম্বন্ধে মাতার অত্যন্ত কুৎসিত অভিপ্রায়ের অপবাদও সে স্বচ্ছন্দে দিয়া গেল। হাকিম সে পোড়া দাগেব ততটা মূল্য ধরিলেন না। অপর পক্ষেব উকিলও তাঁহাকে গলার জোরে বুঝাইয়া দিলেন, যদি এটা দাহের চিহ্ন বলিয়াই তর্কচ্ছলে ধবিয়া লওয়া যায়, তথাপি এ চিহ্ন অত্যন্ত পুরাতন। দাগ যখন টাট্‌কা ছিল, তখন কেন আদালতে আসা হয় নাই! আমি বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে চট্ করিয়া আদালতে আসা নানা কারণে ঘটিয়া উঠে না। প্রথমতঃ স্বামীর পক্ষের কড়া তদারক-পাহাবায় সে সুযোগ মিলে না, দ্বিতীয়তঃ অত্যধিক লজ্জা, সঙ্কোচ ইত্যাদি।

হাকিম শুধু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন খোরাকী দিবে না?

দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া স্বামী কহিল, "হুজুর, স্ত্রীকে আমি ঘরে রাখতে চাই। তার মার কাছে থাকলে মালতী বিগড়ে যেতে পারে।"

আইনের কড়া প্যাঁচ,—হাকিমের সাধ্য কি, তাহা খুলিয়া ফেলেন! তিনি রায় দিলেন, যেহেতু বাদিনী স্বামীর কোন

অত্যাচার প্রমাণ করিতে পারিল না, অতএব সে স্বামীর ঘরে যাইবে। কারণ মাতা অপেক্ষা স্বামীই তাহার যোগ্যতর অভিভাবক! তবে যদি ভবিষ্যতে স্বামী কোন অত্যাচার করে, তখন সে সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আসিলে তাহার খোরাকীর দাবী রক্ষিত হইতে পারে।

প্রৌঢ়ার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত স্বামীর দল মালতীকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার উকিলের গর্জ্জন আস্ফালনে আদালতের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। বেচারী প্রৌঢ়ার কাতর ক্রন্দন সে আস্ফালনের মধ্যে একেবারেই চাপা পড়িয়া গেল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরির দিকে চলিলাম। প্রৌঢ়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু একবার বলিল, "কি হল, বাবা? এ কি বিচার হল! গরীবের কি ভগবানও নেই? ও মেয়েকে কি আর আমি ফিরে পাব?"

তিন-চারিদিন পরে একটা আবকারী মকদ্দমা পাইয়াছিলাম। লাইব্রেরি-ঘরে বসিয়া সঞ্জীব রাওয়ের ডাইজেষ্ট খুলিয়া নির্ঘণ্ট বাহির করিয়া ল-রিপোর্টে নজীরের সন্ধানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি,— এমন সময় আমার মুহুরি আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একটি স্ত্রীলোক আমায় খুঁজিতেছে! বই ফেলিয়া চট্ করিয়া বাহিরে আসিলাম। আশার উল্লাসে মনটাও নাচিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই প্রৌঢ়া নারী, মালতীর মা। তাহাকে ঘিরিয়া চারি ধারে নিষ্কর্ম্মার দল রীতিমত ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে! প্রৌঢ়ার চোখে জল, মাথায় ঘোমটা নাই, কেশ-পাশ মুক্ত, রুক্ষ। আমাকে দেখিয়া সে চীৎকাব করিয়া উঠিল, কহিল, "বাবা, এ কি করলে আমার? এ কি বিচার হল!"

আমি স্তম্ভিতভাবে কহিলাম, "কি হয়েছে?"

সে কহিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা। আমার সর্ব্বস্ব লুঠে নেছে। আমাব মালতী আর নেই!"

"সে কি? কি হয়েছিল?"

"আর কি হবে, বাবা? সর্ব্বনেশে বিচারে আমার বাছাকে তারা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার পর কি যে করলে, কি খাওয়ালে—আমার সোনার পিরতিমে ভেসে গেল, বাবা—আমার মা হুর্গাব বিসর্জ্জন হয়ে গেল। এই দেখ চিঠি, আজ সকালে পেয়েছি।"

প্রৌঢ়া একখানি পোষ্ট-কার্ড আমার হাতে দিল। পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল, "পরশু শেষ রাত্রে আপনার কন্যার হঠাৎ কলেরা রোগ হয়। ভোর বেলায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌-চন্‌ করিয়া উঠিল। এ কি এ—!

প্রৌঢ়া কহিল, "কলেরা নয় বাবা, ও সব মিছে কথা। তারা আমার মেয়েকে খুন করে কলেরা বলে রটিয়ে দিয়েছে। হাকিমের

বিচারে সে একেবারে জন্মের মত বিদেয় হয়ে গেল—এখন হাকিমকে বলে আমারও একটা ব্যবস্থা করে দাও, বাবা।”

উন্মাদের মত কাঁদিয়া প্রৌঢ়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চারিধারে উকিল, মুহুরি ও পিয়াদার ভিড় জমিয়া গেল। আমার বুকটা অব্যক্ত বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল। এমন সময় মক্কেল আসিয়া সংবাদ দিল, বেঞ্চ-ঘরে আব্কারী মকদ্দমার ডাক পড়িয়াছে। কাজেই আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। শামলা ও কাগজ-পত্র লইয়া তখনই এজলাসে ছুটিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া প্রৌঢ়াকে আর দেখিতে পাইলাম না। সংবাদ লইয়া জানিলাম, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

অংশীদার

কাশীতে কুঞ্জ গলির ফটকের সম্মুখে পান্নালাল সুন্দরলালের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক। পান্নালালই ছিল কাজ-কর্ম্মে পটু—সুন্দরলাল পান্নালালের পাশে থাকিয়া তাহার আদেশগুলি পালন করিত, তাহার কথায় ও কাজে সায় দিত মাত্র, তবে উভয়েই তুল্য অংশীদার ছিল।

সেদিন অপরাহ্ণে ব্যাঙ্কের লোকজন চলিয়া গেলে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পান্না ডাকিল, "সুন্দর!"

ছুটির আনন্দে পান্নালালের স্বরের কম্পনটুকু সুন্দরলাল লক্ষ্য করিল না। সে কহিল, "কেন?"

পান্না কহিল, "বস—একটু দরকার আছে।"

গদি-পাতা বিছানার উপর সুন্দর বসিল। একধারে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক। উপরে দেওয়ালের গায় গোল ঘড়ি, তাহাতে তখন সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে।

পান্নালাল অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। ঘড়ির বড় কাঁটা ক্রমে নয়টার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল।

সুন্দর কহিল, "কি বলবে?—ভাবছ কি? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

পান্নালাল কহিল, "খুব দরকারী কথা—ভারী সঙ্গীন রকমের—"

সুন্দর একটু সরিয়া আসিল। তাহার ভাবনা হইতেছিল এই যে, যে পান্নার উপর সে একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর রাখিয়া আসিয়াছে, যাহার সহিত অবাল্য সৌহার্দ্দ্য মুহূর্ত্তের জন্য কখনও বিরাগের স্পর্শ লাভ করে নাই, সেই পান্না আজ একটা কথা বলিতে গিয়া এতখানি সঙ্কোচ করিতেছে কেন ?

সুন্দর কহিল, "কি, বল না, পান্না,—আমি কি তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়েছি, না এমন কিছু ঘটেছে, যার দরুণ আমাদের এতদিনকার কারবারে বা বন্ধুত্বে ঘা লেগেছে ? আমি ত সব বিষয়েই তোমার উপর নির্ভর করি, চিরকাল তাই করেও এসেছি !"

পান্নালাল সুন্দরের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "তাই বল্‌ছি—এতদিন যেমন নির্ভব রেখে এসেছ, যা করেছি আমি, তাই মেনে চলেছ, একটিও প্রশ্ন করনি—এখনও সে রকম কর্‌তে পার্‌বে—ভবিষ্যতে—প্রতি বিষয়ে—?"

সুন্দর হাসিয়া কহিল, "ইস্‌ ! তুমি যে একেবারে গম্ভীর হয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিলে। নাও, নাও, সমস্ত দিন খেটে খুটে সারা হয়ে গেছি। চট্‌পট্‌ এখন কাজ শেষ করে নাও ! আজ রাত্রে আবার মুন্নার ওখানে তয়ফা আছে। এমনভাবে কথাবার্ত্তা চালালে যেতে পার্‌ব না দেখ্‌ছি !"

পান্না কহিল, "তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি, ভবিষ্যতেও তেমনি নির্ভর রাখতে পার্‌বে ত ?"

সুন্দর কহিল, "এই কথা ! তা' আর জিজ্ঞাসা কচ্ছ—নির্ভর

বরাবর যেমন করে এসেছি, তেমনি কর্‌ব! মোদ্দা তুমি যা ভাবিয়ে দিছ্‌লে, আমার ভয় হয়েছিল, বুঝি বা—"

পান্না কহিল, "তবে সব কথা শোন—দরজা বন্ধ আছে ত? হাঁ! বেশ—তবে বলি—"

কথাটা বলিয়া পান্না লোহাব সিন্দুক খুলিল। একটা অধীর আগ্রহে সুন্দর সিন্দুকের পানে চাহিয়া রহিল। পান্না সিন্দুকের মধ্য হইতে একটা কালো মেহগ্নি কাঠের বাক্স বাহির করিল। সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া পান্না সুন্দরেব কাছে আসিয়া বসিল।

সুন্দর কহিল, "ব্যাপার কি, পান্না?"

"বল্‌ছি" বলিয়া পান্না বাক্স খুলিল। হীরা, মতি, চুনি, পান্নার জ্যোতিতে সুন্দরের চোখ ঝলসিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে কহিল, "এ সব কার পান্না? বেশ দামী জিনিস দেখছি যে!"

পান্নার দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টির মধ্যে একটা রিভল্‌ভার! সুন্দর চমকিয়া উঠিল! তাহার মুখে কথা ফুটিল না! ব্যাপার কি!

পান্না কহিল, "যদি প্রতারণা কর ত এখনি একটি গুলিতে তোমার, মাথা নেব—সাবধান।"

সুন্দর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল! পান্না কি উন্মাদ হইয়াছে? ভীত কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "বেশ—ব্যাপার কি?"

পান্না কহিল, "এ সব মণিমুক্তা যা দেখছ, তার অর্দ্ধেক তোমার আর বাকী আমার!"

সুন্দর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "সে কি?"

পান্না কহিল, "হাঁ, ভাল হয় ত দুজনের, আর ধরা পড়ি ত

দুজনেই পড়ব। জিনিসগুলো বুড়া মাধোলালের! কাল বুড়া এ গুলো বেচবার জন্য এসেছিল, আমি যাচাইয়ের ওজর করে রেখেছি! সে কোন সই না নিয়েই চলে গেছে; তার পর আজ সকালে হঠাৎ সে মারা পড়েছে। এ সব পাথরের খবর কেউ জানে না, বুড়া লুকিয়ে বেচতে এসেছিল। মেয়ে লছ্‌মী আর জামাই গুণাকরপ্রসাদ বিক্রীতে বাধা দিতে চেয়েছিল, তাই! জানো না, তার কারবারে লোকসান যাচ্ছিল, তাই এ পাথরগুলো বেচে কিছু টাকা নিয়ে সে কাশী থেকে সরবার মৎলবে ছিল? এ পাথর এখন আমাদেরই, বুঝেচ! আমি ধর্ম্ম হারাই নি, তাই তোমাকে বখরা দিচ্ছি—কারবারের মতই স্রেফ্ অর্দ্ধা-অর্দ্ধি!"

সুন্দর কহিল, "চুরি! বিশ্বাস-ঘাতকতা! না, পান্না, এত অধর্ম্ম কখনও সহ্য হবে না!"

পান্না কহিল, "সহ্য না হয়, এই পিস্তল,—ভরা আছে—ব্যস্, সরে পড়!" সুন্দরের দিকে রিভল্‌ভার তুলিয়া পান্না তাগ করিল!

সুন্দরের সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। চারি দিক সে অন্ধকার দেখিল! এই জীবন,—এমন ভাবে ফুরাইবে! না! কিন্তু উপায় কি! সুন্দরের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—ঘড়ির টকটক্ আওয়াজটা তাহার কর্ণে ক্ষীণ ঠেকিল। প্রাণপণ বলে তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল। সুন্দর কহিল, "পান্না, তাই হবে—অর্দ্ধা-অর্দ্ধি!"

পান্না কহিল, "শপথ কর!"

সুন্দর শপথ করিল। পান্না কহিল, "ঠিক ?" সুন্দর উত্তর দিল, "ঠিক !"

তখন পান্না রিভল্‌ভার নামাইল। কহিল, "এখন এস, দেখা যাক, কতগুলো কি আছে !"

পাথরগুলি মেঝেতে কাগজের উপর ঢালা হইল। বিশেষ আগ্রহের সহিত দুই বন্ধুতে মিলিয়া গণিতে লাগিল ! হীরা, চুনি, পোখরাজ, পান্না, মুক্তা—অসংখ্য !

সহসা একটা শব্দে পান্না মুখ তুলিয়া দেখে, সুন্দর রিভল্‌ভার উঠাইয়া তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়াছে,—রিভল্‌ভারটা পান্না নিকটে ভূমির উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল, আনন্দের আতিশয্যে ততটা খেয়াল ছিল না।

সুন্দর কহিল, "পান্না—এ সব জিনিস আমি লছমী আর গুণাকরপ্রসাদকে দিতে চাই—চুরি চল্‌বে না ! সব ঠিক করে লোক দিয়ে এখনি তাদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা কর—না হলে দেখ্‌ছ, পিস্তল—ভরা আছে !"

পান্না বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া সুন্দরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "নিমকহারাম, বজ্জাৎ— !"

সুন্দর হঠিয়া আসিল। কহিল, "পান্না, যদি তুমি ভালোয় ভালোয় এ সব পাঠাবাব ব্যবস্থা না কর, তা হলে বুঝেছ ? আমিও লট্টু পালোয়ানের সাকরেদী করেছি, জোর করে এ পিস্তল কাড়তে পার্‌বে না। এখনও উপায় আছে,—নইলে বুঝেচ ? আজ দশ বৎসর আমাদের কারবার চল্‌ছে, এর মধ্যে আমার

পরামর্শ তুমি কখনও নাওনি—জাল-জুয়াচুরি যে কত করেছ, তা আমি ধর্‌তেও পারিনি। আমি তোমার অংশীদার, কিন্তু চাকরের মত শুধু তোমার কথায় সায় দিয়ে এসেছি! আর না—এবার সে সবের শেষ হোক্!"

পান্না আবার যুঝিবার জন্য উঠিল! সুন্দরের রিভল্‌ভার হইতে ধূম বাহির হইল, শব্দ ছুটিল—"দুড়ুম্!" পান্না মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। পিস্তলের গুলি তাহার গায়ে লাগে নাই।

বাহিরে দ্বারে করাঘাত হইল। সুন্দর দ্বার খুলিয়া দেখে, দ্বারবান শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়াছে।

অকম্পিত কণ্ঠে সুন্দর কহিল, "জল্‌দি লোক ডাকো—চোর এসেছে!"

"চোর, না ডাকু—?" বলিয়া দ্বারবান ছুট দিল।

সুন্দর ফিরিয়া আসিয়া দেখে, পান্না উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে! ঘরের মেঝেতে পড়িয়া পাথরগুলা অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। সুন্দর ক্ষিপ্রভাবে মাথার পাগড়ী খুলিয়া পান্নার হাত দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল!

ইহার পর পান্নালাল সুন্দরলালের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক একদিন উঠিয়া গেল এবং সেই বাড়ীতেই সুন্দরলাল গুণাকরপ্রসাদের বেণারসী কাপড়ের প্রকাণ্ড দোকান বসিল।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

শেফালি ৸০

দ্বিতীয় সংস্করণ। বাঙ্গালী গৃহ-জীবনের দুঃখ-সুখের নিখুঁত ছবি। 'হাস্য, করুণ ও শান্ত রসের বিচিত্রোজ্জ্বল সুন্দর দশটি গল্প।

"এক-একটি গল্প বাস্তবিকই যেন এক-একটি স্নিগ্ধ কোমল সুদর্শন শেফালিকা। গল্পের যেমনই ভাব, ভাষা তেমনই সুন্দর। ভাষা বিন্যাসের মুন্সিয়ানায় নব রসেরই প্রভাব দেখিতে পাই। গল্পের সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক—যেন চুম্বক প্রস্তর। এই গ্রন্থের আদর ঘরে ঘরে হইবে।" বঙ্গবাসী

নির্ঝর ... ... ৷৹

বাঙলা দেশের ঘরের কথা। বারোটি ছোট গল্প। অশ্রুর প্রস্রবণ। হাসির নির্ঝর। কল্পনার বিচিত্র লীলায় লীলায়িত। পরিপক্ক হস্তের রচনা।

"গল্পগুলি উৎকৃষ্ট। সেগুলিতে নাটকীয় আর্ট ও স্বচ্ছতা আছে। হাস্য, করুণ বিচিত্র রসের। নির্ঝর নামটি সার্থক হইয়াছে।" প্রবাসী

পরদেশী ... ... ৷৹

চীন, জাপান, রুষ, তুরস্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন

দেশের বিভিন্ন জাতির নরনারী-চিত্তের হর্ষ-বেদনার বিচিত্র কাহিনী। স্নিগ্ধ-মধুর এগারোটি ছোট গল্প। সচিত্র।

"গল্পগুলি যেন এক একটি হীরার টুকরা। মণি-মাণিক্য-রত্ন-সংগ্রহ। সকলগুলি পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।" ভারতী

বন্দী ... ... ॥০

ভিক্তর হুগো রচিত একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সুললিত মর্ম্মানুবাদ। মানব-চিত্তের বেদনার করুণ কাহিনী। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব সামগ্রী। ভাবের গভীরতায়, বর্ণনার স্বচ্ছ সরল ভঙ্গিমায় ভাষার লালিত্যে মনোরম।

"ইতস্ততঃ নাটকত্বের আভাষ এমন করুণ ও সুকুমার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে শিল্পীর চমৎকারিত্বের কল্পনা একেবারে পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে লালিত ও বিকশিত হইতে পারে নাই, এমন-একটি তরুণ যৌবনের ইতিহাস, করুণ আখ্যায়িকা অসঙ্কোচে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনা সুললিত, ভাষা মনোহর—ভাষার মধ্যে ভাব কুয়াশাচ্ছন্ন হয় না। পাঠকের চিত্তটিকে হাত ধরিয়া লইয়া যায়।" ভারতী

সাঁঝের বাতি ... ... ॥০

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে লেখা গল্পের বই। অসংখ্য হাফটোন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত, স্বর্ণমণ্ডিত চিত্র-সম্বলিত। শিশু সাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী। তকৃতকে কাগজে ঝকৃঝকে ছাপা।

"ইহা কেবলমাত্র শিশুদিগকে আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহাদের

হৃদয়ের চারিদিকে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির চেতনা জাগাইয়া তুলিবে। গল্পগুলি আর্ট হিসাবেও সর্ব্বজনের উপভোগ্য হইয়াছে।” ভারতী

যৎকিঞ্চিৎ ... ... ॥০

ব্যঙ্গ-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। সুরুচিপূর্ণ রসিকতার স্নিগ্ধ ধারা। অজস্র মিষ্ট গানে ভরা। এমন একটি কথা বা ইঙ্গিত নাই, যাহাতে শিক্ষিত পাঠকের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

“রচনা-রসে সুমধুর, ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল, অথচ সে ব্যঙ্গে পঙ্কিল কলুষতা নাই। ভাষা চমৎকার; চটুল উক্তি-প্রত্যুক্তি স্ফটিকের ন্যায় বিমল, স্বচ্ছ।” বসুমতী

দশচক্র ... ... ।৵০

কৌতুক-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। রঙ্গের খনি, রসের সাগর। কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র গল্প অবলম্বনে রচিত।

“সর্ব্বত্র সংযত ভাব, সুরুচি ও সরসতা রক্ষিত হইয়াছে। নাটকীয় শিল্প-চাতুর্য্যের প্রাণ,—সহজ ও সরল ভাব! এ বিষয়ে লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। গানগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও কবিত্বরসে সুমধুর।” ভারতী

গ্রহের ফের ... ... ।০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকের তুফান। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন।

“চরিত্রাঙ্কন নিখুঁত। রহস্যটুকু যেমন মিষ্ট, তেমনি সুরুচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকার চরিত্র-চিত্রনে নিপুণ নাট্যকারের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।”

ভারতী